মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ.)

বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব

www.nagorikpathagar.org

বিবর্তণবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)

খায়রুন প্রকাশনী
বিক্রয় কেন্দ্র ঃ বুক্স এন্ড কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)
দোকান নং – ২০৯, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা – ১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫৯৮২, ৮৩৫৪১৯৬

www.nagorikpathagar.org

বিবর্তনববাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব
মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)

প্রকাশকাল ঃ
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৮২ ইং
৭ম প্রকাশ ঃ জানুয়ারী ২০১১ ইং

গ্রন্থস্বত্ব ঃ
খায়রুন প্রকাশনী

প্রকাশক ঃ
মোস্তফা ওয়াহিদুজ্জামান
খায়রুন প্রকাশনী

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ
আবদুল্লাহ জুবাইর

শব্দ বিন্যাস ঃ
মোস্তফা কম্পিউটার্স
১০-ই/এ-১, মধুবাগ, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মুদ্রণ ঃ
আফতাব আর্ট প্রেস, ২৬, তনুগঞ্জ লেন, ঢাকা।
ফোন ঃ ৭১১৪৫৭৯

ISBN : 984-8455-25-5

মূল্য ঃ ১২০.০০ টাকা

www.nagorikpathagar.org

প্রসঙ্গ-কথা

এই দুনিয়ায় মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে কিভাবে? সৃষ্টির সেরা মানুষ কি কোন ইতর প্রাণী থেকে অস্তিত্ব লাভ করেছে নাকি সরাসরি মানুষ হিসেবেই তার যাত্রা শুরু হয়েছে? চিন্তাশীল মানুষের কাছে এই প্রশ্নটি খুবই গুরুত্ববহ; কেননা এর সুষ্ঠু ও নির্ভুল জবাব ছাড়া দুনিয়ায় মানুষের প্রকৃত অবস্থান ও মর্যাদা নিরুপণ সম্ভব নয়—সম্ভব নয় তার জীবনের কোন মহৎ লক্ষ্য নির্ধারণ এবং সে লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যে কোন সুস্থ কার্যক্রম গ্রহণ।

দুনিয়ার প্রাচীন ও প্রতিষ্ঠিত ধর্মগুলো মানুষের আবির্ভাব সম্পর্কে মোটামুটি একই ধারণা পোষণ করে আসছে। তাদের মতেঃ গোটা প্রাণীকুলের মধ্যে মানুষ শুধু মানুষ হিসেবেই তার যাত্রা শুরু করেছে, কোন ইতর প্রাণী থেকে তার আবির্ভাব ঘটেনি। মহান আল্লাহ তাকে সরাসরি ও পুরোপুরি মানুষ রূপেই সৃষ্টি করেছেন। এ ব্যাপারে ইসলাম বরং এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে মানুষকে সেরা সৃষ্টি (আশরাফুল মাখলুকাত) ও আল্লাহর প্রতিনিধি (খলীফাতুল্লাহ) রূপে আখ্যায়িত করে তাকে সমগ্র প্রাণীকুলের উর্ধে স্থান দিয়েছে।

কিন্তু আধুনিক কালের কিছু কিছু প্রাণী-বিজ্ঞানী মানুষের এই মর্যাদাকে স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। তাঁরা ইতর প্রাণী থেকে মানুষ সৃষ্টির জন্যে বিবর্তন বা ক্রমবিকাশ নামক এক অদ্ভুত তত্ত্ব (Theory of evolution) উপস্থাপন করেছেন। তাঁদের ধারণায় বানর গোত্রীয় প্রাণী নাকি ধাপে ধাপে খোলস পাল্টে একদিন হঠাৎ পূর্ণাঙ্গ মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে; সে প্রথম থেকে সরাসরি মানুষ হিসেবে জন্ম নেয়নি। উনিশ শতকের প্রাণী-বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন এই তত্ত্বের সবচেয়ে জোরাল প্রবক্তা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন।

কিন্তু এই মতবাদের প্রবক্তারা আজ পর্যন্ত তাঁদের বক্তব্য বা দাবির সপক্ষে কোন অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ ও নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য-সাবুত উপস্থিত করতে পারেননি। তাঁরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থান থেকে বানর গোত্রীয় প্রাণীর কিছু বিক্ষিপ্ত কংকাল সংগ্রহ করে একটি মনগড়া তত্ত্ব খাড়া করার ব্যর্থ প্রয়াস ছাড়া ধাপে ধাপে খোলস পাল্টানো তথাকথিত আধা-বানর কিংবা আধা-মানুষের কোন পূর্ণাঙ্গ কংকাল আবিষ্কার করতে সক্ষম হননি।

তাছাড়া বিবর্তন বা ক্রমবিকাশের নিয়মে আজকে কেন ধাপে ধাপে খোলস পাল্টে ইতর প্রাণী থেকে মানুষ তৈরী হচ্ছেনা কিংবা মানুষ থেকে অন্য প্রাণী অস্তিত্ব লাভ করছেনা, তাঁরা সে প্রশ্নেরও কোন সদুত্তর দিতে পারেননি। এ পর্যায়ে তাঁদের বক্তব্যের গরমিলগুলো এতই প্রকট যে, একজন চিন্তাশীল ও সমঝদার লোকের পক্ষে তা বুঝতে কিছুমাত্র বেগ পেতে হয়না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কিছু স্থূলবুদ্ধির লোক এই অদ্ভুত তত্ত্বটি নিয়ে অযথা পানি ঘোলা করতে এবং অপরিণত তরুণদের মাঝে বিভ্রান্তির ধুম্রজাল ছড়াতে চাইছে।

www.nagorikpathagar.org

একালের মহান ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক, আল্লামা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) আলোচ্য 'বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব' গ্রন্থে বিভ্রান্তির এই ধূম্রজাল অপসারণ করে প্রকৃত সত্য উদঘাটন করেছেন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে। তিনি ডারউইন ও তাঁর অনুসারীদের বক্তব্যগুলোর চুলচেরা বিশ্লেষণ করে এ সত্য অকাট্যরূপে প্রমাণ করেছেন যে, বিবর্তন বা ক্রমবিকাশ হচ্ছে সেরেফ একটি বুদ্ধিবৃত্তিক ধোঁকা। এ ধরনের কোন মনগড়া প্রক্রিয়ায় কোন ইতর প্রাণী কখনো খোলস বদল করে মানুষে উন্নীত হয়নি এবং তা হতেও পারেনা।

শুধু তা-ই নয়, সৃষ্টিলোকে প্রাণের উৎপত্তি সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের অভিমতকেও গ্রন্থকার খণ্ডন করেছেন অত্যন্ত কুশলতার সাথে। তিনি এতৎসংক্রান্ত তাবৎ বক্তব্য বিশ্লেষণ করে এ সত্য নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছেন যে, নির্বস্তুক প্রাণ কোন বস্তু বা পদার্থ থেকে উৎসারিত হতে পারেনা, বরং এর উৎপত্তি ঘটেছে নির্বস্তুক এক মহান ও পরাক্রমশালী সত্তার ইচ্ছা থেকে। সৃষ্টির আদি থেকে সেই ইচ্ছারই প্রতিফলন ঘটছে গোটা প্রাণীকূলে।

তাছাড়া গোটা প্রাণীকূলে মানুষই শুধু চিন্তাশক্তি ও বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী। কেবল মানুষের মধ্যেই রয়েছে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ও পাপ-পুণ্য সম্পর্কে একটা জিজ্ঞাসু মন। কোন ইতর প্রাণী এই ধরনের গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নয়। বিবর্তন বা ক্রমবিকাশের মাধ্যমে এরূপ গুণ-বৈশিষ্ট্য কেউ অর্জনও করতে পারে না। কাজেই ইতর প্রাণী থেকে মানুষের উৎপত্তি সংক্রান্ত ধারণাকে নেহাত একটি অলীক কাহিনী ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

এই মূল্যবান গ্রন্থটি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮২ সনে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে এবং দেশের সুধীমহলে সমাদৃত হয় বিপুলভাবে। ফলে গ্রন্থটির সমুদয় কপি নিঃশেষ হয়ে যায় অত্যল্প কালের মধ্যেই। এরপর ১৯৮৪ সনে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ পায় এবং এ সংস্করণও আগের মতই সমাদৃত হয়। কিন্তু তারপর পাঠকদের উপর্যপুরি তাগিদ সত্ত্বেও আমাদের পক্ষে গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভবপর হয়নি নানা কারণে। বর্তমানে খায়রুন প্রকাশনী গ্রন্থটির পুনপ্রকাশের ব্যবস্থা করে সময়ের একটি বিরাট দাবি পূরণ করেছে, একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে।

বর্তমানে মুদ্রণ সামগ্রীর উচ্চমূল্য সত্ত্বেও গ্রন্থটির অঙ্গসজ্জা ও মুদ্রণ-পারিপাট্য যথাসম্ভব উন্নত করা হয়েছে। এর পূর্ববর্তী সংস্করণের ভুল-ত্রুটিগুলো সংশোধনের ব্যাপারেও আমরা পর্যাপ্ত যত্ন নিয়েছি। ফলে বিদগ্ধ পাঠক মহলে গ্রন্থের বর্তমান সংস্করণটি পূর্বাপেক্ষা অধিক সমাদৃত হবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে আশাবাদী। মহান আল্লাহ এই অনন্য খেদমতের জন্যে গ্রন্থকারকে সুউচ্চ মর্যাদা দান করুন, এটাই আমাদের সানুনয় প্রার্থনা।

ঢাকাঃ ১০ এপ্রিল, ১৯৯৭

মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান
চেয়ারম্যান
মওলানা আবদুর রহীম ফাউন্ডেশন

www.nagorikpathagar.org

গ্রন্থকারের কথা

পাশ্চাত্য সভ্যতার মৌলিক চিন্তাধারার সাথে পরিচয় ঘটার পর তিনটি বিষয়ে আমি ব্যাপক অধ্যয়নের প্রচেষ্টা চালাই। সেই তিনটি বিষয় হচ্ছে ঃ ডারউইনের বিবর্তনবাদ, কার্ল মার্ক্সের কমিউনিজম বা সাম্যবাদ এবং ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব। আমার বিবেচনায় পাশ্চাত্য থেকে আসা এই তিনটি বিষয়ই হচ্ছে ইসলামের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সাংঘর্ষিক মতবাদ। এই তিনটিকে যদি যথার্থ বলে মেনে নেয়া হয়, তাহলে ইসলামকে সত্য মানার উপায় থাকে না। আর ইসলাম যদি সত্য মানা হয়, তাহলে এই তিনটি মতবাদ নিশ্চিত রূপেই ভ্রান্ত ও অসত্য বলতে হয়। অথচ আধুনিক শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের দেশে এই তিনটি মতবাদের ব্যাপক প্রচার চলছে এবং এর শিক্ষাদান করা হচ্ছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে—স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে। আর এই শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকদের মন-মগজে এই তিনটি মতবাদ গভীরভাবে বদ্ধমূল হয়ে আছে এবং সাধারণ কথা-বার্তা ও আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে এরই প্রতি তাদের গভীর প্রত্যয় ব্যক্ত হচ্ছে। কিন্তু আমার কথা হল, এই তিনটি মতবাদের প্রতি বিশ্বাস থাকার অর্থই হচ্ছে ইসলামের প্রতি চরম অবিশ্বাস—মুখে যতই বিশ্বাসের ভান করা হোক না কেন।

কেননা, ডারউইনীয় মতবাদ আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রতি প্রচণ্ড অস্বীকৃতি (Negation), কার্ল মার্ক্স-এর মতবাদ 'রিসালাতে'র প্রতি অস্বীকৃতি এবং ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব ইসলামী নৈতিক চরিত্রের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

অথচ আমার সারাজীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও সাধনা দ্বীন-ইসলামের অকাট্য সততা আদর্শগত ও বাস্তবভাবে প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু বাস্তবভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে আদর্শগত ও নীতিগতভাবে ইসলামের সত্যতা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হওয়া একান্তই আবশ্যক। কারও মন-মগজে যদি ঐকান্তিক ও সুদৃঢ় প্রত্যয় থাকে ডারউইনীয় বিবর্তনবাদ, মার্কসীয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ও ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্বের প্রতি, তাহলে সেখানে ইসলামের প্রতি ঈমান প্রবেশাধিকার পেতে পারে না; শুধু তাই নয়, তা নিতান্তই হাস্যকর বিবেচিত হবে। 'হ্যাঁ' ও 'না' ন্যায় ও অন্যায়, পাপ ও পুণ্য, রাত ও দিন এবং সত্য ও মিথ্যা যেমন কোনক্রমেই অভিন্ন নয়, ঠিক তেমনি ইসলাম কখনই এই তিনটি মতবাদের সঙ্গে কোন দিক দিয়েই একবিন্দু সাযুজ্যপূর্ণ হতে পারে না। একটির প্রতি বিশ্বাস রেখে অন্যটির জন্য কাজ করা যেমন সম্ভব নয়, ডারউইনবাদ, মার্কসবাদ ও ফ্রয়েডবাদে বিশ্বাস রেখে ইসলাম বিশ্বাস করা ও পালন করাও তেমনি অসম্ভব। তাই ইসলামী জীবন-বিধান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সূচনাতেই নীতিগত ও আদর্শগতভাবে ইসলামের সঙ্গে সাংঘর্ষিক এই মতবাদ তিনটির ভিত্তিহীনতা অকাট্য যুক্তির ভিত্তিতে প্রমাণ করার জন্য আমাকে লেখনী চালনা করতে হয়েছে। তবে শুরুতেই আমি মার্কসীয় দর্শন তথা কমিউনিজম ও সমাজতন্ত্রের অযৌক্তিকতা ও অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে ১৯৫৫ সনে 'কমিউনিজম ও ইসলাম ও ১৯৬৩ সনে 'সমাজতন্ত্র ও ইসলাম' নামে

www.nagorikpathagar.org

ভিন্ন ভিন্ন দুটি বই প্রকাশ করি। ১৯৬২ সনে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ইসলামী সেমিনারে 'মার্কসীয় দর্শন' পর্যায়ের এক ভাষণে আমি এ মতবাদটির ভুল-ভ্রান্তি ও অবৈজ্ঞানিকতা প্রমাণ করি, যা সেই বছরেই ইসলামী সেমিনার সংকলন 'চিন্তাধারা'য় প্রকাশিত হয়। অতঃপর ১৯৭৭ সনে আমার লিখিত 'ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব' শীর্ষক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়। স্বতন্ত্র একটি প্রবন্ধে ডারউইনের ক্রমবিকাশবাদ সম্পর্কেও আমি বিস্তৃত আলোচনা করি যা কোনভাবে এখন পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি।

আমার দৃষ্টিতে উক্ত তিনটি মতবাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ডারউইনের বিবর্তনবাদ। মার্কস ও ফ্রয়েড উভয়ই নিজ নিজ মতবাদের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন বিবর্তনবাদকে। বিবর্তনবাদ সত্য হলে এ দুটিও সত্য। আর বিবর্তনবাদ 'নিছক প্রতারণা' ও 'সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক' প্রমাণিত হলে ও দুটি মতবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা হয়ে যায়। এই কারণে ডারউইনের বিবর্তনবাদ সম্পর্কে আমাকে আরও গভীর, সূক্ষ্ম ও ব্যাপক অধ্যয়ন চালাতে হয়েছে। সেই অধ্যয়নেরই ফল বর্তমান গ্রন্থ 'বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব'।

আমার এসব আলোচনা পর্যায়ে আমি বিজ্ঞান আলোচনার 'আরোহ' ও 'অবরোহ' এই উভয় পদ্ধতিকেই অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছি। তবে ইসলাম বিরোধী মতবাদসমূহের সমালোচনায় আমি সাধারণভাবে 'অবরোহ'—অর্থাৎ নিতান্তই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে ব্যবহার করেছি আর ইসলামী জীবনবিধানের ইতিবাচক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে আমাকে স্বাভাবিকভাবেই আরোহী পদ্ধতিকে অনুসরণ করতে হয়েছে।

বিবর্তনবাদ পর্যায়ে এই গ্রন্থের সমস্ত আলোচনা-ই বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্ব ও তথ্যসম্বলিত। অবশ্য শেষের দিকে আমি কুরআনের সৃষ্টিতত্ত্ব উপস্থাপন করেছি আধুনিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আলোকে। আমার কথাঃ ডারউইনের বিবর্তনবাদ বা Theory of evolution সম্পূর্ণ মিথ্যা, অবৈজ্ঞানিক ও প্রতারণাপূর্ণ এবং কুরআন উপস্থাপিত সৃষ্টতত্ত্বই একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত।

আমার সমগ্র আলোচনায় অন্ধবিশ্বাসকে একবিন্দু প্রশয় না দিয়েই চেষ্টা করেছি, যেন প্রতিটি বিষয়-ই সাধারণ বৈজ্ঞানিক সত্যরূপে প্রতিভাত হতে পারে এবং তা সুধীসমাজে ঠিক এই দৃষ্টিকোণেই গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হতে পারে।

এই গ্রন্থের বক্তব্য বিষয় কারুর কিছু বক্তব্য থাকলে সরাসরি আমাকেই বলা যাবে। এই বই পাঠের পর সারা জাহানের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্‌র প্রতি কারুর মনে ঈমান সৃষ্টি হলে আমার এ শ্রম সার্থক হবে। কেননা শুধু এই উদ্দেশ্যেই আমি এই গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলাম। আল্লাহ্ আমার এই ঐকান্তিক চেষ্টা ও শ্রম কবুল করবেন, মহান আল্লাহ্‌র নিকট এটাই আমার প্রার্থনা।

মুস্তাফা মনযিল, ঢাকা
জানুয়ারী ২৮.'৮২

মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব' বইখানি ১৯৮২ সনের শুরুর দিকে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ঢাকা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র থেকে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। অতঃপর এক-দেড় বছরের মধ্যেই সে সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে যায়। ১৯৮৪ সনে গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত হয়, এজন্য আল্লাহ্‌র দরবারে লাখো শোকর।

এই বইয়ের বক্তব্য বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ অভিনব না হলেও বিষয়বস্তুর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও তত্ত্বের ভিত্তিতে ডারউইনবাদের অবৈজ্ঞানিকতা ও ধোঁকা-প্রতারণা প্রমাণের দিক দিয়ে এ গ্রন্থ বাঙলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন প্রচেষ্টা বলে আমি মনে করি।

বক্তব্যের গুরুত্বের কারণে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শাখাসমূহের প্রখ্যাত শিক্ষক মহোদয়ের নিকট এ বইয়ের কপি পাঠিয়েছিলাম মন্তব্য লেখার অনুরোধ জানিয়ে। জীববিজ্ঞানের কোন কোন অধ্যাপক বইখানি চেয়েও নিয়েছেন আমার কাছ থেকে। আমি বড়ই আশা করেছিলাম, তাঁরা আমার প্রমাণিত তত্ত্ব সম্পর্কে কোন-না-কোন মন্তব্য করবেন—হয় বলবেন, বইয়ের প্রতিপাদ্য বিষয় অনস্বীকার্য, না হয় এর অযৌক্তিকতাই প্রমাণ করবেন।

কিন্তু আজ আমাকে স্বীকার করতে হচ্ছে যে, তাঁদের কারুরই কোন মন্তব্য আমার নিকট পৌছায়নি।

এক্ষণে আমি যদি দাবি করি যে, ডারউইনের বিবর্তনবাদ সম্পর্কে আমি যে বক্তব্য অকাট্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ভিত্তিতে উপস্থাপন করেছি, তার অমূলকতা প্রমাণ করার সাধ্য কারুর নেই, তাহলে বোধ হয় সে দাবি বড় বেশী অন্যায় হবে না।

তাই আমি আজ আবার বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করছি, ডারউইনের বিবর্তনবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা, ধোঁকা, প্রতারণা ও বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটির কারণে সে মতবাদের প্রতি এক বিন্দু বিশ্বাসও কারুর মনে থেকে থাকলে তা অবিলম্বে পরিহার করে কুরআন উপস্থাপিত সৃষ্টিতত্ত্বকেই একমাত্র সত্য বলে গ্রহণ করা উচিত।

প্রথম সংস্করণের ইংরেজী উদ্ধৃতিসমূহের অনুবাদ না থাকার কারণে আমাদের অনেক পাঠকের পক্ষেই বিশেষ অসুবিধা হয়েছে। তাঁদের প্রতি লক্ষ্য রেখে এ সংস্করণে সেগুলোর মোটমুটি ভাষান্তর দেয়া হয়েছে। আশা করি এবারে ইংরেজী বুঝতে অক্ষম পাঠকদের জন্য আর কোন অসুবিধা থাকবে না।

ঢাকাঃ ৬-১০-৮৪ গ্রন্থকার

www.nagorikpathagar.org

সূচি

পাশ্চাত্য দর্শনে সৃষ্টিতত্ত্ব ১১
সৃষ্টির উৎপত্তিতত্ত্ব ১২
সৃষ্টি সংক্রান্ত মত ১২
বিবর্তনবাদের তত্ত্ব ২৫
প্রাথমিক কথা ২৫
জৈবিক ক্রমবিকাশ ২৬
ক্রমবিকাশ মতের সত্যতার সাক্ষ্য ও সমর্থন ২৮
কিন্তু সত্যিই কি তাই ২৯
ক্রমবিকাশ মতের রূপান্তর ৩৫
ক্রমবিকাশ অভ্রান্ত মতবাদ নয় ৪১
ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব ৪৬
কিছুমাত্র নতুন কথা নয় ৪৭
ডারউইন তত্ত্বের পর্যালোচনা ৪৯
প্রাকৃতিক নির্বাচন ও যোগ্যতমের উদ্বর্তন ৪৯
ব্যক্তিগত আঙ্গিক পরিবর্তনের বংশানুক্রমিকতা ৫১
পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জীবন সংগ্রাম ও প্রাকৃতিক নির্বাচন ৫৮
ক্রমবিকাশ মতাদর্শের পঞ্চম ও ষষ্ঠ ধাপ ৬০
বিবর্তনবাদের অসারতা ৬৪
নির্জীব বস্তু থেকে জীবনের উদগম হওয়া কি সম্ভব? ৬৪
জীবন্ত কোষ ৬৬
জীবন এল কোত্থেকে ৭২
কোষের বিবর্তন ৭৪
ফসিল তত্ত্ব ও বিবর্তনবাদ ৮১
মধ্যবর্তী সূত্রগুলো কোথায়? ৮৪
সমগ্র জীবন্ত বস্তুর মৌলিক বিধান ৯২
দোঁআশলা জীব ৯৪
খাপ খাওয়ানো ৯৫
পরিব্যক্তি কি নবতর জীবন-পদ্ধতি দিতে পারে? ৯৭
প্রাকৃতিক নির্বাচন ১০৪
বংশানুক্রমিকতা পরিবার-প্রজাতির স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষক ১০৮

www.nagorikpathagar.org

দুর্লংঘ্য ব্যবধান ১১১
বানর সদৃশ মানুষই কি আমাদের পূর্ব পুরুষ ১১৬
অস্টালোপিমেকাস স্তর ১২২
অতি আধুনিক যুগের ফসিল ১২৫
লজ্জাকর প্রতারণা ১২৯
অদৃশ্য প্রায় প্রাণীর চিহ্ন সূচক দেহসংস্থা ১৩৩
স্রষ্টার অস্তিত্বের জীবন্ত সাক্ষ্য ১৩৫
প্রাণি জগত স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ ১৪০
মানুষ বিবর্তনবাদ বিশ্বাস করে কেন? ১৪৪
বিজ্ঞানীদের দায়িত্ব ১৪৮
কুরআনের পথনির্দেশ ১৫০
বিজ্ঞানীদের স্বীকৃতি ১৫২
বিশ্বলোক সৃষ্টি পর্যায়ে কুরআন মজীদ ১৬৪
আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর স্তর ১৭০
মানুষ সৃষ্টির রহস্য ১৭৫
গ্রন্থপঞ্জী ১৯০

www.nagorikpathagar.org

বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব

www.nagorikpathagar.org

পাশ্চাত্য দর্শনে সৃষ্টিতত্ত্ব

এই সুন্দর মনোহর বিশ্বলোক, এই শ্যামল শোভামণ্ডিত পৃথিবী এবং এখানকার এই কোটি জীব-জন্তু ও বস্তু সর্বোপরি এই বিবেক-বুদ্ধি ও বাকশক্তিসম্পন্ন মানুষ কেমন করে অস্তিত্ব লাভ করল, মানব দেহের এই কমনীয় ও সামঞ্জস্যপূর্ণ রূপ কিভাবে কেমন করে গড়ে উঠল, পাশ্চাত্য দর্শনে সূচনাকাল থেকেই এ এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার বিষয়রূপে গণ্য। চিন্তাশীল দার্শনিকরা এ নিয়ে অনেক চিন্তা-ভাবনা, গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন এবং এ সবের মাধ্যমে এক সুস্পষ্ট ও অকাট্য মত নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন। তাদের মনে সর্বপ্রথম যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে তা হল, এ বিশ্বলোক কি অতীতের কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে সহসা সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং সে সময় থেকে বর্তমান মুহূর্ত পর্যন্ত একই নিয়মে ও একই অবস্থায় অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, না এক দীর্ঘ নিয়মানুগ ও ধরাবাঁধা ক্রমবিকাশ পদ্ধতিতে তা বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে?

এক কথায় বিশ্বলোক সৃষ্টি সম্পর্কে দুটি মত বর্তমান। একটি হল এর সৃষ্টি লাভ আর দ্বিতীয়টি হল এর ক্রমবিকাশ লাভ। সৃষ্টি ও ক্রমবিকাশ লাভের ব্যাপারেও প্রশ্ন উঠেছেঃ তা কি যন্ত্রের মত একটার পর একটা হয়েছে, না তার পিছনে মৌলিক ও পরম কারণ নিহিত থাকার দরুণ এরূপ হওয়া সম্ভবপর হয়েছে? এর পরও প্রশ্ন উঠেছে, কার্যকারণের এক অপরিবর্তনীয় নিয়মের অধীন প্রয়োজনের অনিবার্য তাগিদে এরূপ হয়েছে, না 'বৃহত্তর' কোন উদ্দেশ্য সাধনের বা নির্দিষ্ট কোন পরিণতিতে পৌঁছার জন্যে এরূপ হয়েছে? অতএব সৃষ্টিলোকের উৎপত্তি পর্যায়ে সৃষ্টি ও ক্রমবিকাশ লাভ এ দুটি মতের সঙ্গে—সে ক্রমবিকাশ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে হয়েছে, অথবা পরম কারণবাদের ভিত্তিতে; কারণবাদেও তা হয় অতিক্রম করে যাওয়া নতুবা অন্তর্বাসী হওয়ার-প্রশ্নও জড়িত রয়েছে।

দর্শনের গ্রন্থাবলীতে বিষয়টি বোঝাবার জন্যে একটা নকশা দেয়া হয়েছে। আমরা এখানে তা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

www.nagorikpathagar.org

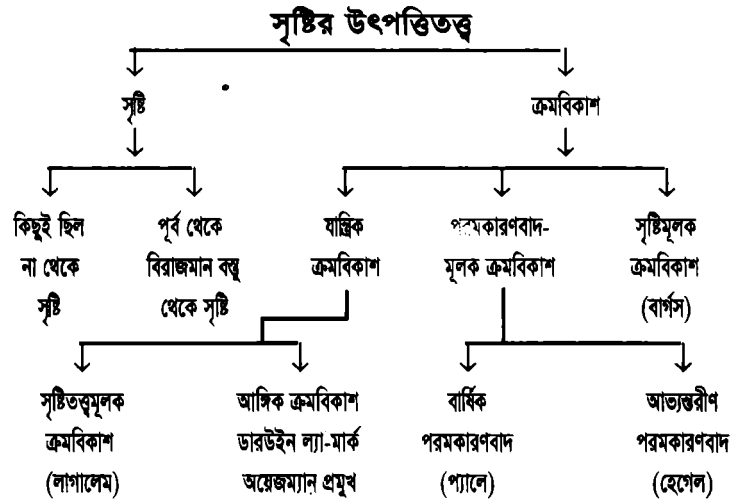

সৃষ্টি সংক্রান্ত মত

বিশেষভাবে সৃষ্টি সংক্রান্ত মত অনুযায়ী বিশ্বলোক এবং এর সবকিছুই আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছাক্রমে সহসাই সৃষ্টি হয়েছিল। সব জিনিস বর্তমানে যেমন আছে, সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে এসব ঠিক তেমনিই চলে এসেছে। তাতে কোন মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয় নি। এই সৃষ্টি সংক্রান্ত মতের আবার দুটো রূপ হতে পারে; একটি হল পূর্বে কিছুই ছিল না, সবকিছু সম্পূর্ণ নতুনভাবেই সৃষ্টি করা হয়েছে। আর দ্বিতীয়টি হল, শর্তাধীন সৃষ্টি কিংবা বলা যায়, পূর্বে বিরাজমান বস্তু থেকে সৃষ্টি।

প্রথমটির দৃষ্টিতে আল্লাহ্ তা'আলা এক খোদায়ী ফরমান দ্বারা সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। যেমন কুরআনে বলা হয়েছেঃ 'কুন ফায়াকুন'—'হও'; আর অমনি 'হয়ে গেল।' সৃষ্টিলোকের কোনই অস্তিত্ব যখন ছিল না তখনও স্রষ্টা নিজে বর্তমান ছিলেন। তিনি সর্বদিক দিয়েই এক পরিপূর্ণ সত্তা। তাঁর নিজের জন্যে বিশ্বলোকের কোন প্রয়োজন ছিল না, তিনি তাঁর কুদরাত ও রহমতের বাস্তব রূপায়ণ চেয়েছিলেন মাত্র এবং এ কারণেই এই বিশ্বলোক ও এখানে অবস্থিত সব কিছুকেই অস্তিত্ব দান করেছেন।

আর শর্তাধীন সৃষ্টি। এ মত অনুযায়ী সৃষ্টিলোকের অস্তিত্ব লাভের পূর্বে 'বস্তু' বর্তমান ছিল এবং তা দিয়েই তিনি এসব কিছুর অস্তিত্ব দান করেছেন। এ মতের দৃষ্টিতে তিনি যেন একজন স্থাপত্য শিল্পী মাত্র এবং আদিম বস্তু দিয়ে তিনি এসব সৃষ্টি করেছেন। অতএব বলতে হবে, শুরুতে তিনি এবং 'বস্তু' উভয়ই বর্তমান ছিল। কিন্তু সে আদিম বস্তু ভাসমান পিণ্ড ও অমূর্ত অবস্থায় পড়েছিল। স্রষ্টা বস্তুর

www.nagorikpathagar.org

সে অবস্থা থেকেই এ সৃষ্টিলোককে অস্তিত্ব দিয়েছেন। এ মত অনুযায়ী চিন্তা করলে নিম্নোক্ত কথাগুলো মেনে নিতে হয়ঃ

১. বিশ্বলোক ছাড়া-ই আল্লাহ্ চিরকাল ও সব সময়ই বর্তমান ছিলেন। যখন কিছুই ছিল না, তখনো তিনি ছিলেন। কেননা তিনি তো স্বয়ম্ভু, স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা। তাঁর নিজের অস্তিত্বের জন্যে বিশ্বলোকের কোন প্রয়োজন ছিল না।

২. আল্লাহ্ 'কিছুই ছিল না' থেকে বিশ্বলোককে সৃষ্টি করেছেন অথবা সৃষ্টি করেছেন আদিম কাল থেকে বিরাজমান বস্তু দিয়ে।

৩. আল্লাহ্ বিশ্বলোককে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট একটি সময়ে সৃষ্টি করেছেন।

৪. এবং সবকিছু সৃষ্টি করার পর এ বিশ্বলোককে স্বয়ংচালিত করে ছেড়ে দিয়েছেন। এর উপর তিনি একান্ত প্রয়োজন ছাড়া কখনো হস্তক্ষেপ করেন না। অতএব আল্লাহ্ বিশ্বলোক বহির্ভূত সত্তা।

কিন্তু পাশ্চাত্য দার্শনিক ও বিজ্ঞানিগণ বিশ্বলোক ও এর সবকিছুকে ক্রমবিকাশের ফল বলে দাবি করেছেন। তাঁরা তাঁদের দাবির সমর্থনে বলেছেন যে, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূ-বিদ্যা এবং জীববিদ্যা—এই সব কিছু ক্রমবিকাশ লাভের মতকেই সমর্থন করে। এ মত অনুযায়ী বিশ্বলোক এক সঙ্গে ও একটি মাত্র কথা দ্বারাই সৃষ্ট হয় নি; বরং তা বর্তমান পর্যায়ে ও রূপে পৌঁছেছে ধীরক্রমিক এবং নিয়মানুগ বিকাশ-পদ্ধতি অনুসারে। আর তাতে দীর্ঘ সময় ও কালের অতিবাহনের প্রয়োজন হয়েছে। দার্শনিক হার্বার্ট স্পেনসার মত প্রকাশ করেছেন যে, ক্রমবিকাশের এই কাজ শুরুতে খুব সহজ ও সরল থাকলেও শেষ পর্যায়ে তা অতীব জটিল রূপ পরিগ্রহ করেছে। প্রথমে তা ছিল অভিন্ন ও সমপ্রকৃতিসম্পন্ন আর শেষের দিকে এসে বিভিন্ন ও নানাধর্মী হয়ে যায়। নিয়মিত ও ক্রমপরিবর্তনের নাম-ই হল ক্রমবিকাশ বা বিবর্তন এবং প্রত্যেক ক্রমবিকাশ পন্থারই একটা নিজস্ব প্রকৃতি ও ধর্ম রয়েছে।

এক শ্রেণীর বিজ্ঞানী আবার ক্রমবিকাশের যান্ত্রিক পদ্ধতি পেশ করেছে। তাঁদের মতে বিশ্বলোক বস্তু জীবন ও মন, তারকা-নক্ষত্র-গ্রহ-উপগ্রহ, গাছ-পালা-গুল্ম-লতা এবং জন্তু-জানোয়ার ও জ্ঞানসম্পন্ন জীব—যেমন মানুষ—সব কিছুই এক আদিম ও স্বয়ম্ভু অবস্থায় বস্তুর ক্রমবিকাশ লাভের ফল। শুরুতে তা ছিল পরমাণু। এক স্বয়ংচালিত গতিকে কেন্দ্র করে তা স্বয়ংবিদ্যমান ক্ষেত্রে আবর্তিত হচ্ছিল। বস্তু, গতি ও শক্তি আদিম উৎপাদন বিশেষ এবং সব কিছুই এক ও ধীর গতির ক্রমবিকাশ পদ্ধতিতে বর্তমান বিশ্বের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

হার্বার্ট স্পেনসার বলেছেন, সমগ্র বিশ্বলোক একটি বিরাট ক্রমবিকাশ পদ্ধতির ফল। বস্তু ও গতি এ ক্রমবিকাশ পদ্ধতিরই উপাদান, ওগুলো আসলে কিছু নয়।

www.nagorikpathagar.org

ওগুলো ঠিকভাবে জানা বা বোঝা যায় না। বিশ্বলোক হচ্ছে বস্তু, গতি ও শক্তির পুনর্বিন্যাস ও পুনর্মিলনের ফল এবং এটাই আমরা জানতে পারি।

জীবতাত্ত্বিক ক্রমবিকাশ সম্পর্কিত মতের দুটো প্রতিদ্বন্দ্বী মতবাদ রয়েছে। একটি হচ্ছে ডারউইনের মত—আকস্মিক বা দুর্ঘটনাজনিত পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক নির্বাচন।

ডারউইন তাঁর জীবতাত্ত্বিক বিবর্তন সংক্রান্ত মত তাঁর লিখিত দুখানি বইয়ের মাধ্যমে পেশ করেছেন। বই দুখানি হল, 'অরিজিন অব স্পেসিজ' এবং 'ডিসেন্ট অব ম্যান'। তাঁর মতে জীবন-সংগ্রামের ক্ষেত্রে 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' কিংবা 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' নিয়মে আকস্মিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নতুন নতুন প্রজাতির উদ্ভব হয়েছে। ডারউইনের ক্রম-বিবর্তন মতের গোড়াতে নিম্নোদ্ধৃত মূলনীতিসমূহ বিদ্যমানঃ

বাহ্যত যদিও খুব সরল ও সহজ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা অত্যন্ত জটিল; অতএব তা পরিবর্তন সাপেক্ষ। আকস্মিক, স্বতঃস্ফূর্ত কিংবা দুর্ঘটনামূলক পরিবর্তন জীবকোষের মধ্য দিয়ে অনবরত ও নিরবচ্ছিন্নভাবে সংগঠিত হয়েছে এবং তা-ই পরিণত অঙ্গ ও অবয়বের পরিবর্তন সাধন করেছে। কোন কোন পরিবর্তন অনুকূল হয় আবার কতগুলো পরিবর্তন হয় প্রতিকূল। প্রতিকূল পরিবর্তন সূচিত হলে প্রজাতিসমূহ ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়ে যায়। পক্ষান্তরে অনুকূল পরিবর্তন সাধিত হলে জীবন-সংগ্রামের মাধ্যমে প্রজাতিসমূহ বেঁচে যায় ও রক্ষা পায়।

জীবকোষের স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তনসমূহ বংশানুক্রমিকতার দ্বারা নীচের দিকে সংক্রমিত হয় এবং তা অবয়ব সংগঠনে প্রভাব বিস্তার করে ও প্রয়োজনীয় সংশোধন সম্পন্ন করে।

এ পরিবর্তনসমূহ যদি কোন একক অবয়বে সাধিত হয় এবং তা বেঁচে থাকার সংগ্রামে যদি অনুকূল ও সুবিধাজনক প্রমাণিত হয়, তাহলে তা গোটা প্রজাতির ক্ষেত্রেও খুবই সুবিধাজনক বলে প্রমাণিত হতে পারে এবং তা বংশানুক্রমে এক বংশ থেকে অপর বংশের দেহাবয়বে প্রতিফলিত হতে থাকে। একটি একক দেহাবয়বের প্রকৃতি ও চরিত্রের এই পরিবর্তন তার বংশধর ও কাচ্চা-বাচ্চাদের দেহেও একটি বাস্তব সত্যরূপে প্রতিফলিত হতে দেখা গেছে। আর এ জিনিসকেই বংশানুক্রমিকতা বলা হয়।

এ সব পরিবর্তন উত্তরাধিকার রীতিতে একীভূত ও নির্ভরশীল। তা সৃষ্টির জন্যে তাদের জীবনে বেঁচে থাকার সংগ্রামে হয় কল্যাণকর হবে অথবা হবে ক্ষতিকর। ভূ-পৃষ্ঠের যতকিছু ভৌতিক উপায়-উপাদান বর্তমান তা সব বেঁচে থাকা জীব-জন্তুর জন্যে যথেষ্ট নয়। তাই এখানে বিশৃঙ্খলভাবে ঠেলাঠেলি ও কাড়াকাড়ি চলছে, প্রত্যেকেই কষ্টে-সৃষ্টে নিজের পথ করে বেঁচে থাকার জন্যে চেষ্টা করছে

www.nagorikpathagar.org

এবং এভাবেই তারা জীবিকা সংগ্রহের সংগ্রামে প্রাণপাত করছে। দর্শনের পরিভাষায় একেই বলা হয় জীবন-সংগ্রাম-বেঁচে থাকার জন্যে প্রাণান্তকর সংগ্রাম। এ সংগ্রামের মাধ্যমেই প্রকৃতি যোগ্যতমকে বাছাই করে নেয়। তারা হল শক্তিমান সৃষ্টি; অনুকূল পরিবর্তনে বেঁচে থাকার মত ক্ষমতা ও যোগ্যতা এদের রয়েছে বলেই তারা বাঁচে। কিন্তু যারা দুর্বল, যারা প্রতিকূল পরিবর্তন চক্রের মধ্যে পড়ে হাবুডুবু খায়, তারা মরে ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। যোগ্যতমের উর্দ্ধতন কিংবা জীবন-সংগ্রামে মরণজয়ী প্রমাণিতদের বেঁচে থাকার এ রীতিকেই রূপক ভাষায় বলা হয় প্রাকৃতিক নির্বাচন। প্রত্যেক প্রজাতি-জন্তু অসাধারণভাবে বহু সন্তানের জন্মদাতৃ হয়ে থাকে এবং জ্যামিতিক হারে তার সংখ্যা বাড়তেই থাকে। কিন্তু দুনিয়ার খাদ্য সংস্থান সীমিত ও পরিমিত বলে তারা বাঁচার সংগ্রামে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়। তার ফলেই বাঁচার যোগ্য প্রমাণিত হয় যারা—তারাই শুধু বাঁচে। যোগ্যতমের উদ্বর্তনে যোগ্যতম কারা? .....যে সব ব্যক্তি-সত্তা পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের পুরোপুরি খাপ খাওয়াতে পারে, তারা। পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে কারা? যে-সব ব্যক্তিসত্তা অনুকূল পরিবর্তনে প্রাচুর্যপূর্ণ হয় তারা। যেমন বাপ তেমন পুত্র, যদিও পুরোপুরি তেমন নয়। একই প্রজাতির ব্যক্তিদের দেহ গঠনে কিছু কিছু পার্থক্য অবশ্যই থাকে, এমনকি একই পিতা-মাতার সন্তানদের মধ্যেও এ পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী। তাই যে সব ব্যক্তিসত্তা অনুকূল পরিবর্তনে প্রাচুর্য সম্পন্ন হয় তারাই নির্বাচিত এবং সুরক্ষিত। বেঁচে থাকার সংগ্রামে তারাই হয় উত্তীর্ণ; তারাই বেঁচে যায় ও রক্ষা পায়, উন্নতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং এ পরিবর্তনকে তারা তাদের বংশধর বাচ্চা-কাচ্চাদের মধ্যেও উত্তরাধিকারসূত্রে সম্প্রসারিত করে। আর যে সব ব্যক্তিসত্তা প্রতিকূল পরিবর্তনের আবর্তের মধ্যে পড়ে যায়, শেষ পর্যন্ত তারা বিনাশ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। একেই বলা হয় 'প্রাকৃতিক নির্বাচন'।

ডারউইন বলেছেন, দেহাবয়ব তার কাজসমূহের দিকে অগ্রসর হয়ে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে থাকে। প্রথমে অবয়ব জন্মে দুর্ঘটনা বশতঃই অতঃপর তারা কাজ করতে শুরু করে। এগুলো পরিবেশের প্রভাবের দরুণ হয় না এবং জীবদেহ তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জৈবিক প্রয়োজন পূরণ-ইচ্ছা চরিতার্থ করার জন্যে যে-সব কাজ সম্পন্ন করে, তার কারণেও এগুলো হয় না। দেহকোষের আকস্মিক পরিবর্তনের কারণে চক্ষু দুর্ঘটনাবশতঃই উদ্ভূত হয়েছিল, পরে তা দেখবার কাজ করতে শুরু করে। অনুরূপভাবে শ্রবণেন্দ্রিয়ও দুর্ঘটনাবশতই অস্তিত্ব লাভ করে এবং অতঃপর তা শুনতে শুরু করে।

লা-মার্ক এ থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর মতে পরিবেশ ও অর্জিত বিশেষত্বে উত্তরাধিকার নীতি কার্যকর হওয়ার প্রভাবে অনেক পরিবর্তন সূচিত হয়। স্বতঃস্ফূর্ত কিংবা আকস্মিকভাবে জীবদেহে কোন পরিবর্তন আসতে পারে না এবং আকস্মিক পরিবর্তনে কোন সুনির্দিষ্ট ফলও লাভ করা যেতে পারে না।

www.nagorikpathagar.org

কাজেই পরিবর্তন কিংবা সংশোধন-পরিমার্জন কখনই আকস্মিক বা স্বতস্ফূর্তভাবে সংঘটিত হতে পারে না বরং পরিবেশের বহিঃশক্তির চাপেই তা হয়েছে বলে ধরতে হবে। কাজেই বহিঃশক্তি যখন দেহাবয়বের ওপর প্রভাব বিস্তার করে, তখন তা সেগুলোর ওপর পুনঃক্রিয়া করতে বাধ্য করে এবং পরিবেশের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হয়, আর এর দ্বারা কোন প্রয়োজন বা কোন চাহিদা পূরণ করা হয়। লা-মার্কের ধারণা হল, দেহাবয়বের অভ্যন্তরে গভীর ও তীব্র ইচ্ছা বা প্রয়োজনবোধ রয়েছে, তা হয় বহিঃশক্তির প্রভাবে এবং তা উন্নতির দিকেই কাজ করতে থাকে। যেমন আলো দেহের ওপর যে ক্রিয়া করে তার ফলে জীব দেখার প্রয়োজন বোধ করে। আর তারই দরুন চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হয়। ডারউইনের মত হল, দেহাবয়ব কাজ এগিয়ে নেয়; কিন্তু লা-মার্ক বলেন, কাজ দেহাবয়বকে পরিবর্তিত করে। প্রথমত দেহাবয়বের কতগুলি প্রয়োজন বা চাহিদা রয়েছে, পরে তা-ই ইচ্ছায় রূপান্তরিত হয়। অতঃপর তা নিয়ে দেহাবয়বে প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করার জন্যে অঙ্গ তৈরির উদ্যোগ চলে। অতএব জৈবিক ও দৈহিক বিবর্তনে লা-মার্ক ও ডারউইনের মতের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ওয়াইজম্যান মনে করেন, বংশানুক্রমিকতা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে প্রাণকোষের সংক্রমিত হওয়ার ওপর। কিন্তু তা দেহকোষের মধ্যে সংঘটিত পরিবর্তনে কিছুমাত্র প্রভাবিত হয় না আর দেহ-কোষ বংশধরদের মধ্যে সংক্রমিত হয় না। অবশ্য প্রাণকোষ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সংক্রমিত হতে পারে এবং তাদের মধ্যে পরিবর্তন বা পরিব্যক্তি (পূর্বপুরুষের চেহারা থেকে ভিন্নাবস্থা) হওয়ার মাধ্যমে তা ঘটতে পারে। ডারউইনের মতে দেহকোষের সংশোধনের মধ্যে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সূচিত হয়; কিন্তু ওয়াইজম্যান দেখিয়েছেন যে, জীবকোষ দেহকোষের সংশোধনে কিছুমাত্র প্রভাবিত হয় না। জীবকোষ তো মরণজয়ী, তা পিতা-মাতা থেকে বংশধরদের মধ্যে সংক্রমিত হয়। আর তা এক বংশের পর পরবর্তী বংশ পর্যন্ত সংক্রমিত হতে থাকে।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিচার-বিবেচনা করলে ডারউইন বা লা-মার্কের ক্রমবিকাশ সংক্রান্ত মত সমর্থনযোগ্য প্রমাণিত হয় না। ডারউইনের দর্শনে পরিবর্তনের যে দূরত্ব দেখানো হয়েছে, তা মোটেই স্বীকার্য নয়। বস্তুত আকস্মিক বা দুর্ঘটনাজনিত পরিবর্তন নতুন প্রজাতি সৃষ্টি করতে সমর্থ নয়। বরং দুর্ঘটনাজনিত পরিবর্তনের (যা সৃষ্টির [ক্রিচার] জন্যে সুবিধাজনক ও কল্যাণকর বলে বিবেচিত) খুবই বিরল ব্যাপার। আর তদ্দ্বারা সরল সহজ প্রজাতি থেকে জটিল প্রজাতি ক্রমবিকশিত হওয়াও কখনও সম্ভবপর হতে পারে না।

এ ছাড়া প্রাকৃতিক নির্বাচন কখনো কোন স্থায়ী আকৃতির সংরক্ষণ করতে পারে না। তাই শুধু যোগ্যতমরাই বেঁচে থাকবে এ মত গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তদুপরি অস্থায়ী অযোগ্যের সম্পূর্ণ বিনাশ ও ধ্বংসপ্রাপ্তির কথাও বোধগম্য নয়। তবে 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' মতবাদের ব্যাপারে 'প্রাকৃতিক নির্বাচনে'র পরিবর্তে

www.nagorikpathagar.org

বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন কিংবা মানসিক ও অধ্যাত্মবাদী নির্বাচন অবশ্যই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত। ডারউইন যেমন বলেছেন, আঙ্গিক পরিবর্তন দুর্ঘটনাজনিত ব্যাপার, অতএব খুবই বিরল। ফলে তা যদি কখনো ঘটেই, তাহলে তা কখনো কখনো একই সময় ও যুগপৎভাবে বিভিন্ন লিঙ্গের বিভিন্ন সত্তার মধ্যেও সংঘটিত হতে পারে। তাতে একটি চরিত্র সম্পন্ন দুই ব্যক্তিসত্তা খুব কম-ই একত্রিত ও মিলিত হতে পারে। তাছাড়া দুর্ঘটনাজনিত পরিবর্তন কখনো বংশানুক্রমিকভাবে সংক্রমিত হতে পারে না। অথচ ডারউইনের ক্রমবিকাশ সংক্রান্ত ধারণা এর ওপর একান্তভাবে নির্ভর করে।

ডারউইনের ক্রমবিকাশ সংক্রান্ত মত তিনটি দাবির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর তা হলঃ বেঁচে থাকার সংগ্রাম, বংশানুক্রমিকতা এবং স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তন। কিন্তু তিনি তাঁর এ তিনটি মৌলিক ধারণার কোন ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি। জীবন সংগ্রামের জন্যে, কর্মতৎপরতা বিদ্রোহ এবং জীবনের স্বতঃস্ফূর্ততা হল পূর্বশর্ত। সহজ-সরল প্রজাতি থেকে জটিল ও দুরূহ প্রজাতির উৎপত্তি জীবনের বিদ্রোহের ফলেও হতে পারে। তার পরিবর্তনে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মত একটা নেতিবাচক নীতি মেনে নেয়া কি যুক্তিসঙ্গত হতে পারে? জীবতাত্ত্বিক ক্রমবিকাশ হল জীবনের নিজস্ব স্বভাবের ব্যাপার। জীবনে বেঁচে থাকার প্রবল ইচ্ছা-বাসনা-কামনা, জীবনের বিদ্রোহ—অন্তর্নিহিত চাপ ও সৃজনধর্মী প্রবণতা, উন্নতিশীলতা—এসবই হতে পারে জীবতাত্ত্বিক ক্রমবিকাশের কারণ। কিন্তু জীবনে বেঁচে থাকার এই আদিম কারণসমূহের কোন সন্ধানই ডারউইন পাননি।

বংশানুক্রমিকতা পিতা-মাতা থেকে দেহকোষের স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তনসমূহ বংশধরদের মধ্যে সংক্রমিত হওয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। পিতা-মাতা থেকে তাদের বংশধরদের মধ্যে অমর জীবকোষের সংক্রমণের সঙ্গে অবশ্যই সাম স্যপূর্ণ। একই ধরনের জীবকোষের জৈবিক সংক্রমণের নিরবচ্ছিন্নতা অব্যাহতভাবে চলছে।

প্রাকৃতিক নির্বাচন একটা রূপকালঙ্কার, যাতে প্রকৃতিকে রূপায়িত ও মূর্ত করে তোলা হয়েছে; ধরে নেয়া হয়েছে যে, প্রকৃতি যোগ্যতম বা ব্যক্তিসত্তাসমূহকে বহু অনুকূল পরিবর্তনের সাহায্যে বাছাই করে নেয়। প্রকৃতিকে এক প্রকারের শক্তি বা এজেন্সী মনে করে নেয়া হয়েছে, যা খুব বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে জীবজগতের ব্যাপারসমূহ পরিচালনা করছে। প্রকৃতিকে মনে করা হয়েছে মানুষ; প্রকৃতিতে নরত্ব আরোপ করা হয়েছে। 'প্রকৃতি' সম্পর্কে এ হচ্ছে 'নরত্ব আরোপমূলক ধারণা'। বস্তুত ডারইউন এ পরিভাষাটিকে ব্যবহার করেছেন এ কথা বোঝাবার জন্যে যে, প্রকৃতিতে অতি সূক্ষ্মভাবে নিহিত রয়েছে একটা পরীক্ষা ও বিশ্লেষণকারী শক্তি। প্রকৃতি যেন চালুনীর মত যাচাই ও ছাঁটাই—বাছাইর কাজ করছে। কিন্তু আসলে 'প্রকৃতি' না বাছাই করে না প্রত্যাহার করে। বাছাই করাটা বুদ্ধিমত্তা ও বিচার বিবেচনার কাজ। এ জন্যে দরকার বুদ্ধি-বিবেচনার, পর্যবেক্ষণের, মূল্যায়ণের এবং

www.nagorikpathagar.org

তার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের। এ দৃষ্টিতে প্রকৃতিতে মূলত কোন ছাঁটাই-বাছাই নেই। 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' একটা যান্ত্রিক ব্যাপার, 'যোগ্যতমের উদ্বর্তনের' জন্যে একটা বুদ্ধি-বিবেচনা-শূন্য কর্মপন্থা। ব্যক্তিসত্তাসমূহ অনুকূল পরিবর্তনে সমৃদ্ধ হয় এবং প্রতিকূল পরিবর্তনে দুর্বলতম ব্যক্তিসমূহ নির্মূল ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়—এটাই স্বাভাবিক নিয়ম।

লা-মার্কের বংশানুক্রমিকতার মতাদর্শ ওয়াইজম্যান ও অন্যান্য বিশিষ্ট জীবতাত্ত্বিকগণ কর্তৃক প্রত্যাহৃত হয়েছে। তাঁরা বলেছেন, কেবলমাত্র আভ্যন্তরীণ জৈবিক পরিবর্তনই বংশানুক্রমিকতার ফলে সংক্রমিত হতে পারে।

লা-মার্কের মতে পরিবেশের প্রভাব ও শক্তির ফলেই দেহাবয়বের ওপর সংশোধন বা পরিবর্তন আরোপিত হতে পারে। কিন্তু পরিবেশ আসলে অস্থির ও উদ্বিগ্ন করে কিংবা উত্তেজিত করে, তা কিছুমাত্র নমনীয় বা ছাঁচে গড়া নয়। প্রকৃত গঠনমূলক নীতি কার্যকর হয় আভ্যন্তরীণ শক্তি বলে। সে শক্তি হচ্ছে জীবনের শক্তি। লা-মার্ক নিজে এবং তার অনুসারীরাও এ মতটি সমর্থন করেন।

লা-মার্কের মতে কাজ কর্ম বা প্রয়োজনেই দেহাঙ্গ উদ্ভূত হয় এবং চর্চা ও অভ্যাস তাকে উন্নত ও শক্তিশালী করে তোলে। কিন্তু প্রশ্ন হল শুধু প্রয়োজন কেমন করে একটা দেহাঙ্গ সৃষ্টি করতে পারে? প্রয়োজন হয় অনুভূত হবে, নতুবা হবে অননুভূত। তা যদি অনুভূত হয় তাহলে তা অবশ্যই একটা উদ্যম ও কঠোর চেষ্টা শুরু করিয়ে দেবে। তাছাড়া প্রয়োজন অনুভূত হলেও তা সাধারণত একটা অস্পষ্ট ব্যাপার। আর সে জন্যে চেষ্টা-সাধনা অনিশ্চিত। তাহলে একটা অস্পষ্ট প্রয়োজন এবং অনির্দিষ্ট কর্মোদ্যম একটি অতি জরুরী অঙ্গ উৎপাদন করতে পারে কিরূপে? আমরা যখন কোন উচ্চতর সংগঠনের কোন দেহাঙ্গের কথা চিন্তা করি, তখন তাতে প্রয়োজনটা অনুভব করতে পারি; কিন্তু নিম্ন ও নিকৃষ্ট ধরনের দেহ সংগঠনে প্রয়োজন অনুভূত হতে পারে না আর অননুভূত প্রয়োজন সেখানে কি করে একটা নতুন দেহাঙ্গের সৃষ্টি করতে পারে? যে প্রয়োজন অনুভূত নয় তা স্বভাবতঃই কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে না।

উপরন্তু চর্চা ও অভ্যাস বর্তমান দেহাঙ্গকে উন্নত ও অধিক শক্তিশালী করে তুলতে পারে—একথা মেনে নিলেও একটি দেহের আভ্যন্তরীণ সংগঠনে জটিলতার সৃষ্টি যে কখনো করতে পারে না, তা অস্বীকার করা যাবে কী করে? তাহলে সহজ-সরল অঙ্গ -প্রত্যঙ্গে জটিল ও সূক্ষ্ম দেহাঙ্গের উদ্ভব হল কিভাবে?

ক্রমবিকাশের যান্ত্রিক পদ্ধতিও বৈজ্ঞানিক বিচারে সমর্থনীয় নয়। কেননা যান্ত্রিক শক্তির এলোমেলো খেলায় কোন বিস্ময়কর ঐক্য ও সামঞ্জস্যের সৃষ্টি হতে পারে না। বিশ্বব্যবস্থায় এই যে শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা কখনো একটি যন্ত্র দ্বারা সম্ভবপর হতে পারে না। কোন অন্ধ ব্যক্তি অক্ষরগুলিকে সাজিয়ে শেক্সপীয়রের মহাকাব্য রচনা করতে সমর্থ নয়, একথা তো স্বতঃসিদ্ধ।

www.nagorikpathagar.org

উপরন্তু জড় ও জীবনের মাঝখানে যে বিরাট শূন্যতা ও ব্যবধান রয়েছে, যে দূরত্ব ও বৈপরীত্য রয়েছে, জীবন ও মনের মাঝে ক্রমবিকাশের যান্ত্রিক মত তা কখনও দূর করতে পারে না। জৈবিক জীবনের লক্ষণসমূহ অত্যন্ত জটিল ও সূক্ষ্ম সংযোজন সম্পন্ন। একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারা যায় যে, তা একটা চরম ও পরম লক্ষ্যে পৌছানোর জন্যে একটি বিশেষ উপায়। কিন্তু বস্তুগত অণু-পরমাণুর আকস্মিক ও দুর্ঘটনাজনিত সংমিশ্রণ ও জৈবিক শক্তিসমূহ স্বাভাবিকভাবেই পরস্পর দ্বন্দ্বমুখর একটি অপরটির স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত হয়। প্রথমটিতে রয়েছে অপরিচিত (katabolid) স্বভাব-প্রবণতা, তা কেবল ছড়াতে চায়, চায় অচলাবস্থার সৃষ্টি করতে। পক্ষান্তরে শেষেরটিতে রয়েছে পরিচিত ও পুষ্টিসাধন প্রবণতা; তা সব সময় একীভূত করার বা কার্যতৎপরতা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট। উপরন্তু মানবীয় মন বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ তৎপরতা ও স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগের ক্ষমতার অধিকারী, তা কখনো অন্ধ অণু-পরমাণু একত্রে পিন্ডিভূতকরণের ফসল হতে পারে না। তাই এ কথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, জগতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে যান্ত্রিক বিবর্তনবাদে যথেষ্ট অসঙ্গতি বিদ্যমান। এ কারণে ভাববাদী দার্শনিকগণ পরিণতিমূলক বিবর্তনবাদকে (Teliological evolution) গ্রহণ করেছে।

'ক্রমবিকাশ' হচ্ছে উন্নতি লাভের একটা পদ্ধতি। আর পদ্ধতি অর্থ Modus operandi কিংবা পরিচালনা বা কার্যসম্পাদনের একটা ধরন। কিন্তু পদ্ধতি অথবা কার্যসম্পাদনের ধরন একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হতে থাকে, একটা উদ্দেশ্যের পানে তা নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে। কাজেই সম্মুখের দিকে চলার এই কার্যক্রম সুষ্ঠুরূপে চালাবার জন্যে নির্দেশক নীতি (Directive principle) থাকা আবশ্যক। এ কারণে 'ক্রমবিকাশ' মতটি পরমকারণবাদ (Teliology) বা চূড়ান্ত অবস্থার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ নয়।

ক্রমবিকাশের যান্ত্রিক মতটি বিশ্বলোকের সবকিছুরই ব্যাখ্যা করতে চায় প্রাকৃতিক এবং যান্ত্রিক শক্তির সাহায্যে। তা প্রতিটি জিনিসকেই যন্ত্রের পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। কিন্তু প্রাকৃতিক বা যান্ত্রিক শক্তিসমূহ কোন এক বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ নীতির উচ্চতর শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হওয়া ছাড়া কোন কাজই করতে পারে না। যান্ত্রিকতা হচ্ছে মাত্র একটি উপায়ের পদ্ধতি, যা একটা উদ্দেশ্য অর্জনের জন্যে একটিকে অপরটির ওপর প্রয়োগ করা হয়েছে। কাজেই যান্ত্রিকতাকে চূড়ান্ত অবস্থা বা পরমকারণবাদের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ মনে করা যেতে পারে না।

পরন্তু ক্রমবিকাশবাদের মতটিকে সমগ্র বিশ্বলোকের ওপর প্রয়োগ করা যেতে পারে না। অবশ্য একটা নির্দিষ্ট অংশ হিসাবে বিশ্বলোকের মধ্যে তাকে প্রয়োগ করা যেতে পারে মাত্র।

পরিণতিমূলক বিবর্তনবাদ অনুসারে জগতের বিবর্তন বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত এবং তা উদ্দেশ্যমূলক। এই বিশ্বজগত এক সহজ-সরল অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে

www.nagorikpathagar.org

পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে, কিন্তু এই ক্রমবিবর্তন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করছে এক পরম বুদ্ধিময় সত্তা, যিনি এই বিশ্বের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে নিজের উদ্দেশ্যকে সফল করে নিচ্ছেন। এই সত্তাই জগতের বিভিন্ন শক্তিকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করে কোন এক লক্ষ্যের পানে বিবর্তন প্রক্রিয়াকে পরিচালিত করছেন। কোন উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে এই চেতনা-শক্তির ক্রমবিকাশের ফলে জীবজগতের উৎপত্তি হয়েছে।

ভাববাদী দার্শনিকগণই সাধারণত পরিণতিমূলক বিবর্তনবাদের ব্যাখ্যাকার। প্রাচীন গ্রীসে আনাকসাগোরাস, সক্রেটিস, প্লেটো ও এরিস্টোটল এই মতবাদের সমর্থক ছিলেন। আর বর্তমানকালে ফিকটে, হেগেল, ফকনার, ড্রুড, পালসেন, মর্টিনিউ প্রমুখ দার্শনিকগণ এই মতের ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

পরিণতিমূলক বিবর্তনবাদীদের মতে কেবলমাত্র ভৌতিক এবং যান্ত্রিক শক্তির ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার দ্বারা এই বিশ্বজগতের উৎপত্তি এবং এই জগতের বিভিন্ন স্তরের ক্রমবিকাশের ব্যাখ্যা করা যায় না। বিভিন্ন বস্তু ও ঘটনার মধ্যে যে পারস্পরিক সামঞ্জস্য রয়েছে, তাতে এ কথা স্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয় যে, এই জগতকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্যে এক পরম বুদ্ধিময় সত্তা আছেন, যিনি এই জগতের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে স্বীয় উদ্দেশ্যকে সফল করছেন; আর এই উদ্দেশ্য হল পরম সত্তার প্রকাশ।

পরিণতিমূলক বিবর্তনবাদিগণ তাঁদের মতবাদের স্বপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলির অবতারণা করেছেনঃ

১. প্রকৃতিতে উপায় এবং উদ্দেশ্যের মধ্যে পারস্পরিক উপযোজনের সম্পর্ক পরিণতিমূলক বিবর্তনের সাক্ষ্য দেয়। অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, প্রকৃতির সর্বত্র উপায় এবং উদ্দেশ্যের মধ্যে ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য এবং ঊর্ধ্বতন উদ্দেশ্যের মধ্যে পারস্পরিক উপযোগিতার উদাহরণ ভরপুর। কিন্তু কোন অন্ধ যন্ত্রশক্তির সাহায্যে এগুলোর ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব নয়। তার জন্যে এক বুদ্ধিময় সত্তার অবস্থিতি অপরিহার্য। প্রকৃতিতে বিভিন্ন বস্তু ও বিষয়ের মধ্যে রয়েছে নির্বাচন সংযোগ এবং ক্রমিক স্তরভেদ, এ সমস্তই বুদ্ধিজাত পরিকল্পনার লক্ষণ।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিভিন্ন প্রাণীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিতে এমন সামঞ্জস্য বিদ্যমান যে, মনে হয় এগুলিকে ঐভাবেই নির্বাচন করা হয়েছে। এবং তাদের মধ্যে একটা পারস্পরিক উপযোগিতার সম্পর্ক রয়েছে। যার ফলে প্রাণীরা বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে নিজেদের সহজেই খাপ খাইয়ে নিতে পারে। এভাবে জগতের সর্বত্রই সূক্ষ্ম-সুনিপুণ নির্বাচন ব্যবস্থার প্রমাণ পাওয়া যায়। এতে প্রমাণিত হয় যে, এ জগৎ উদ্দেশ্যমূলক সৃষ্টি।

www.nagorikpathagar.org

২. কার্যকারণ সম্পর্কও পরিণতিমূলক বিবর্তনের সাক্ষ্য দেয়। 'কারণ' হল একটা শক্তি, যা কার্যের সৃষ্টি করে। এতে পরিবর্তন সাধিত হয়। এই পরিবর্তন আপনা-আপনি হতে পারে না। এর নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য থাকবে এবং তা হল প্রয়োজন পূরণ। প্রয়োজন ছাড়া কোন কার্য উৎপন্ন হয় না। এই প্রয়োজন হল কোন লক্ষ্য সাধন। অতএব এই জগতে যে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে, তার মূলে রয়েছে কোন প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য সাধন। এইরূপ ক্রিয়া বা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়েই জীব জগতের ক্রমবিকাশ সংঘটিত হচ্ছে।

আবার একই কারণ সর্বদা একই কার্য সৃষ্টি করে। কিন্তু এমন কেন হয়? অন্ধ যন্ত্রশক্তি দ্বারা এর কোন ব্যাখ্যা দেয়া যায় না। প্রকৃতির সমস্ত কার্যকারণ সম্পর্কের মধ্যে রয়েছে এক অন্তঃস্থিত চেতন-সত্তার ইচ্ছার অভিব্যক্তি।

অতএব জগত জুড়ে একটা উদ্দেশ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। জগতের সর্বত্র শৃঙ্খলা, ঐক্য ও সামঞ্জস্য বিদ্যমান। অতএব এই জগতের পশ্চাতে অবশ্যই কোন বুদ্ধি বা মনের অস্তিত্ব আছে। শৃঙ্খলা সবসময়ই কোন বুদ্ধির প্রকাশ মাত্র।

এ প্রেক্ষিতে পরিণতিমূলক বিবর্তনবাদিগণ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, এই জগতের একটি উদ্দেশ্য আছে। জগতের গতি এক বিশেষ পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে। জগতের বিবর্তন পরিণতিমূলক বা উদ্দেশ্যমূলক। [সাধারণ দর্শনশাস্ত্রঃ ১৫৪-১৫৬ পৃঃ]

এ দুনিয়ায় মানুষ যা কিছু করে তা একটা উদ্দেশ্যের জন্যে। তাদের কাজ উদ্দেশ্যমূলক (Purposive)। তাদের আচরণ ও কার্যকলাপ বুদ্ধিমত্তাসঞ্জাত এবং একটা উদ্দেশ্য পরিপূরণের জন্যেই তা চালিত হয়। মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমগ্র দেহসত্তার সাথে বিজড়িত। অনুরূপভাবে সমগ্র দেহসত্তা তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে সম্পর্কিত। এক কথায় মানবদেহে একটা চমৎকার সামঞ্জস্য ও সংযোজন বিদ্যমান।

উদ্ভিদ জগতেও সবকিছু একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের সাথে সম্পৃক্ত। তাদের একটি অপরটির সাথে মানবদেহের মতই সম্পর্কযুক্ত।

"জীবনহীন বা নির্জীব দেহসত্তায় একটি অঙ্গ সমগ্রের জন্যেই নিয়োজিত। আর সমগ্র দেহসত্তার সংহতি হল একটি মূল্যমান। প্রকৃতির উদ্দেশ্যপূর্ণ চরিত্র পরিস্ফুট করে তোলার জন্যে এ সবই একান্ত জরুরী।" [প্যাট্রিকঃ ইনট্রোডাকশন টু ফিলসফি-পৃঃ ১৭০]

কেবল জীবন্ত দেহে কিংবা জীবজগতেই নয়, নির্জীব-নিষ্প্রাণ প্রকৃতির মধ্যেও এই উদ্দেশ্যবাদের স্ফুরণ লক্ষ্য করা যায়। বিশ্বপ্রকৃতিতে অবস্থিত নিয়ম-শৃঙ্খলাকে যখন আমরা মনোযোগ দিয়ে বিবেচনা করি, গগনমণ্ডলের সুষ্ঠু স্থিতাবস্থা লক্ষ্য করি, দেখি আইনের বিশ্বব্যাপকতা, তখন আমরা একটা বিরাট

www.nagorikpathagar.org

পরিকল্পনা প্রত্যক্ষ করতে পারি। আমাদের চোখের সামনে সমুদ্ভাসিত হয়ে ওঠে বিশ্বলোকের সামগ্রিক রূপ। আর তা আমাদের মন ও মগজে এক অসীম অনন্ত বুদ্ধি-বিবেচনার অবস্থিতি অনস্বীকার্য করে তোলে; তা-ই সমগ্র জগতকে নিয়ন্ত্রিত করছে ও নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে রেখে পরিচালিত করছে, একথা বুঝতে আমাদের একটুও কষ্ট হয় না। [ঐ পৃঃ ৬৫]

সমগ্র বিশ্বলোকের শৃঙ্খলা, ঐক্য ও সামঞ্জস্য সন্ধান দেয় এক মহান আল্লাহ্‌র। এ বিশ্বলোক তাঁর-ই সৃষ্টি, তাঁর-ই অতুলনীয় শক্তির এক বাস্তব প্রমাণ। এটা কোন অন্ধ ও বুদ্ধি-বিবেকহীন শক্তির লীলাক্ষেত্র নয়। এখানে প্রতিটি অণু-পরমাণুতে আল্লাহ্‌র অফুরন্ত রহমতের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর প্রকট হয়ে রয়েছে এটাই দর্শনের নির্যাস; এ নির্যাসই দার্শনিক চিন্তা-বিশ্লেষণ এবং গবেষণা ও অনুসন্ধানের ফল এবং তা-ই এ মহাবিস্ময়কর জগতের বুকে মানুষকে দিতে পারে পরম সান্ত্বনা।

আল্লাহ্‌কে স্বীকৃতি ও প্রতিনিয়ত আল্লাহ্‌র স্বরণই মানুষের মনকে পারে সান্ত্বনা দিতে—অন্য কিছু নয়।

আল্লাহর অস্তিত্বের অকাট্য প্রমাণ রয়েছে বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি পরতে পরতে। এ শুধু কবির কল্পনা নয়—বিজ্ঞানের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত এটাই। যে অণুকে কোনদিন চূর্ণ করা যায় নি, তা-ও চূর্ণ করা সম্ভবপর হয়েছে। অণুকে চূর্ণ করে যে ক্ষুদ্রাংশ বের করা হয়েছে, তার নাম দেয়া হয়েছে 'পরমাণু' (এটম)। সর্বশেষে এই পরমাণুকেও খণ্ড-বিখণ্ড করা সম্ভব হয়েছে। আর তাতে ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রনকে নিত্য-আবর্তিত হতে দেখা গেছে। উত্তরকালে তা-ও বিশ্লেষণ করে এ সবের মধ্যে বিপুল শক্তির সন্ধান পাওয়া গেছে। জানা গেছে এ শক্তিই সমগ্র বস্তুজগতে আকার-আকৃতির রূপ ধারণ করে। বস্তু-জগতের প্রতিটি জিনিসের মধ্যে এমনকি 'ইথার' ও শূন্যতার মধ্যেও এ মহাশক্তির অবস্থিতি নিঃসন্দেহে লক্ষণীয়।

এখন প্রশ্ন উঠেছে, এ মহাশক্তি কি নিষ্প্রাণ, না এর 'জীবন' বলতে কিছু রয়েছে? এর জওয়াবে বৈজ্ঞানিক গবেষণা জানিয়ে দিয়েছে যে, উদ্ভিদের মধ্যেও 'জীবন' বিদ্যমান। এমনকি প্রস্তরেরও প্রাণ আছে বলে দাবি করা হয়েছে। বর্তমান দুনিয়ার সেরা বিজ্ঞানীদের মতে নিষ্প্রাণ সত্তার কোন অস্তিত্ব নেই, তা গাছ-পালা, প্রস্তর, জীব-জন্তু আর মানুষ—যা-ই হোক না কেন। সবার মধ্যেই কোন না কোন ধরনের 'জীবন' বর্তমান। ইংল্যান্ডের একালের সেরা দার্শনিক হোয়াইটহেড-এর মতে—বস্তু ও প্রাণ-শক্তি কিংবা জীবন ও জড়ের দ্বিত্ব একটা প্রতারণা মাত্র। তিনি অকাট্য যুক্তিপ্রমাণের ভিত্তিতে দাবি করেছেন যে, বস্তু সত্তায় 'বস্তু' ও প্রাণশক্তির পার্থক্য দেখানো হয়েছিল শুধু ব্যবহারিক কারণে। অন্যথায় প্রকৃতপক্ষে এর কোনই অর্থ নেই। মানুষ (যাকে সাধারণত অবয়ব বা দেহ বলা হয়) তা-ও মূলত প্রাণই। বস্তু আসলে প্রাণ-শক্তিসম্পন্ন। এ দুয়ের মাঝে পার্থক্য করে দেখলে প্রকৃত

www.nagorikpathagar.org

ও অন্তর্নিহিত সত্য অনুধাবন করা যাবে না। প্রকৃতি বিজ্ঞানীরা 'পরমাণু' সম্পর্কে যে নতুন আবিষ্কারের কথা জানিয়েছেন, তাতে 'বস্তু' সম্পর্কিত আবহমান কাল থেকে চলে আসা ধারণার বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সৃষ্টি করেছে। এখন বস্তু ও প্রাণ-শক্তির দ্বিত্ব খতম হয়ে গেছে।

প্রখ্যাত দার্শনিক লাইবঞ্জ মনে করেন, বিশ্বলোক নিষ্প্রাণ ও চেতনাহীন নয়, সবকিছুই প্রাণময়। যদিও তাতে বিভিন্ন স্তর ও পর্যায় রয়েছে। তার নাম দেয়া হয়েছে মোনাডস—জীব হচ্ছে বিবর্তনধারার প্রথম পর্যায়। হোয়াইটহেড বলেন, সত্তার প্রত্যেকটি দিকে অনুভূতি এবং অন্যান্য দিকের সাথে আকর্ষণ-বিকর্ষণের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। সর্বত্র জীবনই জীবন। জীবনশূন্য কোথাও কিছু নেই। কুরআন মজীদের ঘোষণা থেকে এ-কথার যথার্থতা প্রমাণিত হতে পারে। ইরশাদ হয়েছেঃ আকাশমণ্ডলে ও ভূ-পৃষ্ঠে যা কিছুই আছে তার প্রত্যেকটিই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করছে।

আল্লাহর তসবীহ (পবিত্রতা ঘোষণা) করে না এমন একটি জিনিসও নেই। তবে একথা সত্য যে, তোমরা তাদের তসবীহ মোটে বুঝতে পার না।

এ আয়াতদ্বয় থেকেও এ-কথাই জানা যায় যে, বিশ্বলোকের কোথাও কোন নিষ্প্রাণ-নির্জীব বা চেতনাহীন জিনিস বা পদার্থের অস্তিত্ব নেই। কেননা নির্জীব-নিষ্প্রাণ-চেতনাহীন বস্তুনিচয়ের তসবীহ পাঠ মানুষের পক্ষে দুর্বোধ্য; বরং বিবেকের বিচারে অসম্ভব। তাহলে বস্তুনিচয়ের এ চেতনা অনুধাবনের জন্য কোন বস্তুগত উপায়-কোন যন্ত্রের সাহায্য নেয়া যেতে পারে কি?.....—এ রকম কোন যন্ত্র আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি। মানুষ ও জীব-জন্তুর চেতনাকে যখন সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির সাহায্যে অনুধাবন করা যেতে পারে, তখন উদ্ভিদ ও প্রস্তরের চেতনা-অনুভূতিকে যন্ত্রের সাহায্যে অনুধাবন করা কি করে সম্ভব হতে পারে! উদ্ভিদ জগতে লক্ষ্য করা যায়, বীজ শিকড় বের করেছে এবং তদ্দারা মাটির রস গ্রহণ করে বেঁচে থাকছে। খুব কাছে প্রয়োজনীয় রসদ বর্তমান না থাকলেও মাটির গভীরে তা রয়েছে—বীজের এ অনুভূতি আছে বলে স্পষ্ট মনে হচ্ছে। এ কারণেই যে শিকড় দূরে দূরে ও মাটির অতল গভীরে চলে যাচ্ছে না, তা কি মনে করা যেতে পারে? কোন কোন গাছ আত্মরক্ষার জন্যেই যে সারা গায়ে কাঁটার জাল বুনছে না, তা কি জোর করে বলা চলে?

যেসব গাছের ফল ও পাতার স্বাদ তিক্ত, তা যে মানুষ ও জন্তু জানোয়ারের কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে নয়, তা কি কেউ বলতে পারে? প্রতিটি জীবনেরই বংশরক্ষা ও বংশবৃদ্ধির বাসনা থাকে। মিষ্টি ফলের মধ্যে লুক্কায়িত থাকে বীজ। এ বীজ বংশবৃদ্ধির জন্যেই; কোন কোন বীজের গায়ে কাঁটা থাকে এবং তা অন্য পশু-পাখির গায়ে আটকে স্থানান্তরে গিয়ে অঙ্কুরিত হয়। বাতাসের সাহায্যেও উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধির সহায়তা হয়। চেতনা ছাড়া এসব বিস্ময়কর

www.nagorikpathagar.org

ব্যাপার কী করে নিরন্তর ঘটতে পারছে? বিশেষ সুরের গানের ঝঙ্কার শুনে কোন কোন গুল্ম-লতার নাকি শ্রীবৃদ্ধি ঘটে! চেতনা না থাকলে তা কী করে সম্ভব?

বিশ্বলোকের যে দিকেই দৃষ্টিপাত করা যাক, চারদিকে মনোহর শোভামণ্ডিত বিচিত্র ধরনের ছবি। প্রকৃতির এ রূপ ও সৌন্দর্য নিশ্চয়ই কোন সুদক্ষ শিল্পীর অপূর্ব অতুলনীয় প্রতিভার ও দক্ষতার পরিচয় বহন করে। অনাদিকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সৃজন কর্মের ধারাবাহিকতা ও শিল্পকুশলতা কোন গোপন রূপকার কিংবা দক্ষ কারিগরের মগজের অস্তিত্বের অবিস্থিতি নিঃসন্দেহ করে তোলে। শিল্পীকে কিছু আঁকতে কত না মগজ চালনা ও কায়িক পরিশ্রম স্বীকার করতে হয়। এরূপ এক শিল্পীর দক্ষ হস্ত ছাড়া যখন সাদা কাগজে কিংবা ক্যানভাসের ওপর রঙিন চিত্র ফুটে উঠতে পারে না, তখন চরাচরের পৃষ্ঠার ওপর এরূপ চিত্তহারী রঙিন দৃশ্যাবলী নানা বর্ণের ফুল, সবুজ-শ্যামল শোভামণ্ডিত গাছপালা-বৃক্ষলতা, মধুর কাকলির পাখি, সুদৃশ্য মাছ, ঝিনুক, প্রস্তর, জন্তু-জানোয়ার ও মানুষের আকর্ষণীয় রূপশোভা একজন সুদক্ষ প্রতিভা ব্যতিরেকে কী করে সম্ভব হতে পারে? সুষ্ঠু চিন্তা-বিবেচনা ছাড়া এতখানি নিয়ম-শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য-ভারসাম্য, সুষ্ঠুতা ও সংগঠন স্বতঃই সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব ব্যাপার। এসব যদি চেতনাহীনভাবে হয়ে থাকে, তাহলে এসবের নিয়ম-শৃঙ্খলা বিবর্জিত হওয়াই ছিল স্বাভাবিক।

গ্রহলোকের নিয়ম-শৃঙ্খলা লক্ষণীয়। গ্রহসমূহের নিয়ম-শৃঙ্খলা ও সংগঠন অনুধাবনে শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদদের সূক্ষ্ম চিন্তা-শক্তিও অক্ষমতা প্রকাশ করেছে। আকাশমণ্ডল এক সীমাহীন সমুদ্র। স্বয়ং মানুষের ক্ষুদ্রায়তন দেহসত্তাও মহারহস্যের কুজ্ঝটিকায় নিমজ্জিত। তার মধ্যে আকাশ পৃথিবীর রহস্য সন্ধানকারী ও মহাশূন্যে বিস্তীর্ণ তারকারাজির পর্যবেক্ষণকারী জান-বুদ্ধি-বিবেক-প্রতিভার সৃষ্টি হল কী করে? বিবেক-বুদ্ধির কথা বাদ দিয়ে শুধু দেহসত্তার বিচার-বিবেচনা করলেও দেখা যাবে, সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠন, সে সবের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা ও পরস্পরের সহযোগিতার ব্যবস্থা এবং প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জন্যে বিশেষ ধরনের কাজের বিধান করা কার দ্বারা সম্ভব হয়েছে? চেতনাহীনভাবে এরূপ কর্মবণ্টন কেমন করে সম্ভব হল? এসব এবং এ ধরনের অন্যান্য কথা চিন্তা করলেই এক মহাশক্তিমান সত্তার অস্তিত্ব অপরিহার্য হয়ে ওঠে। আর এ মহান সত্তা যে একমাত্র আল্লাহ্‌র, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না।

www.nagorikpathagar.org

বিবর্তনবাদের তত্ত্ব

প্রাথমিক কথা

বর্তমান জগৎ তার সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতি দর্শনের ওপর ভিত্তিশীল—তা ধনতন্ত্রী সমাজ হোক কিংবা সমাজতন্ত্রী তথা কমিউনিস্ট—তার মূল কথা হল মানুষ ক্রমবিকাশ পদ্ধতিতে (By the Process of Evolution) পশুর (Beasts—বানর অথবা বানর জাতীয় পশুর) বংশধর রূপেই ভূ-পৃষ্ঠে আত্মপ্রকাশ করেছে। এখনকার স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে একথারই শিক্ষা দেয়া হয়। প্রভাবশালী মতাদর্শসমূহে শুরুতেই ধরে নেয়া হয়, মানুষ 'মানুষ' নয়,—নয় স্বতন্ত্র উদ্দেশ্যসম্পন্ন ও বিশেষ পরিকল্পনায়, বিশেষ দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট ও বিশেষ মর্যাদার অধিকারী কোন সত্তা; বরং এরা হচ্ছে পশুর-ই অধঃস্তন পুরুষ। ক্রমবিকাশ ধারায় রূপ ও আকার-আকৃতি পরিবর্তিত জীবমাত্র। বর্তমান বিশ্বচিন্তার এটাই হল সর্বাধিক প্রভাবশালী মতাদর্শ। এ মতাদর্শের ভিত্তিতেই রচিত হয়েছে পুঁজিবাদ, একনায়কতন্ত্র তথা ফ্যাসীবাদ এবং সমাজতন্ত্র তথা কমিউনিজম প্রভৃতি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদ। কাজেই বর্তমান দুনিয়ার মানুষ ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক—সচেতন কিংবা অবচেতনভাবে—এই মতে যে গভীরভাব প্রভাবিত, তা কোনক্রমেই অস্বীকার করা যেতে পারে না।

কিন্তু এ পর্যায়ে প্রত্যেক চিন্তাশীল মানুষের মনেই পাল্টা প্রশ্ন তীব্রভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। মানুষ সম্পর্কে এই যে বলা হচ্ছে, তারা সাধারণ জীবেরই বংশধর (Descendant) মাত্র, তারা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য ও মর্যাদার অধিকারী সৃষ্টি নয়, এর মূলে আদৌ কি কোন সত্য নিহিত আছে? আছে একথার সত্যতা প্রমাণের কোন অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ? আছে এর কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি?

প্রশ্নটির গুরুত্ব আপনি কিছুতেই অস্বীকার করতে পারেন না। এ দুনিয়ায় জীবন-যাপনের জন্যে সর্ব প্রথমেই একক ও সামাজিকভাবে আপনাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবেঃ আপনি এবং আপনারই মত আকার আকৃতিসম্পন্ন আর যারা আছে, তারা সবাই মানুষ, না নিতান্তই পশু। অন্যথায় আপনার নিজের জীবন আপনি পশু হিসেবে শুরু করবেন—যাপন করবেন, না যাপন করবেন মানুষ রূপ; এবং আপনারই মত আরো যারা যারা রয়েছে, তাদের প্রতি আপনি কিরূপ আচরণ

www.nagorikpathagar.org

করবেন—মানবিক না পাশব; তা ঠিক করা আপনার পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর হবে না। আর তা-ই যদি না হল, তাহলে আপনার জীবন কিছুতেই সুষ্ঠু ও সুসংবদ্ধ হতে পারে না।

শুধু তা-ই নয়। বর্তমান বিশ্বে এই যে মারামরি ও হানাহানি চলছে, মানুষকে ধ্বংস করার জন্যে মারণাস্ত্র নির্মাণের এই যে বিশ্বব্যাপী প্রস্তুতি ও কঠিন প্রতিযোগিতা প্রচণ্ড হয়ে দেখা দিয়েছে, মানুষ মানুষের দ্বারা বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত হচ্ছে, পুঁজিবাদ, সমাজবাদ ও একনায়কত্ববাদের হাতিয়ার দিয়ে অসহায় মানুষকে যে শোষিত, বঞ্চিত ও প্রতারিত করা হচ্ছে, তা মানুষকে 'পশুর সন্তান'—'নিকৃষ্টতম পশু ও ইতর প্রাণিকুলেরই একটা অংশ মনে করার অনিবার্য ফল কিনা, তা বুঝতে পারা আপনার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হবে না। আর তা-ই যদি না হল, তাহলে আপনি না নিজেকে, না নিজের জীবনকে বুঝতে ও চিনতে পারলেন, আর না পারলেন প্রকৃত বিশ্বসমস্যাকে অনুধাবন করতে। এর ফলে আপনার জন্ম ও জীবনের চরম অর্থহীনতা ও করুণ ব্যর্থতা স্বীকার না করে কোনই উপায় থাকতে পারে না।

মানুষ পশুর উত্তরপুরুষ কিনা, উল্লুক ও লাঙুলবিহীন বানর-ই মানুষের পূর্বপুরুষ কিনা; সে সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে নানাভাবে বিচার-বিবেচনা ও যাচাই-পরীক্ষা চালানো যেতে পারে। কিন্তু বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞানের চরম উন্নতি সাধিত হয়েছে এই যুগে। সর্ববিষয়ে বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেষণই একালে মানুষের একমাত্র নীতি। বর্তমান আলোচনায় আমরা এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতেই বিষয়টি বিচার-বিশ্লেষণ ও যাচাই পরখ করতে প্রয়াস পাব। কাজেই এ পর্যায়ে আমাদের একমাত্র প্রশ্ন—মানুষ কি সত্যিই পশুর বংশধর? ক্রমবিকাশের নিয়মে পশুর রূপান্তর ও আঙ্গিক পরিবর্তন ঘটার ফলেই কি মানুষের আত্মপ্রকাশ সম্ভব হয়েছে?....Is evolution a fact—a scientific idea? মানুষ পশু থেকে অভিব্যক্ত (evolved) হয়ে বর্তমান আকার-আকৃতি লাভ করেছে? এ মত কি আমাদের জীবন ও বিশ্বসমাজকে প্রভাবান্বিত করেছে? বিজ্ঞান কি একথাকে যথার্থ মনে করে? বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে এ মত কি টিকতে পারে?

জৈবিক ক্রমবিকাশ (ORGANIC EVOLUTION)

ক্রমবিকাশ বা ইভোল্যুশন (evolution) কথাটি উদ্ভিদ পশু ও মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বলা হয়, এক ধরনের জীবন পরিবর্তিত (Transformed) হয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের জীবনে রূপায়িত হয়। আর তাকেই বলা হয় ক্রমবিকাশ বা অভিব্যক্তিবাদ। ১৯৬৪ সনের ২৩শে আগস্ট Houston post পত্রিকায় জনৈক লেখক এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এ ভাষায়ঃ

www.nagorikpathagar.org

'Evolution, in very simple terms, means that life progressed one-celled organism to its highest state, the human being, by means of a series of biological changes taking place over million of years'.

সহজ কথায় ক্রমবিকাশ এর অর্থ হচ্ছে, এককোষ সম্পন্ন জীব শতকোটি বছর কালধরে ক্রমাগত বিবর্তিত হতে হতে সর্বোচ্চ মানের জীবে পরিণত হয়েছে দৈহিক পরিবর্তনের ধারাবাহিকতার মাধ্যমে।

The Rever of Life গ্রন্থপ্রণেতা লিখেছেনঃ

When living thing came out of the sea to live on land, fins turned into legs, gills into lungs, soales into fur. [Rutherford platt 1956-p.VII]

জীবন্ত জিনিস সমুদ্র থেকে স্থলভাগে উঠে এলে তার ডানা পা হয়ে গেল এবং শ্বাসযন্ত্র হৃৎপিণ্ড হয়ে গেল, আর আঁশগুলো হয়ে গেল লোম।

১৯৬৬ সনে প্রকাশিত World Book Encyclopaedia লিখেছেঃ

"The theory of organic evolution involves these three main ideas: 1. Living things change from generation to generation, producing discendants with characteristics; 2. This process has been going on so long that it has produced all the groups and kinds of things now living as well as others that lived long ago and have died out, or become extinct; 3. There different living things are related to each other.

দৈহিক ক্রমবিকাশ মতটি তিনটি মৌল ধারণা সম্বলিতঃ ১। জীবন্ত জিনিসসমূহ এক বংশের পর আর এক বংশে পরিবর্তন, বিশেষ চরিত্রে বংশধর উৎপাদন; ২। এই পদ্ধতি চলতে চলতে দীর্ঘকাল ধরে এখন যারা জীবিত রয়েছে সেই প্রজাতিসমূহের গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। যেমন অন্যান্যরা, যারা মরে শেষ হয়ে গেছে কিংবা বেঁচে আছে; তা বিভিন্ন জীবিত গোষ্ঠীসমূহ পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত।

বিভিন্ন আকার-আকৃতির জীবন্ত বস্তুর মধ্যে সামান্য ধরনের যে তারতম্য ও পার্থক্য দেখা যায় বা যা কিছু পরিবর্তন ঘটে, তাকেই কিন্তু ইভোল্যুশন বা ক্রমবিকাশ মনে করা যায় না। কেননা তা তো অতি সাধারণ বৈচিত্র (Variety) থেকে উদ্ভূত মাত্র এবং এ ধরনের বৈচিত্র্য বা বৈসাদৃশ্য তো আমরা সব সময়ই সমস্ত উদ্ভিদ, প্রাণিকুল ও মানুষের মধ্যে লক্ষ্য করে থাকি। যেমন বিভিন্ন রকমের আকার-আকৃতির ও বিচিত্র বর্ণের বিড়াল রয়েছে এ দুনিয়ায়। এগুলো নিছক

www.nagorikpathagar.org

বিচিত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। তা কোনক্রমেই আঙ্গিক ও- জৈব ক্রমবিকাশ (Organic evolution) বলে অভিহিত হতে পারে না।

ক্রমবিকাশ পদ্ধতির কার্যকারিতায় কতটা সময় লেগেছে? এর জবাবে Professor T. Dolezhasky তাঁর 'Genetics and the Origin of Species' গ্রন্থে লিখেছেনঃ

Is surmised to be at the order of two billion [2,000,000,000] years.....from causes which now continue to be in operation, and which therefore can be studied experimentally.

অনুমান করা গেছে যে, দুই বিলিয়ন বছরকাল ধরে এই পদ্ধতি কাজ করেছে এবং এখনও তা চলছে। অতএব তা পরীক্ষামূলকভাবে অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

যদিও কোন কোন ক্রমবিকাশবাদী বিশ্বাস করেন যে, একজন স্রষ্টাই এই পদ্ধতির সূচনা করে দিয়েছেন। আর অনেকে আবার আজও শিক্ষা দিচ্ছেন যে, কোন স্রষ্টা ব্যতীতই জড়, অজীব ও অচেতন বস্তু (inamanimate) থেকেই জীবন উৎসারিত হয়েছে। ১৯৫৯ সনে শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত ডারউইন শতবার্ষিকীতে প্রখ্যাত ক্রমবিকাশবাদী স্যার জুলিয়াস হাক্সলী এ শ্রেণীর লোকদের অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছিলেনঃ

'ক্রমবিকাশ মতাদর্শে অতি প্রাকৃতিক সত্তার স্বীকৃতির কোন অবকাশ নেই। পৃথিবী এবং এর অধিবাসীরা সৃষ্ট হয় নি, তারা ক্রমবিকাশের মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করেছে।'

ক্রমবিকাশ মতের সত্যতার সাক্ষ্য ও সমর্থন

উল্লিখিত সম্মেলনেই হাক্সলী সমবেত আড়াই হাজার প্রতিনিধির সম্মুখে বললেনঃ

আমরা সকলেই ক্রমবিকাশের সত্যতা স্বীকার করি..... জীবনের ক্রমবিকাশ মতটি এখন আর নিছক একটা মতবাদ মাত্র নয়। এটা এখন একটা বাস্তব ব্যাপার .....আমাদের সমগ্র চিন্তা-ভাবনার এটাই একমাত্র ভিত্তি।

১৯৬৩ সনের Biology for You গ্রন্থটিও এ মতটিকে সমর্থন করে বলেছেঃ

'All reputable Biologists have agreed that the evolution of life on the earth is an established fact'. (by B.B. Vanee and D. F. Mullar. 1963 P. 531)

সকল প্রখ্যাত জীব-বিজ্ঞানী এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ এক মত যে, পৃথিবীতে জীবনের ক্রমবিকাশ একটা প্রতিষ্ঠিত সত্য।

www.nagorikpathagar.org

যুক্তরাষ্ট্রের জনৈক বিশ্ববিদ্যালয়-সভাপতি বলেছেনঃ

It takes on overwhelming Prejudice to refuse to accept the facts, and anyone who is exposed to the evidence supporting evolution must recognize it as an historical fact. [The New Orlean's times Picayune. May 7. 1965]

সত্যকে মেনে নিতে বাধ্য হয়ে পড়ায় সাধারণত একটা কুসংস্কার লক্ষ্য করা যায়। ক্রমবিকাশ সমর্থক যেসব প্রমাণাদি পাওয়া গেছে, সেগুলোকে ঐতিহাসিক সত্য রূপেই মেনে নিতে হবে।

অনেক ধর্মনেতাও এ মতই পোষণ করেন। ১৯৬৬ সালের ৫ই মার্চের Milwaukee Journal-এ প্রতিবেদন দিয়েছে যে, সেন্ট্-জ্যামস্-এর ক্যাথলিক চার্চের ধর্মযাজক ক্রমবিকাশবাদ সমর্থন করে একটি বলিষ্ঠ বিবৃতি প্রচার করেছেন। বলেছেনঃ There is no doubt about the fact of evolution (ক্রমবিকাশ যে বাস্তব সত্য তাতে কোন সন্দেহ নেই।)

ধর্মযাজক ক্রমবিকাশবাদকে যে fact বা চূড়ান্ত সত্য বলে অভিহিত করেছেন তা অবশ্যই লক্ষণীয়।

বর্তমান সময় পর্যন্ত যারাই জনগণের চিন্তাশক্তিকে প্রভাবিত করেছে—তারা কমিউনিস্ট হোক কি অকমিউনিস্ট দেশের লোক, তাদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকেরাই—ক্রমবিকাশবাদকে একটা বাস্তব সত্যরূপে গ্রহণ করে নিয়েছে। Webster রচিত Third New International Dictionary এ সম্পর্কে বলেছেঃ ক্রমবিকাশবাদ হচ্ছে an actual happening in time or space—সময় বা স্থানে সংঘটিত একটা বাস্তব ব্যাপার—a verified statement—'একটি পরীক্ষিত ব্যাপারের বাস্তব প্রকাশ'।

কিন্তু সত্যিই কি তাই?

সে যা-ই হোক, ক্রমবিকাশবাদকে যাঁরা একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য বলে বিশ্বাস করেন, তাঁদের মতামত গভীরভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ এবং যাঁচাই ও পরখ করলে বিস্মিত হতে হয়। সাধারণ মানুষ এ বিষয়ে তেমন অবগত না হলেও এ কথায় কোনই সন্দেহ নেই যে, এ বিষয়ে যতটা মতবিরোধের উদ্ভব হয়েছে, সম্ভবত বিজ্ঞানের অপর কোন শাখা বা প্রশাখায় ততটা মতবিরোধ কখনই দেখা দেয়নিঃ

উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় ১৮৫৯ সালে ক্রমবিকাশবাদের প্রধান প্রবক্তা চার্ল্স ডারউইন তার The Origin of Species গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে লিখেছিলেনঃ

Long before the reader has arrived at this part of my work a

www.nagorikpathagar.org

crowd of difficulties with have occurred to him. Some of them are so serious that to this day I can hardly reflect on them without being in some degree staggered.

পাঠক দীর্ঘদিন পূর্বে আমার কাজের এই অংশ সম্পর্কে যখন জানতে পেরেছিল তখন সে সমস্যাবলী একটি বিরাট ভিড়ের সম্মুখীন হয়ে থাকবে। তার মধ্যে কতগুলো এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, কিছুটা ঘূর্ণিত না হয়ে তার উপর আলোকপাত করা আমার পক্ষেও খুবই দুরূহ ব্যাপার।

প্রশ্ন হলো, ক্রমবিকাশ কতখানি চূড়ান্ত সত্য ছিল ডারউইনের জীবনে, যে কারণে তাঁকে সমস্যা ও কঠিন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল?

ডারউইনের পর একশ' বছরেরও বেশী সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। এ পর্যন্ত এ বিষয়ে যত ব্যাপক ও গভীর অনুসন্ধানকার্য চলেছে, তাতেও কি ক্রমবিকাশ মতবাদটি বাস্তব সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে? ১৯৬৬ সালের Science Year পত্রিকা প্রতিবেদন দিয়েছেঃ

Archaeology. despite its triumph remains almost at the beginning of the immense task of reconstructing mankind's history.

প্রত্নতত্ত্ব বিদ্যার বিপুল জয় হওয়া সত্ত্বেও এখনও তা মানব ইতিহাস রচনার সেই প্রাথমিক পর্যায়েই অবস্থান করছে।

যা শুধু প্রাথমিক অবস্থায় পড়ে রয়েছে, তা কখনো চূড়ান্ত ও শাশ্বত সত্য (established fact) রূপে পরিগণিত হতে পারে না।

আসলেই ব্যাপারটি paradoxical. আপাতবিরোধী হলেও সত্য—সত্যবিরোধী নয়। স্বনামখ্যাত ক্রমবিকাশবাদী অধ্যাপক Dob Zhanskay তাঁর The Biological Basis of Human Freedom গ্রন্থে ঘোষণা করেছেনঃ

'Evolution as a historical fact was proved beyond reasonable doubt not later than in the closing decades of the nineteenth century'

ঐতিহাসিক বাস্তব সত্য হিসেবে যুক্তিসঙ্গত সংশয় মুক্তরূপে প্রমাণিত হয়েছে মাত্র ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ মুহূর্তে।

কিন্তু এরই দুপৃষ্ঠা পর তিনি আবার বলেনঃ

There is no doubt that both the historial and the causal aspect of the evolutionary process are far from completly known..... The causes which have brought about the development of

www.nagorikpathagar.org

the human species can be only dimly discerned'.
[1956. PP. 6.8.9]

ক্রমবিকাশমূলক পদ্ধতির ঐতিহাসিক ও কার্যকরণ সম্বন্ধীয় দিক যে সম্পূর্ণরূপে অজানা রয়ে গেছে, তাতে কোনই সন্দেহ নেই.....যে সব কার্যকরণ মানবীয় প্রজাতি সমূহের উন্নয়ন সাধন করেছে তা খুব অস্পষ্টভাবেই প্রত্যাখান করা যেতে পারে।

একদিকে ক্রমবিকাশবাদকে চূড়ান্ত ও অকাট্য সত্য বলে দাবি করা হচ্ছে। অপরদিকে ও সেই সঙ্গে মত প্রকাশ করা হচ্ছে যে, তার কার্যকারণ ও প্রক্রিয়া far from completely known—পুরোপুরি অবহিত হতে অনেক দেরী। তা অস্পষ্ট ও অনুজ্জ্বলভাবে উপলব্ধি করা যেতে পারে মাত্র। আর এতে যে সব অসুবিধা রয়েছে তা-ও নাকি 'টলটলায়মান'।

ব্যাপার শুধু এতটুকুই নয়। The Encyclopaedia Britanica বলেছেঃ

We are not in the least doubt as to the fact of evolution ..... The evidence by now is overwhelming'

ক্রমবিকাশ তত্ত্বের বাস্তবতার ব্যাপারে আমরা সামান্য সন্দেহের মধ্যেও নই। বর্তমানে তার প্রমাণ তো অভিভূতকারী।

কিন্তু এরই কয়েক পৃষ্ঠা পর তাতেই বলা হয়েছেঃ

That evidence very imperfect and often interrupted by gaps.

প্রমাণ বড়ই অসম্পূর্ণ; বরং ফাঁকগুলির কারণে তা বিঘ্নিত।

তাতে আরো বলা হয়েছেঃ

যে মূল পদ্ধতি এসব পরিবর্তনসমূহ বাস্তবায়িত করেছে সে বিষয়ে আমরা আজ পর্যন্ত সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

Charles Darwin নামক জীবনীগ্রন্থে প্রখ্যাত ক্রমবিকাশবাদী স্যার গেভীন দ্য বিয়ার (Sir Gabin de yeer) লিখেছেনঃ

He (Darwin) predicted that the evidence would, one day be forthcoming, and that day has arrived, for the series of fossils just mentioned provides the crucial evidence that man did evolve.

ডারউইন অনুমান করেছিলেন যে, প্রমাণ অবশ্যই একদিন পাওয়া যাবে। আর সেদিন এখন এসে গেছে। ফসিলের ক্রমধারা যথাযথভাবে প্রমাণ করছে যে, মানুষ ক্রমবিকাশ লাভ করেছে।

অতঃপর ১৯৬৪ সনে প্রকাশিত The Fossil Evidence for Human

www.nagorikpathagar.org

Evolution নামক বইতে অপর এক নামকরা ক্রমবিকাশবাদী W. Legros clark-এর লেখায় আমরা পড়িঃ

The chances of finding the fossil remain of actual ancestor or even representatives of the local geographical group which provided the actual ancestors are so fantastically remote as not to be worth consideration.

The Interpretation of the paleontological evidence of hominid evolution which has been offered in the preceding chapters is a provisional interpretation. Because of the incompleteness of the evidence, it could hardly be otherwise. [PP41, 188]

ফসিলকে প্রকৃত বংশধর কিংবা স্থানীয় ভৌগোলিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বকারীরূপে দেখতে পাওয়া—যা কোনটির প্রকৃত বংশধর তা প্রমাণ করতে পারে। এত অদ্ভুতভাবে এটা সুদূরবর্তী ব্যাপার যে, তা বিবেচনা করাও অর্থপূর্ণ নয়।

মানবীয় বিবর্তনের নৃতাত্ত্বিক প্রমাণের ব্যাখ্যা—যা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে পেশ করা হয়েছে, তা লোকপ্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা মাত্র। কেননা প্রমাণ তো অসম্পূর্ণ, তার অন্যথা হওয়া সুকঠিন।

The Basis of Human Evolution নামক গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে Science Magazine ১৯৬৫ সালে লিখেছেঃ

The reader.....may be dumbfounded that so much work has settled so few question.

পাঠক... হতবাক হতে পারে এই দেখে যে, এত এত কাজ মাত্র কয়েকটি প্রশ্নেরই জওয়াব দিতে পেরেছে।

আর ১৯৬৬ সনের World book Encyclopaedia-য় আমরা পড়িঃ

No one should make the mistake of saying that evolution is fully understood.

বিবর্তনতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারা গেছে, এই কথা বলে যেন কেউ ভুল করে না বসেন।

১৯৬৬ সনে Science News Letter বলেছেঃ

The fight is among scientists over just how man did evolve. when he did so and what he looked like's.

www.nagorikpathagar.org

মানুষ কতটা বিবর্তিত হয়েছে এবং যখন হচ্ছিল তখন তা কার মত দেখাচ্ছিল, বিজ্ঞানীদের মধ্যে এ নিয়ে প্রচণ্ড তর্ক যুদ্ধ চলছে।

যখন কোন বিশেষ পদ্ধতি সম্পর্কে জানা যাবে না যে, তা কেন, কেমন করে কখন ও কোথায় ঘটলো এবং যা ঘটলো তা কি ঘটলো, তখন কি তাকে একটা fact বা বাস্তব সত্য বলে—বাস্তবিকই সংঘটিত একটি সত্য ঘটনারূপে—মেনে নেয়া যায়? সে বিষয়ের বিবৃতিকে কি মানা যায় সত্যভাষণ বলে? কেউ যদি এসে তোমাকে বলে যে, একটি আকাশচুম্বি প্রাসাদ নিজস্বভাবে গড়ে উঠেছে ইট-সুরকী-লোহা-লক্কড় দিয়ে এক শূন্য ভূমির উপর; কিন্তু তা কেমন করে সম্ভব হল, কখন হল, কোথায় হল এবং কেনই বা হল, আর সে পদ্ধতিটির কার্যকারিতার সময় তা কি রকম দেখাচ্ছিল তা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থেকে যাবে, তখন তাকে—এই রূপান্তরকে কি তুমি একটা বাস্তব সত্য এবং প্রকৃত ভাষণ বলে স্বীকার করে নিতে রাযী হতে পার?

সত্যি কথা এই যে, ক্রমবিকাশবাদকে কিছুতেই একটি বিজ্ঞানসম্মত সত্য বলে মেনে নেয়া যায় না। ক্রমবিকাশবাদী Clark একথা স্বীকার করেছেন তাঁর একটি বিবৃতিতে। তাতে তিনি বলেছেনঃ

> What was the ultimate origin of man?...unfortunately any answers which can at present be given to these question are based on indirect evidence and thus are largely conjectural. [The Fossil Evidence for Human Evolution P. 174]

মানুষের চূড়ান্ত মৌল কি ছিল.....দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, এই প্রশ্নের যে উত্তর বর্তমানে দেয়া যেতে পারে তা পরোক্ষ প্রমাণের উপর ভিত্তিশীল। অতএব তার বেশীর ভাগই অনুমান মাত্র।

'আমেরিকান এসোসিয়েশন ফর দি এ্যাডভান্সমেন্ট অব্ সাইন্স' এর প্রাক্তন সভাপতিও এইরূপ দ্বিধান্বিত মনোভাবেরই প্রকাশ করেছেন। তিনি ক্রমবিকাশ মত সমর্থন করে'—Science Magazine-এ যে প্রবন্ধ লিখেছেন, তাতে বলেছেনঃ

> 'এখন তুমি যদি প্রাগৈতিহাসিক যুগে অনুমানমূলক প্রমোদ ভ্রমণে যেতে উচ্ছুক হয়ে থাক, তাহলে একটা যুগকে তুমি কল্পনায় ধরে নাও.... যখন সমধর্মাশ্রিত একাধিক জাতির—মহাজাতি থেকে প্রজাতিসমূহ দৃষ্টিগোচর হয়ে উঠলো.....তা দ্রুত অতিক্রম করে এলো হাজার বছরের পথ, এরই কারণে বর্তমানের খবরাখবরের অধিকাংশই কেবলমাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করে.....নির্ভর করে প্রথম লিখিত বিবরণ সম্পর্কে পাওয়া তথ্যাদির ইচ্ছেমত ব্যাখ্যা দেয়ার উপর .....তা থেকে উপেক্ষাভরে ফেলে যাওয়া কিছু সত্য হয়তো বা কুড়িয়ে পাওয়া যেতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

বস্তুত লিখিত রেকর্ড সংরক্ষণ শুরু হয়েছে কয়েক হাজার বছর আগে। আর ক্রমবিকাশ পদ্ধতি যা অগ্রসর হয়েছিল বলে অনুমান করা হচ্ছে তা যে কেবলমাত্র অনুমান, ইচ্ছেমত ব্যাখ্যা, ধারণা-কল্পনা এবং উচ্চতরভাবে শুধু ধরে নেয়ার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল, তা-ও সর্বজনস্বীকৃত। ডারউইনের প্রখ্যাত বই The Origin of Species. সম্পর্কে খ্যাতনামা বৃটিশবিজ্ঞানী L. M. Davies একথা বলেছিলেন;

'It has been estimated that no fewer than 800 phrases in the subjunctive mood such as let us assume or we may well suppose (etc) are to be found between the covers of Darwin's Origin of Species alone'.

ডারউইন লিখিত 'অরিজিন অব স্পেসিজ' বইয়ের উপর পৃষ্ঠায় 'আমরা ধরে নেই', 'আছে বলে ভান করি'—'এটা ভালোভাবে ধরে নেয়া যেতে পারে', এই ধরনের সন্দেহমূলক মনোভাব প্রকাশকারী শব্দ আটশরও অনেক বেশী আছে বলে অনুমান করা গেছে।

এরূপ অবস্থায় একজন নিষ্ঠাবান সন্ধানী পাঠক কিছুমাত্র আশাবাদী বা নির্ভরশীল ও আস্থাশীল হয়ে উঠতে পারে না—সে বরং বড় আঘাত পাবে—মর্মাহত হবে, যখন সে নির্ভরযোগ্য ও সত্যনিষ্ঠ কোন তথ্য পাওয়ার উদ্দেশ্যে এ বইটি পড়তে শুরু করবে। কেননা সে নিজের চোখেই দেখতে পাবে যে, ক্রমবিকাশ সংক্রান্ত মতাদর্শ উত্থাপনকারী চিন্তাবিদ অন্ধভাবে ও অনমনীয় গোঁড়ামী নিয়ে এক দিকে দাবি করছেন যে, ক্রমবিকাশ একটা বাস্তব সত্য। অথচ তিনি নিজেই স্বীকার করছেন যে, এ পর্যায়ের সবগুলো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সন্দেহমূলক এবং ধরে নেয়া কথা মাত্র। তার মূলে অনস্বীকার্য সত্য তথ্যের একবিন্দু অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।

প্রকৃত ব্যাপারও তা-ই। Dr. T. N. Tahmisian নামক এ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের একজন শরীরতত্ত্ববিদ (Physiologist) বলেছেনঃ

'Scientist who go about teaching that evolution is a fact of life are great con man, and the story they are telling may be the greatest hoax, ever, in explaining evolution we do not have one iota of fact. [Lutheran witness Reporter, November 1465]

বিবর্তন জীবনের চূড়ান্ত সত্য একথা শিক্ষাদানের জন্য যে বিজ্ঞানী এগিয়ে আসে সে মুখস্থ বিদ্যার লোক। সে যে গল্প আবৃত্তি করে, তা চাতুরী বা প্রতারণা মাত্র। এমনকি বিবর্তনতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গেলে আমরা বাস্তব প্রমাণের একটি অণু-ও পাই না।

তিনি এটিকে বলেছেনঃ

www.nagorikpathagar.org

'a tangled mishmash of guessing games and figure juggling' [The Fresno Bee, August 20 1959. P. I-B]

এটা একটা অনুমান খেলার জটপাকানো তেলেস্‌মাতি ব্যাপার এবং তা হল সংখ্যাতাত্ত্বিক প্রতারণা মাত্র।

J. W. klotz একটি কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান এবং বিজ্ঞানী। তিনি ১৯৬৫ সালে বলেছিলেনঃ

"acceptance of evolution is still based on a great deal of faith" [Lutheran witness Reporter, Nov. 14, 1965]

ক্রমবিকাশবাদ সত্য বলে মেনে নেয়া এখন পর্যন্ত একটা বিরাট অন্ধ বিশ্বাসের ব্যাপর মাত্র। (আর নিছক বিশ্বাসের মূলে অকাট্য যুক্তি থাকা জরুরী নয়।)

এরূপ জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব কি করে হল, তা ভালভাবে বুঝবার জন্যে ক্রমবিকাশ মতাদর্শের উৎপত্তির পটভূমির উপর তীক্ষ্ম দৃষ্টি নিক্ষেপ বিশেষ ফলপ্রসূ হবে। এ পর্যায়ে নিম্নোদ্ধৃত প্রশ্নগুলো বিবেচনা করা যেতে পারেঃ

ক্রমবিকাশবাদের বর্তমান ধারণার সূচনা কবে ও কখন হলো?

তা কি করে এতটা উৎকর্ষ লাভ করল?

এ মতটির বর্তমান অবস্থা ও মর্যাদা (status) কি?

ক্রমবিকাশবাদে বিশ্বাসীদের নিজেদের মাঝেই এ নিয়ে এত সংশয়-সন্দেহ এবং পরস্পর মতপার্থক্যের সৃষ্টি হল কেন?

আর প্রথমেই আমরা যদি সত্য পর্যবেক্ষণের সমস্ত প্রকৃত প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি প্রয়োগ করি এবং তারপরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, তাহলে সেগুলি কিরকম দেখাবে?

ক্রমবিকাশ মতের রূপান্তর

কতিপয় প্রাচীন দার্শনিক যদিও ক্রমবিকাশ মতাদর্শের নামে একটা মত প্রচার করেছেন; কিন্তু সে মত তখনও খুব ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করতে পারে নি। মধ্যযুগের জীববিজ্ঞানমূলক রচনাবলীতেও এ ধরনের চিন্তা যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করেছে। যেমন বলা হয়েছে, ফড়িং, মৌমাছি এবং ইঁদুর ইত্যাদি সবই অ-জীবন্ত বস্তু থেকে উদ্ভূত। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিগত দুই শতাব্দী পর্যন্ত এই আঙ্গিক বিবর্তন ও ক্রমবিকাশ মতটি বিদগ্ধ সমাজে কিছুমাত্র গুরুত্ব লাভ করতে সক্ষম হয় নি।

প্রাচীন মতবাদগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম স্বীকৃতি লাভ করে ইংরেজ প্রকৃতিবাদী Erasmus Darwin (চার্লস্ ডারউইনের দাদা) এবং ফরাসী বিজ্ঞানী Comte de Buffon; এবং তা অষ্টাদশ শতাব্দীর কথা। তাঁদের বক্তব্য ছিল, যখন একটি

www.nagorikpathagar.org

উদ্ভিদ কিংবা একটি পশুপ্রাণী তার পরিবেশ থেকে একটা নতুন বিশেষ গুণ (characteristic) অর্জন করে, তখন তা নিজের বাচ্চা-কাচ্চা বা সন্তানাদির মধ্যেও সংক্রামিত করতে পারে। ফলে তার মধ্যে এমন পরিবর্তন সংঘটিত হয়, যা ক্রমবিকাশ (Evolution) নামে অভিহিত হতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁরা উল্লেখ করেছেন, কোন কোন প্রাণীর দেহে অত্যন্ত পুরু-লৌহপাত সদৃশ চামড়া গড়ে উঠেছে। কেননা তারা ক্রমাগতভাবে প্রহার ও আঘাত খেয়েছে। তাঁদের দাবি হল, পরবর্তীকালে তাদের এই গুণ তাদের বংশাবলীর মধ্যেও সংক্রামিত ও সঞ্চারিত হয়েছে। ফলে তারা অধিকতর পুরু চামড়া নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে।

ঊনবিংশ শতকের শুরুতে ফরাসী বিজ্ঞানী Sean de Lamarck একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনি তাতে এই অর্জিত (acquired) গুণকে স্বীকৃতি দেন। কিন্তু তিনি বলেন, এটা আসলে মূল দেহ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গেরই প্রয়োজন ছিল এবং এই প্রয়োজনই এ ক্রমবিকাশের চালকশক্তি রূপে কাজ করেছে। তাঁর এই মত অনুযায়ী জিরাফগুলো লম্বা ঘাড় লাভ করেছে এ কারণে যে, তারা ঘাস খেতে গিয়ে গাছের উচ্চ শাখার পাতা খেতে চেষ্টা করেছিল। ফলে প্রত্যেক স্তরের বংশধরই অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ঘাড় লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।

একালের এ অর্জিত গুণের বংশানুক্রমিক সংক্রমণের প্রতি বিজ্ঞানীদের কতটা বিশ্বাস ছিল? charles Darwin নামের বইতে ক্রমবিকাশবাদী De Beer এ প্রশ্নের জবাবে বলেছেনঃ

> Nobody Would have thought of doubting it till the close of the nineteenth century..... The number of men before the nineteeth century who rejected the inheritance of acquired characters could be counted on the fingers of one hand. [P. 163]

ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাপ্তি-মুহূর্ত পর্যন্ত অর্জিত গুণের বংশানুক্রমিক সংক্রমণের ব্যাপারে কেউ-ই কোন সন্দেহ পোষণ করত না। তার পূর্বে যারা তা অগ্রাহ্য করেছিল তারা ছিল সংখ্যায় খুবই কম।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষকালে জার্মান বিজ্ঞানী August Weismann লেজুড়বিহীন ইঁদুর উৎপাদনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তিনি ওদের যৌনমিলনের পূর্বে ওদের লেজুড় কেটে দিয়েছিলেন। ১৯৬৬ সনের পাঠ্যবই Review Text in Biology-তে তার ফলাফল সম্পর্কে যে সংবাদ প্রকাশিত হয় তাতে বলা হয়েছিলঃ

> He repeated this procedure for 20 successive generations. The last generation proved to have tails as long as those of

www.nagorikpathagar.org

their ancestors. This was the first experimental proof that acquired characteristics, such as artificial taillesness are not inherited.

ক্রমাগতভাবে বিশ বছর পর্যন্ত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দেখা গেল যে, লেজহীন ইঁদুর লেজহীন বাচ্চা জন্ম দেয় নি। বাচ্চাগুলোরও সেই পূর্ববংশের ইঁদুরের ন্যায় লেজ রয়েছে।

কিন্তু অর্জিত গুণ বংশানুক্রমে চলে না কেন, তার কারণ দর্শাতে গিয়ে উক্ত রিপোর্টেই বলা হয়েছেঃ

Acquired characteristics are not inherited because environmental factors (Which do not affect the genes in the sex cell) cannot influence the next generation..

অর্জিত চারিত্র্য বংশানুক্রমিকভাবে সংক্রমিত হয় নি। কেননা পরিবেশগত কার্যকারণ (যা যৌন-কোষে বংশগত প্রভাব ক্রিয়া করে না) পরবর্তী বংশধরদের প্রভাবিত করতে পারে না।

নোবেল প্রাইজ বিজয়ী ও প্রজননবিদ্যা পারদর্শী H. J. Muller-ও এই কথা বলেছেন নিম্নোক্ত ভাষায়ঃ

Despite the strong influence of the environment in modifying the body as a whole, and even the protoplasm of its cells, the genes without the germ-cell of that body retain their original structure without specefic alterations caused by the modification of the body, so that when the modified individual reproduces it transmits to its offspring genes unaffected by its own acquired characters.

সামগ্রিকভাবে দেহ পরিবর্তনে পরিবেশের প্রবল প্রভাব থাকা সত্ত্বেও—এমনকি তার কোষের মৌল জীবনোপকরণ ও সেই দেহের অঙ্কুর কোষের মধ্যে দেহের পরিবর্তনের কারণে কোন বিশেষ ধরনের ব্যতিক্রম ছাড়াই তার আসল কাঠামোটা বহালই থেকে যায়। এই কারণে যখন পরিবর্তন ব্যক্তিসত্তা পুনরায় উৎপাদন করে, তখন তা বাচ্চা-কাচ্চাদের বংশে তা চালান করে, কিন্তু তার নিজের অর্জিত চারিত্র্য প্রভাবহীনই থাকে।

অর্জিত গুণের ক্রমবিকাশ সংক্রান্ত মত যদিও প্রকৃত বৈজ্ঞানিক সত্যের আঘাতে অপ্রমাণিত, বাতিল ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই মতটি যে সম্পূর্ণরূপে মৃত্যুবরণ করেছে এমন কথা বলা যায় না। ১৯৬০ সালে The Mechanism of Evolution গ্রন্থে W. H. Dowdes Well বলেছেনঃ

www.nagorikpathagar.org

সর্বশেষ লা-মার্কবাদী পুনর্জাগরণপন্থীরা ১৯৪৮ সনে রাশিয়ায় Lysenko'র নেতৃত্বে পুনরায় মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। কিন্তু এ মতের লোকদের সব দাবি বর্তমানে নস্যাৎ হয়ে গেছে। তাদের সম্পর্কে একথা সর্বজনবিদিত যে,তারা বিজ্ঞান-প্রবণতার পরিবর্তে তাদের নিজস্ব আদর্শবাদ দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়েছে বেশী। (১৪ পৃঃ)

Time magazine ১৯৬৫ সনের ১২ই ফেব্রুয়ারী লিখেছেঃ লাইসিনকো পরে তাঁর পদ ও মর্যাদা থেকে বিচ্যুত হয়েছেন এবং তার মতাদর্শ—এমন কি কমিউনিস্টদের কর্তৃকও প্রত্যাখ্যাত ও প্রত্যাহৃত হয়েছে বেশী।

এই প্রসঙ্গে পত্রিকাটিতে বলা হয়ঃ

Heredity is controlled by genes in the reproductive cells and remains unchanged throughout an individual's life (P. 51)

বস্তুত উত্তরকালে চার্লস ডারউইনের চিন্তাধারা প্রচারিত হওয়ার ফলেই ক্রমবিকাশ মতাদর্শটি ব্যাপক খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করে। বিশেষ করে ১৮৫৯ সনে তার বই The Origin of Species প্রকাশিত হওয়ার পর এ মতটি একটি অনবদ্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বলে প্রতীত হতে থাকে। ডারউইনের মত হল, বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীরা জীবনে বেঁচে থাকার জন্যে পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংগ্রামে লিপ্ত হয়; এবং এ সংগ্রামে কোন সুফলমূলক বা কল্যাণকর পরিবর্তন তার অধিকারীকে অগ্রাধিকার দানে সক্ষম হয়। অতএব 'যোগ্যতম' বেঁচে থাকবে, আর অন্যরা ধ্বংস ও লয়প্রাপ্ত হবে। বেঁচে যাওয়া সত্তা (survivors) তার কাচ্চা-বাচ্চাদের মধ্যে এ সুফলদায়ক পরিবর্তন সংক্রমিত করতে সক্ষম হবে; আর এরই ফলে ক্রমবিকাশের নিয়মে নতুন জীবন পদ্ধতির উদ্ভব হবে। ডারউইন এ পদ্ধতিকেই Natural Selection বা 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' বলে অভিহিত করেছেন।

জিরাফের দৃষ্টান্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা ডারউইনের বিশ্বাসকে বিস্তারিত বুঝতে পারি। এক অজ্ঞাত কারণে কিছু সংখ্যক জিরাফ অন্যদের তুলনায় খানিকটা লম্বা ঘাড় নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল। তাদের একটি দীর্ঘতর ঘাড় নিয়ে খাদ্য সংগ্রহের প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হয়ে যায় এবং তার ফলে সেটি বেঁচে যায়। অন্য খাটো ঘাড় বিশিষ্ট জিরাফগুলো খাদ্যাভাবে মরে যেতে বাধ্য হয়। এ-ই হল প্রাকৃতিক নির্বাচন। আর তা-ই বেঁচে যাওয়া জিরাফটি তার বাচ্চা-কাচ্চাদেরও অধিকতর লম্বা ঘাড় সহ জন্ম দেয়। বহু কয়টি অধঃস্তন বংশে এই পদ্ধতি বারবার কার্যকর হয়। এর-ই ফলস্বরূপ দীর্ঘ ঘাড়সম্পন্ন জিরাফের অস্তিত্ব সম্ভব হয়েছে।

সময় অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডারউইনের এ মতাদর্শ সম্পর্কে আপত্তি ওঠে। ১৯৬৪ সনে Biology for Today নামের একখানি বই এই বিষয়টি স্পষ্ট

www.nagorikpathagar.org

করে তোলে। বইখানিতে লেখা হয়েছেঃ

'ডারউইনের এ মতাদর্শ পুরোপুরি গ্রহণ করার ব্যাপারে বহু সংখ্যক বিজ্ঞানী আপত্তি উত্থাপন করেছেন। আপত্তিসমূহের মধ্যে নিচের দু'টি উল্লেখযোগ্যঃ

১. এ মতটি বংশানুক্রমিকতা সংক্রান্ত জানা সব তথ্য অন্তর্ভুক্ত করছে না। যেমন, কোন কোন পরিবর্তন কোন বংশানুক্রমিক ধারায় সংক্রামত হল, আর কোন কোন পরিবর্তন তা হল না বা হতে পারল না, এই প্রশ্নের স্পষ্ট ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ এ মতটিতে নেই। কিছু পরিবর্তন এতই নগণ্য, সামান্য ও অনুল্লেখযোগ্য (Trivial) যে, তা সম্ভবত জীবন সংগ্রামে একটা দেহকে কোনরূপ সাহায্য করতে সক্ষম নয়।

২. সামান্য নগণ্য পরিবর্তনসমূহের ক্রমশ একত্র সমাবেশ হওয়ার ফলে অধিকতর জটিল কাঠামো কেমন করে আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছে,—যেমন উচ্চতর প্রাণিদেহে (higher organism) পরিদৃষ্ট হয়। -ডারউইনের মতবাদ একথারও কোন ব্যাখ্যা দেয় না। (Sayles B. Clark and J. Arbert Mould. 1964 P. 321)

The Story of Life গ্রন্থে ক্রমবিকাশবাদী H. Mellersh লিখেছেনঃ

On the Darwinian theory, the questioner may point out, any variation has to be of immediate value to its possessor if it is going to give him a better chance of survival than his fellows, of what 'survival value' is the first dim beginnings of an eye, on forelimbs starting to flap about feebly and nakedly in anticipation of a wing?...Natural selection is so mindless. it is so purposeless. [1958 PP. 237, 242]

ডারউইনের উপস্থাপিত মতবাদের ওপর এ প্রশ্ন খুবই কঠিন হয়ে দেখা দেয়, যখন প্রশ্ন করা হয়, কোন পরিবর্তন যদি তার অধিকারীকে, তার সঙ্গী সমশ্রেণীর প্রাণীদের তুলনায় বাঁচার ব্যাপারে উত্তম সুযোগ দিয়েই থাকবে, তাহলে বোঝা যাবে যে, এ পরিবর্তনের একটি তাৎক্ষণিক মূল্য রয়েছে। কিন্তু একটি চক্ষুর প্রথম ক্ষীণ উন্মীলনে, সম্মুখ পায়ের খুবই দুর্বল দোদুল্যমান অবস্থায় বাড়তে শুরু করায় কিংবা পক্ষীডানার নিরস্ত্র পূর্বসম্পাদনে বাঁচার মূল্য কি থাকতে পারে?.....'প্রাকৃতিক নির্বাচন কি এতই নির্বোধ, এতই উদ্দেশ্যহীন।'

এইভাবেই ডারউইনের মতাদর্শ—(যেমন তিনি উপস্থাপিত করেছেন) ভ্রান্ত ও ত্রুটিযুক্ত (Faulty) প্রমাণিত হয়েছে এবং এর অনেকগুলো দিকই প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। অতঃপর ১৯০১ সালে ওলন্দাজ উদ্ভিদবিদ্যা পারদর্শী Hugo De Vries

www.nagorikpathagar.org

কর্তৃক ক্রমবিকাশ মতাদর্শে এক নতুন জীবনের সঞ্চার হয়। তিনি বাসন্তী পুষ্পরাজি (Evening primroses) নামে পরিচিত উদ্ভিদ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, ঘটনাবশত কিছু উদ্ভিদ অস্বাভাবিক কাঠামো নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং সেগুলোর বংশধরদের মধ্যে এমন কতগুলো বিশেষ লক্ষণ, গুণ ও চিহ্ন (Trait) আছে, পূর্ব পুরুষের চরিত্রের সঙ্গে যার মিল নেই। এ ব্যাপারটিকে তিনি নাম দিলেন Mutants; De Vries বিশ্বাস করেন, অনুকূল বিরাট পরিবর্তন ক্রমবিকাশ বিধান করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, এই নিয়মে অস্বাভাবিক দীর্ঘ ঘাড়সম্পন্ন জিরাফ (Mutants) আত্মপ্রকাশ করল এবং অপেক্ষাকৃত খাটো ঘাড়সম্পন্ন জিরাফের তুলনায় উত্তমভাবে বেঁচে থাকল। এই পরিবর্তিত জিরাফগুলোই লম্বা ঘাড়সম্পন্ন জিরাফকে জন্ম দিল। আর এইভাবেই ক্রমবিকাশবাদ প্রমাণিত হল।

এ নতুন মতটিও দীর্ঘদিন আপত্তিমুক্ত ও অপ্রতিরোধ্য হয়ে (unchallenged) থাকতে পারে নি। খুব শিগ্‌গিরই এর পথে নানা অসুবিধে প্রবল ও অনতিক্রম্য হয়ে উঠল। আকস্মিক বিরাট রকমের পরিবর্তনই (De Vries যেমন দাবি করেছেন) ক্রমবিকাশ সংঘটিত হওয়ার জন্যে দায়ী এ সম্পর্কে De Beer বলেছেনঃ

> Many of them had Lethal results and killed the organism that carried them....far from conferring improvement in adaptation, the mutations seemed to be pathological and provided no explanation of how adaptation arose and became perfected. The result ..... was that during the first twenty years of the twentieth century, evolutionary studies and theories were in a state of chaos and confusion. (Charles Darwin-P 182)
>
> ওদের অকেগুলো আত্মঘাতী ফল হয়েছিল এবং যে যান্ত্রিক গঠন ওদের বহন করে এনেছিল তাকে হত্যা করেছিল... অভিযোজনে উন্নয়নের সাথে মিল হওয়া থেকে অনেক দূরে থেকে গেল। পরিবর্তনটা মনে হল যেন রোগনিরূপণের ব্যাপার। অভিযোজনটা কি ভাবে ঘটলো এবং পূর্ণত্ব পেয়ে গেল, তার কোন ব্যাখ্যা দেয়া হল না। ফল হল এই যে, বিংশ শতাব্দীর প্রথম বিশ বছরে বিবর্তনমূলক অধ্যয়ন ও মতাদর্শ বিতর্ক মতবিরোধও সংশয়ের ব্যাপার হয়ে থাকল।'

ক্রমবিকাশ সংক্রান্ত উল্লিখিত প্রধান মতাদর্শসমূহের পর্যালোচনা করার পর Hall ও Lesser সম্পাদিত ১৯৬৬ সালের Review Text in Biology সংক্ষিপ্তভাবে বলেছেঃ

> Since Lamarks theory [acquired characteristics] has been

www.nagorikpathagar.org

proved false, it is only of historical interest. Darwin's theory (natural selection) does not satisfactorily explain the origin and inheritance of variation..... Devries theory [Large mutations] has been shown to be week because no single mutation or set of mutations has ever been so large and numerous that it has been known to start a new species in one generation of offspring. (P. 363)

যেদিন থেকে লা মার্কের মত (অর্জিত গুণ) মিথ্যা প্রমাণিত হল সেদিন থেকে এটা ঐতিহাসিক আগ্রহের ব্যাপার হল যে, ডারউইনের (প্রাকৃতিক নির্বাচন) মতটি পরিবর্তনের মৌল ও বংশানুক্রমিকতার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হবে কিন্তু হল না। ডি-ভেরাইমের মতটি (বৃহৎ পরিবর্তন) খুবই দুর্বল দেখা গেল। কেননা একটি পরিবর্তন কিংবা পরিবর্তনের একটা ধারা কখনই এতবড় ও বহু সংখ্যক হয়নি, যার ফলে বোঝা যাবে যে, একটা নতুন প্রজাতির সূচনা হয়েছে বাচ্চা-কাচ্চাদের একটি বংশে।

এখন প্রশ্ন হল, মতাদর্শের এই কলহ ও সংশয় আমাদের একালেও কি কিছুমাত্র দূর হয়ে গিয়ে সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে? এ মতটি কি আপাতদৃষ্টিতেও সঙ্গত মনে হচ্ছে? মনে হচ্ছে কি এটা অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত?

ক্রমবিকাশ অভ্রান্ত মতবাদ নয়

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এ মতাদর্শের একটা নতুন রূপ অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বহু সংখ্যক ক্রমবিকাশবাদী তা গ্রহণও করেছেন। মতাদর্শের এ আধুনিক রূপটি ডারউইনের ও ডি. ভিরাইসের মতের অংশ বিশেষের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। ম্যাক্‌গিল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সি. পি. মার্টিন-এর ব্যাখ্যা দিয়ে American Science পত্রিকায় লিখেছেনঃ

'An over whelming majority of (Biologist) believe that evolution proceeds by Mutations and natural selection.' (January 1963. P. 100)

অধিকাংশ জীব বিজ্ঞানী মনে করেন যে, বিবর্তন ক্রিয়া পরিব্যক্তি এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে অগ্রসর হয়ে থাকে।

আধুনিক মতাদর্শ বলেছে যে, একটি নির্দিষ্ট দেহে সামান্য পরিবর্তন সূচিত হলো। এই পরিবর্তন তার অধিকারীকে তার প্রতিযোগীদের তুলনায় বেঁচে থাকার অধিকতর সুযোগ করে দিল। এই কল্যাণকর পরিবর্তন উত্তরাধিকারসূত্রে বহু অধঃস্তন বংশের মধ্যে সংক্রমিত হলো। বহু সহস্র কোটি (a period of millions of years) বছর পর্যন্ত অন্যান্য আরো বহু কল্যাণকর পরিবর্তন সেই একই পথে

www.nagorikpathagar.org

ও ধারায় অব্যাহতভাবে চলতে থাকল। এর ফলে মূল দেহটাই (organism) সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে বসল।

আধুনিক মতাদর্শের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দান প্রসঙ্গে ১৯৬৬ সনের ১০ই আগস্ট প্রকাশিত Oklahama City Times পত্রিকা লিখেছেনঃ

> Accidental alterations in the mechanism of his heredity slowly by trial and error—made man better adapted his environment than of his rivals. That's the accepted scientific view today, and scientists call this long, frequently bungling process 'evolution'.

> তার বংশগতির যান্ত্রিকতায় দুর্ঘটনাজনিত পরিবর্তন ধীরে ধীরে পরীক্ষা ও ভুলের মধ্য দিয়ে মানুষকে পরিবেশের সাথে তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় অনেক উত্তম সামঞ্জস্যশীল বানিয়ে দিয়েছে। বর্তমানে তা-ই হচ্ছে গৃহীত বৈজ্ঞানিক মত। এবং বিজ্ঞানীরা এই দীর্ঘ ঘনঘন সংগঠিত ভণ্ডুল পদ্ধতিকে বলে বিবর্তন।

উপরন্তু আধুনিক মতাদর্শে যখন থেকে ডারউইনের 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' সংক্রান্ত মতের অংশবিশেষ শামিল করে দেয়া হয়েছে, তখন থেকে এ মতটি Neo-Darwinism-'নব্য ডারউইনবাদ' নামে খ্যাত হল।

মতাদর্শের আধুনিক রূপ বুঝবার জন্যে আমরা জিরাফের দৃষ্টান্তটি পুনরায় পেশ করতে পারি। অতীত কালে আধুনিক জিরাফের পূর্ববংশ ছিল খাটো ঘাড়সম্পন্ন। ওরা যখন বাঁচার জন্যে সংগ্রামে লিপ্ত হল, তখন ওরা গাছের উচ্চভাগে অবস্থিত পত্র-পল্লব সংগ্রহের প্রতিযোগিতা করল। কতগুলো জিরাফ আঙ্গিক পরিবর্তন লাভের দরুণ অন্যদের তুলনায় কিছুটা লম্বা ঘাড় লাভ করেছিল। ফলে গাছের উচ্চতর শাখার পাতাগুলি আহরণ করতে সক্ষম হল। আর দীর্ঘ ঘাড়ওয়ালারা বেঁচে থাকল এবং বংশবৃদ্ধি করার সুযোগ পেল। মনে করা যেতে পারে যে, উত্তরকালে জিরাফগুলো বর্তমান দীর্ঘ ঘাড় লাভ করা পর্যন্ত এই পদ্ধতি অব্যাহতভাবে চলতে থাকে।

অনেক ক্রমবিকাশবাদীই দাবি করেছেন যে, এভাবেই ক্রমবিকাশবাদের মতটি শেষ পর্যন্ত এমনরূপ পরিগ্রহ করেছে, যদ্দারা সমস্ত ব্যাপারটির সম্পূর্ণ ও সঠিক ব্যাখ্যা দান সম্ভবপর। বিশ্ববিখ্যাত জীববিজ্ঞানী ও ক্রমবিকাশবাদী Jean Rostand বলেছেনঃ

> For them, then, the problem of evolution has thoroughly, completely, and definitely resolved, with mutation

www.nagorikpathagar.org

and natural selection, the perfect explanation is at hour disposal.

[The Origin Book of Evolution, by Jean Rostand 1961, PP-75-76]

অতঃপর তাদের জন্য বিবর্তনবাদের সমস্যা সরাসরি সম্পূর্ণভাবে এবং নির্দিষ্ট রূপে স্থিরীকৃত হয়েছে। পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দান আমাদের ক্ষমতাভুক্ত।

কিন্তু এ পর্যায়েও পূর্বোদ্ধৃত জটিলতা কিছুমাত্র দূরীভূত হয় নি। এখনো সে জটিলতা তীব্র ও প্রকট। কেননা আধুনিক মতাদর্শও—মতাদর্শের আধুনিক রূপও—এ পর্যায়ের সকল সমস্যার সমাধান করতে পারে নি। বিতর্ক এখনো অমীমাংসিত। ১৯৬১ সনের জানুয়ারী সংখ্যা Science Digest পত্রিকায় Should We burn Darwin শীর্ষক এক প্রবন্ধ এই জটিলতাকে প্রকট করে তুলে ধরেছে। লেখক তাতে লিখেছেনঃ

বিগত বছরের ফরাসী বিজ্ঞান-চিন্তায় সম্ভবত সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ একক সত্য হল এই যে, ক্রমবিকাশবাদের পূর্বোক্ত গোঁড়া ও সেকেলে ব্যাখ্যা মর্মান্তিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে; এমন কি অতীতে তা তীব্রভাবে সমালোচিতও হয়েছে। বর্তমানে তা অধিক সমালোচনা-আঘাতের সম্মুখীন হয়েছে। যার দরুণ মনে হয়েছে, অন্তত ফ্রান্সে প্রজাতি মূল সম্পর্কিত একটি নবতর মতাদর্শের পথ বুঝি উন্মুক্ত হয়ে গেছে।.....

এগুলো হলো ফরাসী বিদ্রোহীদের উত্থাপিত কতগুলো বিব্রতকর প্রশ্ন; যেমনঃ জিরাফ তার ৮ ফিট দীর্ঘ ঘাড়সহ যদি 'প্রাকৃতিক নির্বাচন'-এর ফল হয়ে থাকে, আর তা যদি 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' এর একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে, তাহলে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দীর্ঘ ঘাড়সম্পন্ন ভেড়া সম্পর্কে কী বলবার আছে?

জিরাফ ও ভেড়া পশুরাজ্যের অতি নিকটবর্তী ভাই বা চাচাত ভাই নয় কি? তারা পাশাপাশি দুই চাচাতো ভাই হিসেবে বাস করছে—এসত্ত্বেও একটি অপরটির তুলনায় যোগ্যতম হল কি করে? একটি যোগ্যতম তার দীর্ঘ ঘাড়ের কারণে, আর অপরটি যোগ্যতম তার খাটো ঘাড়ের কারণে?

ভেড়া সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গেই তার শিং সম্পর্কে কথা ওঠে। ক্লাসিক্যাল মত হলো, ওগুলো খামখেয়ালীভাবে বাড়তে থাকে। পরে ওগুলো যখন ভেড়ার জীবন-সংগ্রামে অতীব গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কথা প্রমাণ করল, প্রকৃতি শিং-সম্পন্ন জন্তু ও শিংহীন জন্তুগুলোর মধ্যে বাছাই অভিযান চালু করল—ফলে শিংযুক্ত জন্তুকে বাঁচাল ও শিংহীনগুলো মরে গেল। কিন্তু সত্যিই তা ঘটেছিল নাকি? এখনকার দুনিয়াও ও তো শিংহীন ও শিংযুক্ত উভয় শ্রেণীর ভেড়াই পাশাপাশি

www.nagorikpathagar.org

রয়েছে বিপুল সংখ্যক। তাহলে ওদের মধ্যে যোগ্যতম হল কোনগুলো? আর কোনগুলোকে যোগ্যতম নয়, ধ্বংস ও বিলুপ্ত হয়ে গেছে বলে ধরে নিতে হবে?

সবুজ ব্যাঙের ১,২০,০০০টি সারযুক্ত ডিমের মধ্যে মাত্র দুটি স্বতন্ত্র ডিম রক্ষা পেল। এমতাবস্থায় আমরা কি বিশ্বাস করব যে, ১,২০,০০০টি ব্যাঙের মধ্যে প্রকৃতি মাত্র এই দুটো ব্যাঙকেই—ও দুটো যোগ্যতম ছিল বলে—বাঁচিয়ে দিয়েছে? কিংবা 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' আসলে কিছুই নয়, বরং অন্ধ নশ্বরতা ও মৃত্যুই আসল বা মূলত কোন কিছুই বাছাই করে না?

ক্রমবিকাশবাদের আধুনিক মতাদর্শের ওপর আর একটি মারাত্মক আক্রমণ চালিয়েছেন প্রখ্যাত ক্রমবিকাশবাদী Jean Rostand। তিনি তাঁর ১৯৬১ সনে প্রকাশিত The Origin Book of Evolution বইতে বলেছেনঃ

নব্য-ডারউইনবাদ (Neo-Darwinism) দাবি করছে যে, ক্রমবিকাশবাদ সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যা চূড়ান্তভাবে মীমাংসিত হয়ে গেছে, তা কি বাস্তবিকই সত্য? ব্যক্তিগতভাবে আমি তা মনে করি না। অন্যদের কথা বাদ দিয়ে আমি নিজে নব্য-ডারউইনবাদ সম্পর্কে কয়েকটি অতিসাধারণ (Banal) প্রশ্ন অবশ্যই তুলব।...

পরিবর্তন—যা আমরা জানি এবং জীবন্ত জগৎ সৃষ্টির জন্যে যা মূলত দায়ী বলে মনে করা হচ্ছে—সাধারণভাবে তা হয় কোন বিয়োগ বা ক্ষতি (Deprivation), অসম্পূর্ণতা (Deficiencies) রঞ্জকের অভাব (Loss of pigment) অনুবন্ধের অভাব (Loss of an appandage) অথবা তা প্রাগ-অস্তিত্বে দ্বিগুণতা বা যাই- হোক না কেন, তা যে কখনোই দেহপরিকল্পনায় প্রকৃত নতুন বা মৌলিক কোন জিনিস সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় না, তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না; তা এমন কিছু বানায় না, যা নতুন দেহ বা অঙ্গ সৃষ্টি করা অথবা নতুন কোন কাজের বিস্ফোরণের ভিত্তি বলে মনে করা যেতে পারে।

না, স্থির নিশ্চিত যে, এধরনের উত্তরাধিকারিতা থেকে পিছলে পড়া যে সম্ভব হয়েছে, তা ভাববার জন্যে আমি নিজেকে প্রস্তুত করতে পারি না; এমন কি, প্রাকৃতিক নির্বাচনের সহযোগিতা—এমন দীর্ঘ সময়ের সুবিধে সত্ত্বেও যার মধ্যে এর কাঠামোগত মিতব্যয়িতা এবং পরিশুদ্ধতা ও এর বিস্ময়কর সংযোগসাধনের সাহায্যে সমগ্র জগৎটি গড়ে তোলার জন্যে জীবনের ক্রমবিকাশ সংসাধিত হয়েছে—তা আমার কল্পনারও অতীত।—চক্ষু, কান, মানুষের মগজ-চিন্তাশক্তি এভাবে গড়ে উঠেছে, তা ভাববার জন্যেও আমি নিজেকে প্রস্তুত করতে পারছি না।

গভীর প্রগাঢ় কাঠামোগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে বলে বিশ্বাস করতে—কাল্পনিক রূপান্তরসমূহ বাস্তব মনে করতে—ক্রমবিকাশ মূলক

www.nagorikpathagar.org

ইতিহাস—যেমন মেরুদণ্ডহীন জীব মেরুদণ্ড সম্পন্ন জীবে, মাছ থেকে হাত-পা সম্পন্ন জীবে (Batrachiaans) রূপান্তরিত হওয়াতে, হাত-পা সম্পন্ন জীব থেকে সরীসৃপ গড়ে উঠতে এবং সরীসৃপ থেকে স্তন্যপায়ী জীব সৃষ্টি হওয়াতে বিশ্বাস স্থাপন করা আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। (P. 70)

ক্রমবিকাশ সংক্রান্ত সবগুলো বড় বড় মতাদর্শ প্রত্যাখ্যান কিংবা প্রশ্নাঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করার পর রস্ট্যান্ড জিজ্ঞাসা করেছেনঃ

Will the future surprise us with a great new idea about the mechanism of evolution? We should certainly not exclude this hope but it is difficult to restrain a certain scepticism'.

বিবর্তনের যান্ত্রিকতা সম্পর্কে মহানব ধারণার দ্বারা ভবিষ্যৎ কি আমাদেরকে বিস্ময়াভিভূত করবে?...এ আশা সম্ভাব্যতার বাইরে মনে করা আমাদের উচিত নয় অবশ্যই। কিন্তু নির্দিষ্ট সংশয়কে দমন করা খুবই কঠিন।

কিন্তু যে কথা বলে তিনি প্রসঙ্গ শেষ করেছেন, তা হলঃ

Despite this rather disillusioned conclusion, it is of paramount importance that no excuse be found to cast doubt upon the fact of evolution itself. (The Origin Book of evolution P-91)

মোহমুক্তি শেষ হওয়া সত্ত্বেও এটা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যে, মূল বিবর্তন তত্ত্বের সত্যতার উপর কোনরূপ সংশয় আরোপের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কিন্তু কোন বিশ্বস্ত অনুসন্ধানী লোক কি এটা করবে? বিভিন্ন পরস্পর-বিরোধী মতাদর্শ যুক্তি-প্রমাণ ও গুরুত্ব আরোপের বেশ কয়েকটি শতাব্দী অতিবাহিত হওয়ার পরও নিরপেক্ষ ও বিদ্বেষহীন অনুসন্ধানী মাত্রের নিকট একথা স্পষ্ট যে, ক্রমবিকাশবাদ বাস্তবিকই কোন অকাট্য ও প্রমাণিত চূড়ান্ত সত্য নয়। বরং সত্যি কথা এই যে, এটা একটা চিন্তা বা মত এবং তাকে সত্যে উত্তরণ লাভের জন্যে যুক্তির কষ্টিপাথরে অবশ্যই উত্তীর্ণ হতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

ডারউইনের বিবর্তন-তত্ত্ব

চার্লস্ ডারউইন উপস্থাপিত বিবর্তন বা ক্রমবিকাশ তত্ত্বের (Theory of Evolution) মূল ভিত্তি ছয়টি। তা যথাক্রমেঃ

১. জীবজগতে সন্তান প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির গতি এত তীব্রভাবে চলে যে, সে সবের বংশের বিরাট অংশ ক্রমাগত ধ্বংস হয়ে যেতে না থাকলে তাদের সংখ্যা অসংখ্য মাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া অবধারিত।

২. বসবাস উপযোগী স্থানের সংকীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা, খাদ্য পরিমাণের অপর্যাপ্ততা ও বংশধারার অবারিত বৃদ্ধিশীলতার অনিবার্য পরিণতিতে বাঁচার সংগ্রামের (Struggle for Existence) তীব্রভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠা অবশ্যম্ভাবী। জীবনের-সংগ্রামের এই কার্যক্রমই যোগ্যতমের উদ্বর্তনের (Survival of the Fittest) অন্তর্নিহিত কারণ।

৩. নিত্য লক্ষ্য করা যায়, একই প্রজাতির জীবের ব্যক্তিসত্তার দেহসংগঠনে সামান্য তারতম্য ও পার্থক্য (Individual Difference) সূচিত হয়ে থাকে। এই তারতম্য বংশাবলীর মধ্যে ক্ষীণ অথচ ক্রমাগত পরিবর্তনের (Variations) ফল হয়ে দাঁড়ায়। এ পরিবর্তন ও পার্থক্য প্রায়ই বংশানুক্রমিক হয়ে থাকে।

৪. পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জীবন-সংগ্রামের অব্যাহত ও ক্রমাগত দ্বন্দ্ব-সংঘাতে জীবদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যে হালকা ধরনের পরিবর্তনের উদ্ভব হয়, তা কল্যাণকর এবং অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ প্রমাণিত হলে তা জীব-বংশের স্থিতি ও দৃঢ়তার নিয়ামক হয়ে দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে তা ক্ষতিকর ও মারাত্মক প্রমাণিত হলে এই পরিবর্তনই পরিবেশের সঙ্গে অসঙ্গতি ও অসাম স্যতা বৃদ্ধি করে জীব-বংশের ধ্বংস ও বিলুপ্তির হেতু হয়ে দাঁড়ায়। এভাবে জীবন-সংগ্রামের দ্বন্দ্ব-সংঘাতে কেবলমাত্র সেসব জীব-বংশই রক্ষা পেতে ও বেঁচে থাকতে পারে, যা অনুকূল ও কল্যাণকর পরিবর্তন পার্থক্যের দরুন প্রাকৃতিক নির্বাচনে উদ্বর্তন লাভ করতে সক্ষম হয়েছে আর অনুকূল ও কল্যাণকর পার্থক্য পরিবর্তনের ক্রমাগত সমন্বয়ই বেঁচে থাকা বংশগুলোতে বিবর্তন কার্যক্রমের সক্রিয়তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

www.nagorikpathagar.org

৫. ক্রমবিবর্তনশীল স্তর ও পর্যায়সমূহ অতিক্রম করার এই কার্যক্রম অতীব মন্থর গতির হওয়ার দরুন তা দৃশ্যমান অনুভবযোগ্য ও গোচরীভূত হয় না। কিন্তু উদ্ভিদ ও জীব-জন্তুর প্রত্যেক প্রজাতির (Species) দেহে এবং প্রত্যেক জাতি বা মহাজাতির (Genus) মধ্যে তা যুগ যুগ ও শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অব্যাহত ধারায় কার্যকর হয়ে থাকে।

৬. জীব-জন্তু ও প্রাণী প্রজাতি ও জাতিসমূহের অধিকাংশ শাখা-প্রশাখা ও স্তর এতই সন্নিহিত ও সুসংবদ্ধ পরিদৃষ্ট হয় যে, একটি প্রজাতি অপর একটি প্রজাতির ক্রমবিবর্তিত আকার-আকৃতি বলে স্পষ্ট মনে হয়। আর এ ক্রম-অব্যাহত ধারা একথা প্রমাণিত করে যে, মানুষ 'মানুষ ও বানর-উল্লুকের' ক্রমবিকশিত ও বিবর্তিত আকার-আকৃতি। আর এ গোটা ক্রমবিকাশ বা পরিবর্তনের ধারার প্রাথমিক স্তর কোন এক কোষ (Life cell) সম্পন্ন জীবাণু হবে বলে ধারণা জন্মে।

কিছুমাত্র নতুন কথা নয়

এই হল চার্লস্ ডারউইনের ক্রমবিকাশতত্ত্বের সার কথা। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিচার করলে একথা অনস্বীকার্য হয়ে ওঠে যে, ডারউইনের এ তত্ত্ব বিশ্লেষণে একবিন্দু অভিনবত্ব নেই। তা থেকে এমন কোন নতুন তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায় নি, যা পূর্বে কারুর জানা ছিল না। ডারউইন ক্রমাগত কয়েক বছরের অবিশ্রান্ত অনুসন্ধান ও চিন্তা-গবেষণার পর বিজ্ঞানের একটি সুষ্ঠু যুক্তিপ্রমাণভিত্তিক তত্ত্ব হিসেবে তাঁর মতকে জনসমক্ষে পেশ করেছেন, তাঁর একমাত্র কৃতিত্ব ও বিশেষত্ব এতটুকুই। কেননা জীবনের ক্রমবিকাশ সংক্রান্ত চিন্তাধারা প্রাচীন গ্রীক দর্শনের একটি অংশ হিসেবে বর্ণিত ও বিবৃত হয়ে এসেছে বহুকাল আগে থেকেই। জীবনের বিভিন্ন আকার-আকৃতি (Forms of Life) সহ বিশ্বলোকের প্রত্যেকটি বস্তু পরিবর্তন ও বিবর্তন লাভ করছে বলে গ্রীক দার্শনিক হিরাক্লিটাস খৃস্টপূর্ব পাঁচশ বছর পূর্বে মত প্রকাশ করেছিলেন। এম্পিডোকলিস (Empedocles) খৃস্টপূর্ব সাড়ে চারশ' বছর পূর্বে দাবি করেছিলেন, জীবন প্রস্তর থেকে উদ্ভূত। আর জীব-জন্তু-প্রাণী অস্তিত্ব পেয়েছে উদ্ভিদ থেকে। প্রাচীন মুসলিম দার্শনিক ও অধ্যাত্মবিদ্‌রাও ক্রমবিকাশবাদের কোন না কোন তত্ত্বের প্রবক্তা ছিলেন। কিন্তু সেসব ছিল নিতান্তই ধারণা, অনুমান ও চিন্তাবিলাস মাত্র। মানুষ প্রত্যেকটি জটিল ও দুর্বোধ্য বিষয়কে সহজ ও সুবোধ্যরূপে দেখতে ইচ্ছুক, ওসব চিন্তাধারা ও প্রবণতারই ফল। কিন্তু তার পশ্চাতে যুক্তির ভিত্তি ছিল অনুপস্থিত। এ প্রবণতাকে বাস্তব রূপদানে অনস্বীকার্য করে তোলার উদ্দেশ্যে অকাট্যযুক্তি ও গোচরযোগ্য প্রমাণ অনুসন্ধান পাশ্চাত্যের আধুনিক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের এক অনন্য অবদান। পাশ্চাত্যের আধুনিক সুধীমণ্ডলী যান্ত্রিক মানসিকতা সম্পন্ন বিধায় কোন যান্ত্রিক ক্রমবিকাশ তত্ত্ব অবলম্বনের জন্যে গভীরভাবে উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন। ডারউইন

www.nagorikpathagar.org

কর্তৃক সর্বপ্রথম বিজ্ঞানের ভাষায় তাঁর যান্ত্রিক ক্রমবিকাশতত্ত্ব উপস্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানীরা তা দুহাতে লুফে নিলেন। আর প্রখ্যাত বিজ্ঞানী থমাস হাক্সলি তা শুধু গ্রহণই করলেন না, আন্তরিক প্রযত্নে তাকে সম্মুখের দিকে অগ্রসর করে দিলেন।

ডারউইনের গ্রন্থ 'প্রজাতির উৎপত্তি' [Origin of Species] প্রকাশিত হওয়ার পর কয়েক বছরের মধ্যেই অস্ট্রিয়ার আত্মগোপনকারী পাদ্রী গ্রেসর মেন্ডেল বিজ্ঞানের একটি অখ্যাত পত্রিকায় 'প্রজনন শাস্ত্র' [Genetics] বা জীবনের বংশানুক্রমিকতা পর্যায়ে স্বীয় গবেষণা প্রকাশ করেন। এ গবেষণা এতই জ্ঞানগর্ভ যুক্তিভিত্তিক ও অকাট্য ছিল যে, তা যথাসময়ে সাধারণ্যে প্রকাশিত হলে ডারউইনের ক্রমবিকাশতত্ত্ব জনগ্রাহ্যতা থেকে নিশ্চিতই বঞ্চিত থাকত। কেননা, মেন্ডেলের গবেষণার আলোকে ডারউইনের চিন্তাধারা অন্তঃসারশূন্য প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু সে গবেষণা মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান হওয়ার পূর্বে দীর্ঘ চল্লিশটি বছর পর্যন্ত লোকচক্ষুর অন্তরালে এক অখ্যাত পত্রিকার পৃষ্ঠায় পড়ে থাকল। কেউ-ই সেদিকে লক্ষ্য দিতে আগ্রহী হল না। ডারউইনের ক্রমবিকাশতত্ত্ব চিন্তা-গবেষণার শূন্য মাঠে জনচিত্ত জয় করে নিল ও বট-বৃক্ষের ন্যায় একমাত্র মতাদর্শ রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বসল।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জৈব-রসায়নের (Bio-Chemistry) অধ্যাপক উইলিয়াম এস, বেক (William S. Beck) লিখিত Modern Science and the Nature of Life নামক একটি গ্রন্থ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। তাতে তিনি লিখেছেনঃ

> মেন্ডেলের সময়ে ডারউইনের গ্রন্থ জনমনকে এতটা প্রভাবিত করেছিল যে, মেন্ডেলকে বুঝতে কেউই কষ্ট স্বীকার করতে রাযী হল না।.....মূলারের বক্তব্য হল, মেন্ডেলের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট না হওয়ার কারণ সম্ভবত এই যে, তিনি তাঁর সমকালীন চিন্তা ও বিশ্বাস থেকে সামনের দিকে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বিস্ময়কর বিচক্ষণতার দ্বারা বিষয়টির উভয় দিক উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন—বংশানুক্রমিকতার যান্ত্রিক রূপকে এবং তার অনুসন্ধান লাভের কার্যপদ্ধতিকে। সম্ভবত মেন্ডেল তাঁর সমসাময়িক যুগের অনেক পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এরূপ বলা তো ইতিহাসের চরম অপব্যাখ্যা মাত্র। আমেরিকার 'জেনেটিকস সোসাইটি' (Genetics Society) ১৯৫০ সনে মেন্ডেল আবিষ্কারের পঁচাশিতম জন্মবার্ষিকী উদযাপনের পরিবর্তে ৫০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন করল। এটাকে কালের প্রতি চরমতম অবিচার ছাড়া আর কীই বা বলা যেতে পারে।—এ তো অবধারিত। কেননা বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারিত্ব বিদ্যা—যা বংশীয় উত্তরাধিকার কার্যক্রমের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা মাত্র—সঠিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি, যতক্ষণ না

www.nagorikpathagar.org

মেন্ডেলের প্রোথিত গবেষণাসমূহ উদ্ভাবিত হয়েছে। [Modern Science and the nature of Life-P.221]

ডারউইনতত্ত্বের পর্যালোচনা

মেন্ডেলের গবেষণালব্ধ তথ্যাবলীর আত্মপ্রকাশই হল ডারউইনের ক্রমবিকাশ তত্ত্বের পরাজয়বরণের কারণ। বাসনার পরাজয়কে চরম পরাজয় থেকে রক্ষা করা এবং ক্রমবিকাশবাদের নিষ্প্রাণ দেহে নতুন জীবনের সঞ্চার করার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানীরা প্রাণপণে চেষ্টা চালালেন। কিন্তু সবই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। মৃতকে কখনো পুনরুজ্জীবিত করা যায় না। জীবন-কানন চিরকালই নবতর পুষ্প-পল্লবের স্বীয় অঙ্গসজ্জায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকে। এটাই তার চিরন্তন রীতি। ডারউইনের ক্রমবিকাশতত্ত্বের এক-একটি স্তরের পর্যালোচনা করলেই একথার সত্যতা উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।

প্রাকৃতিক নির্বাচন ও যোগ্যতমের উদ্বর্তন

ডারউইনতত্ত্বের প্রথম দুটো স্তর হলোঃ প্রাকৃতিক নির্বাচন ও যোগ্যতমের উদ্বর্তন। বস্তুত খাদ্যের স্বল্পতা ও সীমাবদ্ধতা এবং জন্মহারের অতি বৃদ্ধি পর্যায়ে ম্যালথাস যে পদ্ধতি উপস্থাপন করেছিলেন, তা ছিল শুধু মানব বংশ সম্পর্কিত। ডারউইন সে তত্ত্বকেই জীব-জগৎ পর্যন্ত সম্প্রসারিত করে দিয়েছেন। কিন্তু এর সপক্ষে তিনি কোন অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ কিংবা কোন ঐতিহাসিক সাক্ষ্য উপস্থাপিত করার প্রয়োজন মনে করেন নি। পশু-পক্ষী জীব-জন্তু কিংবা পোকা-মাকড়ের কোন্ প্রজাতিটি খাদ্যাভাবের দরুন কবে কোন কালে ধ্বংসের গ্রাসে নিপতিত হয়েছিল, ইতিহাসের অকাট্য দৃষ্টান্ত দিয়ে তাকে অনস্বীকার্য করার কোন দায়িত্বই তিনি গ্রহণ করেন নি। তার প্রয়োজনও মনে করেন নি তিনি।

একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিবেচনা করলেই এ তত্ত্ব প্রতিভাত হতে পারে যে, জীব ও প্রাণিজগতে এক প্রকার জীবন ও প্রাণী অন্যপ্রকার জীবন ও প্রাণীর জন্যে খাদ্য হয়ে আছে। যে প্রাণীগু'লো খাদ্যে পরিণত হচ্ছে সেগুলোর খাদ্য হল উদ্ভিদ। আর উদ্ভিদ ও জীবজন্তু উভয়ের ক্ষেত্রেই জন্মাধিক্যের ব্যাপক প্রবণতা সুস্পষ্ট লক্ষণীয়। উদ্ভিদ জগতে যে ভাবে এই প্রবণতা তীব্র ও ব্যাপক, জীব-জন্তু ও প্রাণিকুলেও অনুরূপ অবস্থা, কিছুমাত্র ব্যতিক্রম নেই। তার অর্থ হল, প্রাণিজগতে বংশ বৃদ্ধির হার অনুপাতে খাদ্যবৃদ্ধির ব্যাপক ব্যবস্থা কার্যকর। অতএব জীব জগতের জন্মবৃদ্ধির প্রবণতা নিদারুণ খাদ্যাভাবের দরুন কোনরূপ জীবন-সংগ্রামে (Struggle of Life) লিপ্ত হবে এরূপ ধারণা ভিত্তিহীন এবং নিতান্তই বাচালতা।

মানব-বংশ সম্পর্কে ম্যালথাসের দৃষ্টিভঙ্গী ভিন্নতর। মানুষ সাধারণ জীব-জন্তুর ন্যায় সব রকমের উদ্ভিদকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয় না। সভ্য ও

www.nagorikpathagar.org

সংস্কৃতিবান মানুষ মাত্র দু'চার ধরনের উদ্ভিদকেই খাদ্যরূপে গ্রহণ করতে অভ্যস্ত। প্রকৃতির সীমাহীন স্বয়ম্ভূ উদ্ভিদ-খাদ্য থেকে সে নিজেকে বঞ্চিত করেই রেখেছে। এ স্বতঃআরোপিত বাধ্যবাধকতার কারণে তারা নির্বাচিত খাদ্যের উৎপাদন ও পরিমাণ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে চাষাবাদের কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। আর তাতেও রয়েছে স্বাভাবিক বিপুল ও সীমাহীন সম্ভাবনা। যদিও এক্ষেত্রে মানুষ অনেক সময় নিজের অক্ষমতা, অবজ্ঞা এবং নৈসর্গিক কারণজনিত অভাব-অনটনের সম্মুখীন হতে বাধ্য হয়। কিন্তু সাধারণ জীব-জন্তু-প্রাণী ও আকাশচারী পক্ষিকুল এরূপ অবস্থা থেকে চিরমুক্ত। যে কোন প্রকারের উদ্ভিদ ও পোকা-মাকড়ই ওদের খাদ্য হতে পারে। এ কারণে ম্যালথাসের চিন্তাক্ষেত্র থেকে এরা বাদ পড়েছে। কিন্তু ডারউইন এ গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বটি সম্পূর্ণই উপেক্ষা করে গেছেন। তা সত্ত্বেও খাদ্যাভাবের দরুন জীব-জন্তু যদি কখনো জীবন-সংগ্রামের কঠিন দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে যোগ্যতমের উদ্বর্তনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়ও, তবু প্রশ্ন থেকে যায়, তার স্বরূপটা কি,তা কী ক্রমবিকাশ কার্যক্রমের চাহিদা ও প্রয়োজনাবলী সম্পূরণে সমর্থ? কঠিন বাস্তবের বিচারে এর জবাব নেতিবাচক। যে জীবন-সংগ্রাম ক্রমবিকাশ মতাদর্শের ভিত্তি, তা জীবদেহে অনুকূল ও কল্যাণকর পরিবর্তন সাধনের দাবিদার, কিন্তু খাদ্যাভাবের দরুন উদ্ভূত জীব-জন্তুর দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম জীবদেহে কোন প্রকারের পরিবর্তনের নিয়ামক হতে পারে না। স্বল্প-পরিমাণ খাদ্যের জন্য সৃষ্ট জীব-জন্তুর মধ্যকার পারস্পরিক যুদ্ধ ওদের স্বাভাবিক শক্তি-সামর্থ্য উজ্জীবিত করতে পারে বটে; কিন্তু ওদের দেহে কোন আংগীক পরিবর্তন সৃষ্টির কারণ হতে পারে না। খাদ্যাভাবের দরুন সৃষ্ট জীব-জন্তুর মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের পরিণতি শুধু এতটুকুই যে, অধিক শক্তিসম্পন্ন প্রজাতি দুর্বল প্রজাতিকে নিজের খাদ্য বানিয়ে নেয়। দুর্বল প্রজাতির খাদ্যাভাবের দরুন পরস্পর সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, না হয় না খেয়ে মরে বিলীন হয়ে যাবে। অথবা খাদ্যের সন্ধানে স্থানান্তরে গমন করবে। সেখানে খাদ্যের সংস্থান হলে তো বেঁচে যাবে, নতুবা সেখানেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হবে। ক্রমবিকাশ লাভের জন্যে দেহাঙ্গে যে ধরনের পরিবর্তন আবশ্যক, উল্লিখিত কোন একটি অবস্থাতেও তার না আছে একবিন্দু সম্ভাবনা, না আছে তার কোন চাহিদার প্রবণতা।

কালের ঘাত-প্রতিঘাতে জীব-জন্তুরা যদি ব্যাপকভাবে ও বিরাট আকারে স্থানান্তর গ্রহণে কখনো বাধ্য হয় এবং নতুন পরিবেশে ও নবতর আবহাওয়ার প্রভাবে তাদের দৈহিক সংগঠন ও সংস্থায় যদি সুপ্রকট কোন পরিবর্তন সাধিত হয়, তাহলেই এরূপ প্রবণতা ও চাহিদা লক্ষ্য করা যেতে পারে। উত্তর মেরুর বরফাবৃত শ্বেত চিতা কিংবা শীতপ্রধান দেশের ঘনলোমসম্পন্ন পার্বত্য ভেড়া যদি গ্রীষ্মপ্রধান দেশে স্থানান্তরিত হতে বাধ্য হয়, তাহলে পরিবর্তিত পরিবেশের প্রভাবে ওদের উষ্ণ মোটা চামড়া সাধারণ ছালে ও সংক্ষিপ্ত বিরল পশমে রূপান্তরিত হবে বলে অনুমান করা চলে; কিন্তু বাস্তব পর্যবেক্ষণ তার যথার্থতা

www.nagorikpathagar.org

স্বীকার করে না। ইতিহাস তার প্রমাণ উপস্থাপনে সম্পূর্ণ অসমর্থ। বাস্তব পর্যবেক্ষণ ও ইতিহাসের গতিধারায় এ-কথাই অকাট্য যে, চার হাজার বছর পূর্বে হযরত ইবরাহীম (আ) যে ভেড়া চরিয়েছিলেন, তা ঠাণ্ডা দেশেও ঘন লম্বা পশমাবৃত ছিল। আজ চার হাজার বছর পরও সমতল ভূমিতে সেই ঘন-লম্বা পশমাচ্ছাদিত ভেড়া চরে বেড়াচ্ছে। এর মাঝে হাজার হাজার বার নতুন বংশের উদ্ভব হয়েছে; কিন্তু ওদের আঙ্গিক পরিবর্তন কিছুই ঘটে নি এবং কোনরূপ পরিবর্তন ছাড়াই এ ভেড়ার বংশগুলো লালিত-পালিত ও পরিপুষ্ট হয়ে এসেছে। আবহাওয়া পরিবর্তনের তীব্র চাপের মুখে ভেড়ার পশমে একবিন্দু পরিবর্তন সূচিত হওয়াও প্রাকৃতিক নিয়ম পরিপন্থী বলে প্রমাণিত হল।

মোট কথা এই, যে বিশেষ ধরনের জীবন-সংগ্রামের সক্রিয়তা প্রমাণের উদ্দেশ্যে ডারউইন বংশবৃদ্ধি, খাদ্যাভাব ও স্থানান্তর গমন প্রভৃতি তত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, তার অধিকাংশই জীব-দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কোনরূপ পরিবর্তন সাধনের পক্ষপাতী নয়। আর যা-ও বা পরিবর্তন প্রবণতা ছিল, তা-ও প্রার্থিত পরিবর্তন সাধনে সম্পূর্ণ অক্ষম। চার সহস্র বছরের অভিজ্ঞতা এই সাক্ষ্যই দেয়।

ব্যক্তিগত আঙ্গিক পরিবর্তনের বংশানুক্রমিকতা

একই প্রজাতির জীব-জন্তুর স্বতন্ত্র ব্যক্তি-দেহের সংস্থা-সংগঠনে সামান্য তারতম্য (Individual Diff'erence) হয় এবং এ তারতম্যই অধঃস্তন বংশগুলোতে হালকা মত—অথচ ক্রমাগতই পরিবর্তন (variation) সাধনের ফল, আর তা প্রায়-ই বংশানুক্রমিক হয় বলে ডারউইন যে দাবি করেছেন, তা-ও যথার্থ নয়। কেননা স্বতন্ত্র ব্যক্তি দেহে যে সব পরিবর্তনের কথার উপর ডারউইন নির্ভর করেছেন, তা দুধরনের হতে পারে। একই পিতা-মাতার সন্তানের মধ্যে কয়েক প্রকারের আঙ্গিক আকার-আকৃতিগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। একজন দীর্ঘাকৃতি হলে অন্যজন বেঁটে একজন কালো বর্ণের হলে অপরজন উজ্জ্বল গৌর কিংবা শ্যাম। একটি মেয়ের ঘনকৃষ্ণ কেশদাম হলে অন্য মেয়েটির চুলের বর্ণ তামাটে হবে। একজনের চক্ষু ভ্রমরকালো হলে অন্যজনের ঘন নীল। কারও মাথায় ঘন কোঁকড়ানো চুল, কারও বিরল পাতলা চুল। কারুর মুখাকৃতি পুষ্ট গোলাকার, কারুর লম্বাটে। কেউ মোটা, কেউ কশ-পাতলা। এসব পার্থক্য অত্যন্ত স্বাভাবিক। শুধু তা-ই নয়, একই মানব-বংশের দুটি লোকও সর্বদিক দিয়ে এক ও অভিন্ন আকার-আকৃতির দেখতে পাওয়া যায় না। এ পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী, প্রকট ও অনস্বীকার্য—তা যতই ক্ষীণ ও সামান্য হোক-না কেন। জন্তু-জানোয়ার ও প্রাণিজগতেও এ পার্থক্য সর্বত্র বিরাজিত। কিন্তু প্রশ্ন হল, এ পার্থক্য কেন এবং এ কি বংশানুক্রমিক?

তা যা-ই হোক, এ পার্থক্য ও তারতম্য যে জীবন-সংগ্রাম ও জীবন-দ্বন্দ্বের পরিণতি, একথা কোন বুদ্ধিমান লোক-ই বলতে পারে না। কেননা মাতৃ-গর্ভে,

www.nagorikpathagar.org

গর্ভাবস্থাকালীন পরিবেশ সব সন্তানের জন্যে প্রায় অভিন্ন থাকে। সেখানে কোনরূপ দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের ফলে একটির গাত্রবর্ণ কালো, আর অপরটির চোখ ভ্রমর-কৃষ্ণ হয়ে গেছে, একথা পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। ডারউইন নিজেও একে জীবন-সংগ্রাম বলতে সঙ্কোচ বোধ করবেন। বস্তুত বিভিন্ন ব্যক্তিদেহে এরূপ তারতম্য যে সম্পূর্ণ ভিন্নতর কারণে উদ্ভূত, বৈজ্ঞানিক গবেষণা তা এক্ষণে স্বীকার করেছে।

উপরন্তু এ পার্থক্য ও তারতম্য যে বংশানুক্রমিক নয়, তা-ও সুস্পষ্ট। চামড়া, চোখ ও চুলের বর্ণ কিংবা আকার-আকৃতির তারতম্য যদি নিছক বংশানুক্রমিক হত, তাহলে একই পিতা-মাতার একই ঔরসে ও গর্ভাধারে জন্মগ্রহণকারী সন্তানদের মধ্যে এরূপ পার্থক্য কখনো হত না। তা যে বংশানুক্রমিক নয়, এ স্বাভাবিক পার্থক্য—তারতম্যই তার অকাট্য প্রমাণ। বস্তুত বংশানুক্রমিকতার দাবি অভিন্নতা ও সদৃশ, তারতম্য ও পার্থক্য নয়।

জীব-জন্তুর বংশবৃদ্ধিজনিত অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা দৈহিক আঙ্গিকতার পরিবর্তন পর্যবেক্ষণের দ্বিতীয় রূপ। ডারউইনের বিশেষ মতাদর্শ-প্রাসাদ এর-ই উপর প্রতিষ্ঠিত। বংশবৃদ্ধিতত্ত্বে পারদর্শী লোকেরা ঘোড়া, গরু, মোষ, হাঁস-মুরগীর বিভিন্ন বিশেষত্ব-সম্পন্ন বহু উত্তম ও উন্নত মানের বংশ উদ্ভাবন করে থাকেন। এ বিশেষত্বসমূহ বংশানুক্রমিক হয়। মুরগীর বংশ বৃদ্ধি তার একটি উজ্জ্বল প্রমাণ। বেশী বেশী ডিম দানে সক্ষম কিংবা বেশী হৃষ্ট-পুষ্ট মুরগী অধিক গোশত-সম্পন্ন বাচ্চা উৎপাদন করতে সক্ষম হয়। এ থেকে ডারউইন এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চেয়েছেন যে, লালন-পালন পদ্ধতিতে পরিবর্তন সাধন করে অধিক উন্নত মানের বংশ উদ্ভাবন করা সম্ভব। আর এ বিশেষত্ব বংশানুক্রমিকতার সাহায্যে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সংক্রমিত হতে পারে।

একথা অনেকটা সত্য এবং অনস্বীকার্য; কিন্তু তা যতটা পর্যবেক্ষণে আসে ততটাই, তার বেশী নয়। বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বিভিন্ন জীববংশে সেই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের উন্নতি ও উৎকর্ষ বিধান এবং তা অধঃস্তন বংশে সংক্রমিত করাই ছিল আসল লক্ষ্য। তার কার্যক্রম ও পদ্ধতি কি হতে পারে, তা-ই ছিল প্রশ্ন। কিন্তু যে-গুলোর মধ্যে আদৌ কোন বিশেষত্ব নেই, তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় নি। এ জন্যে কেবল মাত্র বাছাই করা ও উন্নত মানের বংশকেই গ্রহণ করা হয়েছে। খারাপ ও অনুন্নত মানের বংশ নিয়ে কখনো এ প্রচেষ্টা চালানো হয় নি, নিতান্ত পণ্ডশ্রম ও নিষ্ফল কষ্ট স্বীকার মনে করে। এজন্যে বংশানুক্রমিক বিধান ও খাদ্যের বিশেষ অধ্যয়ন চলেছে। কিন্তু এ সবের মূলে দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কোনরূপ মৌলিক ও আঙ্গিক পরিবর্তন সাধন কখনো লক্ষ্য ছিল না। আঙ্গিক পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে কখনই এরূপ করা হয় নি। অবস্থিত মৌলিক বিশেষত্বে উন্নতি বিধান ও উৎকর্ষ সাধনের উদ্দেশ্যেই এ সব করা হয়েছে। কিন্তু বংশবৃদ্ধি তত্ত্বে পারদর্শীদের

www.nagorikpathagar.org

এ সব অভিজ্ঞতাকে দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাঠামোর পরিবর্তন পর্যন্ত সম্প্রসারিত করার চিন্তা কেবলমাত্র ডারউইনের উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত, এবং তাকে বংশানুক্রমিক বলে তার ওপর মতাদর্শের ভিত্তি স্থাপন করা তাঁর-ই এক অভিনব ও হাস্যকর বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়। অথচ চেষ্টালব্ধ বিশেষত্ব চিরকালই ক্ষণস্থায়ী। তা কখনো বংশানুক্রমিক হয় না। উত্তরাধিকার বিধান তাকে কখনই বংশানুক্রমিক মেনে নিতে প্রস্তুত নয়।

কিন্তু উত্তরাধিকারিত্বের বিধান সম্পর্কে ডারউইন চরমভাবে অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ। মেন্ডেল-এর বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল তাঁর অবহিতি বহির্ভূত। নিছক চিন্তা-বিলাস ও আকাশ-কুসুম কল্পনাই তাঁর একমাত্র মূলধন। যে জিনিসকে তিনি বংশানুক্রমিক বলে অভিহিত করেছেন, তা যে আদৌ বংশানুক্রমিক নয়, তা-ও তাঁর অজানা। উইলিয়াম বেক লিখেছেনঃ

> জীব-জন্তুর বংশে কোন-কোন পরিবর্তন বা পার্থক্য সূচিত হতে থাকে, প্রকৃতপক্ষে এ ধারণাই ক্রমবিকাশতত্ত্বের ভিত্তি। ডারউইন মেন্ডেল-এর গবেষণা সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। তাঁর গ্রন্থ 'অরিজিন অব স্পীসিজ' থেকে স্পষ্ট মনে হয়, উপার্জিত পরিবর্তনসমূহ বংশানুক্রমিক হবে, এ কল্পনাকে বাস্তব প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে ডারউইন দৈহিক পরিবর্তনসমূহকে খুব ভয়ে-ভয়ে ও সংকোচ-সিদ্ধ পেঁচানো পন্থায় পেশ করেছেন। [Modern Science and the Nature of Life. P-224]

কিন্তু শেষ পর্যন্ত মেন্ডেল-এর গবেষণার যখন আত্মপ্রকাশ ঘটল এবং তিনি যখন বংশানুক্রমিকতা বিধান (Genetic Law) ব্যাখ্যা করে দিলেন, তখন ডারউইনের কল্পনার ভিত্তিহীনতা ও অন্তঃসারশূন্যতা প্রকাশিত হয়ে পড়ল। আর চেষ্টা-সাধনা ও দ্বন্দ্ব-সংগ্রামলব্ধ তথা উপার্জিত বিশেষত্ব যে বংশানুক্রমিক হয় না, তাতে কোন সন্দেহই অবশিষ্ট থাকল না।

বস্তুত জীবদেহের প্রত্যেকটি কোষে (life cell) এক বিশেষ ধরনের সূক্ষ্ম জীবাণু থাকে। তার নাম 'ক্রোমোসোম' (Chromosome)। প্রত্যেক প্রজাতি জীবের জন্যে 'ক্রোমোসোম'-এর সংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন। কিন্তু নির্দিষ্ট মানব দেহের প্রতিটি কোষে তেইশ জোড়া (৪৬টি) ক্রোমোসোম থাকে। ইউরোপের উন্নতমানের সংস্কৃতিসম্পন্ন শ্বেতাঙ্গ মানুষ কিংবা আফ্রিকার কৃষ্ণকায় আরণ্যিক, অথবা পীতবর্ণের চৈনিক বা রেড ইন্ডিয়ান—যে-ই হোক, সকলের ক্ষেত্রেই একথা সমানভাবে সত্য। আর এ ক্রোমোসোমই হয় উত্তরাধিকারমূলক গুণের ধারক। তা-ই হয় জীবন স্থিত রাখার নিয়ামক। গর্ভধারণের মাধ্যমে জীবন সংক্রমণের জন্যেও তা-ই দায়ী। গ্রেগর মেন্ডেল-এর আবিষ্কার ও পরবর্তীকালের অধিক গবেষণায় এ কথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

জীব কোষ বণ্টন ও বিভক্তির সাহায্যে বৃদ্ধি লাভ করে। এর দ্বারাই ভ্রূণের লালন-পালন সুসম্পন্ন হয়। সারাটি জীবন ধরে পুরাতন কোষের মৃত্যু ঘটে ও ঝরে পড়ে এবং নবতর কোষ তার স্থান গ্রহণ করে। শৈশবকালে নবতর কোষের উদ্ভব ও মৃত্যু সমান সমান হারে হয়ে থাকে। কিন্তু বার্ধক্যে কোষ মৃত্যুর হার কোষ সৃষ্টির হারের তুলনায় অনেক অধিক হয়ে যায়।

একক কোষ যখন বিভক্ত হয়ে দুটিতে পরিণত হয়, তখন বিভক্তিপূর্ব ক্রোমোসোম স্বাভাবিক কার্যক্রমের ফলে স্বীয় প্রতিভূ বানিয়ে নেয়। এভাবে উভয় নবতর কোষে তেইশ-তেইশ জোড়া ক্রোমোসোম বর্তমান থাকে।

নারী ও পুরুষের সঙ্গমে যখন গর্ভের সঞ্চার হয়, তখন পুরুষের শুক্রকীট তেইশ জোড়া নয়, তেইশটি একক ক্রোমোসোম নিয়ে আসে। অনুরূপভাবে স্ত্রীর ডিম্বকোষও তেইশ জোড়া নয়, তেইশটি একক ক্রোমোসোম নিয়ে আসে। আর উভয় মিলনে নবতর কোষে গর্ভের সঞ্চার হয়। পিতা-মাতার ক্রোমোসোম সংযুক্ত হওয়ার দরুন তা তেইশ জোড়ার ধারক হয়। এ কারণে ভ্রূণ পিতা-মাতা উভয়েরই বিশেষত্বের ধারক হয়ে থাকে। মহান আল্লাহ্‌র সৃষ্টিধারায় এ নিয়ম-ই কার্যকর রয়েছে চিরন্তন ও শাশ্বত হয়ে।

'ক্রোমোসোম' মূলত সূক্ষ্মতর অণুসমূহের একটা সুগ্রথিত মালা মাত্র। তার প্রতিটি বিন্দুকে বলা হয় 'জিন' (Gene)। প্রত্যেক ক্রোমোসোম–এ মালার জোড়া থাকে। আর প্রতিটি মালায় জিনের প্রায় তিন তিন হাজার বিন্দুর সমাবেশ থাকে। প্রতিটি বিন্দু একটা বিশেষ বিশেষত্বের ধারক ও রক্ষক হয়। এ বিশেষ জিনের সাহায্যেই সে বিশেষ বিশেষত্বটি উত্তরাধিকার ধারায় সংক্রমিত হয়। বলতে গেলে ক্রোমোসোম-এর মালা প্রতিটি ব্যক্তিমানুষের নিয়তি নির্দেশ। প্রতিটি দানার ওপর যে সব বংশানুক্রমিক নিয়তি মুদ্রিত হয়ে আছে, তা প্রতিটি জীব উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে থাকে। আর সে-ও পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে সংক্রমিত করে দেয়। বিশেষ বিশেষত্বের বংশানুক্রমিকতার এ-ই হল তত্ত্বকথা। বংশানুক্রমিকতামূলক বিশেষত্বে কখনো এক বিন্দু পরিবর্তন বা তারতম্য-পার্থক্য সংঘটিত হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত এ পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট জিনে (Gene) সূচিত না হবে। আর জিন এতটা দৃঢ় ও স্থায়ী হয়ে থাকে যে, তাতে খুব কমই পরিবর্তন এসে থাকে। অর্জনমূলক কার্যক্রম কিংবা জীবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার পার্থক্যে বা কর্ম পরিবর্তনের ফলে জিন-এ কোনরূপ পরিবর্তন আসতে পারে না। একারণে জীবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ব্যবহার বা কর্মপ্রয়োগ কিংবা তার প্রক্রিয়ায় রদ-বদল অথবা এধরনের কোন উপায়ে অর্জিত বিশেষত্ব বংশানুক্রমিক হতে পারে না।

ক্রোমোসোম-এর মালা কিংবা জিন-এ কোনরূপ অস্বাভাবিক দুর্ঘটনার কারণে যদি গুরুতর কোন পরিবর্তন সূচিত হয়, কিংবা তেইশ জোড়া ক্রোমোসোম থেকে কোন একটি ক্রোমোসোম কঠিনভাবে আহত ও ক্ষতবিক্ষত হয়, তাহলে সন্তানের

www.nagorikpathagar.org

বন্ধ্যাত্ব-ই তার পরিণতি। অর্থাৎ উত্তরাধিকার সূত্রে আঘাত প্রাপ্ত 'ক্রোমোসোম' লাভকারী সন্তানদের বংশধারা সম্মুখের দিকে চলতে পারে না, তাদের কোন অধঃস্তন পুরুষ থাকতে পারে না। জীবনের এ ধারাবাহিকতা এখানেই শেষ ও ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু 'ক্রোমোসোম' যদি কোন কারণে কঠিনভাবে আহত না হয়, বরং তার সহস্র জিন (Gene) এর মধ্য থেকে মাত্র কিছু সংখ্যক জিন-ই আঘাতপ্রাপ্ত হয়, তাহলে ভূমিষ্ঠ হওয়া সন্তানদের মধ্যে জন্মগত বা সৃষ্টিগত ত্রুটি অথবা নানা পরিবর্তন সূচিত হয়। এ পরিবর্তনসমূহ অবশ্যই বংশানুক্রমিক হয়ে থাকে। রোগজীবাণু (Germs) ও virus (সংক্রামক রোগের বীজ)-এর জিন এর ওপর রঞ্জনরশ্মির মহাজাগতিক রশ্মিসমূহ পূঞ্জীভূতকরণের সাহায্যে গৃহীত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে আধুনিক জীব বিজ্ঞান এসব তত্ত্ব ও তথ্য জানতে পেরেছে।

উত্তরাধিকার বিধানের এ নবতর আবিষ্কার বা উদঘাটন ডারউনের মতবাদের মূল শিকড়টিকেই ছিন্ন করে দিয়েছে। কেননা পরিবেশের সঙ্গে উত্তম সামঞ্জস্যতার দাবিতে জীবদেহ নিজের মধ্যে আঙ্গিক পরিবর্তন সাধনে সচেষ্ট থাকে। ক্রমাগতভাবে অধঃস্তন বংশাবলীর মধ্যে সক্রিয় মন্থর গতির কার্যক্রম একের পর এক বংশে সামান্যতম পরিবর্তন সৃষ্টি করে চলে। শেষ পর্যন্ত এসব সামান্যতম ও ক্ষীণতম পরিবর্তন পূঞ্জীভূত ও একত্র সন্নিবদ্ধ হয়ে জীবদেহে একটা সুস্পষ্ট পরিবর্তন হয়ে দাঁড়ায়। ডারউইনের মতাদর্শের প্রাসাদ এ 'তত্ত্বের ওপর-ই ভিত্তি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কিন্তু বংশানুক্রমিক সংক্রমণ বলছে, জীবদেহে অর্জনমূলক কার্যক্রমের দূরত্ব আদৌ কোনরূপ পরিবর্তন সূচিত করে না। বাহ্যত কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেলেও তা বংশানুক্রমিক হতে পারে না। এ কারণে পরবর্তী সন্তানদের মধ্যে তার সংক্রমণ অসম্ভব। তার প্রমাণ এই যে, এ ধরনের পরিবর্তনসমূহ জিন্‌স (Genes)-এ কোনরূপ পরিবর্তন সৃষ্টি করে না। মনস্তত্ত্ববিদ' রবার্ট উড্‌ওয়ার্থ (Robert Woodworth) এবং ডোনাল্ড মারকুইস (Donald Marquis) তাঁদের 'মনস্তত্ত্ব' (Psychology) পাঠ্যপুস্তক-এ লিখেছেনঃ

'অর্জিত বিশেষত্ব কখনো কি বংশানুক্রমিক হতে পারে?—প্রাচীন ক্রমবিকাশ তত্ত্ব ধরে নিয়েছিল, ব্যক্তিসত্তায় পরিবেশের চাপে সৃষ্ট পরিবর্তনসমূহ এবং নিজের চেষ্টাক্রমে অর্জিত পরিবর্তনগুলো সন্তানদের মধ্যে সংক্রমিত হতে পারে এবং বংশের পর বংশে সে পরিবর্তনের প্রভাবগুলি একত্রিত ও সঞ্চিত হতে থাকে। কিন্তু এই মতের সমর্থন ও সত্যতা প্রমাণের সাক্ষ্য সন্ধান করার ব্যাপারে অনেক চেষ্টা করেও কোন সাক্ষ্য ও প্রমাণ সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয় নি। ফলে জীববিদ্যায় পারদর্শী লোকেরা এখন এ মত প্রত্যাহার করেছেন। বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারিত্ব সম্পর্কে আমাদের আধুনিক জ্ঞান থেকে

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশিত হয়েছে যে, অর্জিত বিশেষত্বগুলোর উত্তরাধিকার রূপে সংক্রমিত হওয়া সম্ভবপর নয়। কোন পুরুষ ও তার স্ত্রী উভয়ই যদি হস্তশ্রম ও কষ্টসাধ্য কাজ করার দরুন নিজেদের হাতে শাণিত শক্ত গিরা সৃষ্টি করিয়ে নেয়, তাহলে চর্মের এ ধরনের পরিবর্তন তাদের জিন্‌স (Genes)-কে কিভাবে প্রভাবিত করতে পারে? আর সত্য কথা এই যে, তাদের সন্তানদের চর্মে এ প্রভাব সংক্রমিত হয় না। (Psychology. P. 195)

কোনরূপ তেজস্ক্রিয়ার সম্পর্কে এসে কোন অস্বাভাবিক পন্থায় যদি জিনস-এ কোনরূপ পরিবর্তন সূচিত হয়, তাহলে তার ফলে জীবনের দেহ-কাঠামোর পরিবর্তন তাৎক্ষণিক হয় অর্থাৎ সন্তান-সন্ততির মধ্যে পূর্ণমাত্রায় প্রতিফলিত হয়। তা অনুকূল ও কল্যাণমূলক হয় নাঃ হয় নির্বিচারে ও ঘটনামূলকভাবে (accidentally)। এরূপ সন্তান সাধারণত বন্ধ্যা হয়ে থাকে, তারা নিজের বংশ রক্ষা করতে পারে না। আর যদি রক্ষা করেও, তবুও তাতে সে ত্রুটি অবশিষ্ট এবং অব্যাহত থাকে। তাতে অধিক অনুকূল ও সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিবর্তন সূচিত হতে পারে না। উইলিয়াম বেক তাঁর Modern Science and the Nature of Life গ্রন্থে লিখেছেনঃ

মেন্ডেলের গবেষণা প্রত্যেক জৈব প্রজাতি ও প্রত্যেক বংশের জিন্‌সকে স্বতন্ত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ পরিবর্তন-অযোগ্য ঘোষণা করে। সূচনাপর্বে প্রাণীর বিভিন্ন প্রজাতি ও জাতি শ্রেণী সর্বপ্রথম কিভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল তা থেকে তা প্রমাণ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কেননা, ক্রমবিকাশ মতাদর্শের ভিত্তিই হচ্ছে এই প্রকল্প যে, প্রাণীরা এক প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতিতে রূপান্তরিত হতে থাকে।.... একদিকে জিন্‌স এর স্থায়িত্ব ও স্থিতিশীলতা এবং অপরদিকে প্রাণীর জাতি ও প্রজাতিতে পরিবর্তিত হওয়া—এ দুটি তত্ত্বের পারস্পরিক বৈপরীত্য কী করে দূর করা যেতে পারে?...পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল তো এই পাওয়া যায় যে, জিন্‌স-এ এক বিরল ও আকস্মিক পরিবর্তনই ক্রমবিকাশ পর্যায়ের পরিবর্তন পার্থক্যের কারণ হতে পারে, যার কারণ সম্ভবত মহাজাগতিক তেজস্ক্রিয় বিক্ষিপ্তির পথহারা কোন তীর।.....এটাই ক্রমবিকাশ কার্যক্রমের নিমিত্ত হতে পারে। (২২৫ পৃঃ)

বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অ্যাসাক অ্যাসীমভ (Assaac Asimov) The Genetic Code নামে একখানি বই প্রকাশ করেছেন। তাতে তিনি বংশপরম্পরাগত সংক্রমণ সম্পর্কে আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। এই বইতে ক্রোমোসোমের চূর্ণবিচূর্ণ হওয়া ও জিন্‌স এ পরিবর্তন সাধিত হওয়ার ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ার কথা উল্লেখ করার পর গ্রন্থকার লিখেছেনঃ

জিন্‌স এ পরিবর্তন সাধিত হওয়ার প্রতিক্রিয়া সব সময় ক্ষতিকরই হয় না। অনেক পরিবর্তন তো এমনও হতে পারে যা নিছক শুভ দুর্ঘটনার ভিত্তিতে

www.nagorikpathagar.org

কোন প্রাণীকে তার পরিবেশের সাথে উত্তম পন্থায় সামঞ্জস্যশীল করে দেবে। প্রাকৃতিক নির্বাচনের সাহায্যে ক্রমবিকাশ কার্যক্রম এরূপ অবস্থার ওপরই নির্ভরশীল হয়ে রয়েছে। (১৪৫ পৃঃ)

এ উক্তি থেকে স্পষ্ট মনে হয়, তাঁর দৃষ্টিতেও ডারউইনের মতাদর্শ উত্তীর্ণ হতে পারছে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও জৈব জীবনের ক্রমবিকাশ লাভের কথা মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলতে এদের মন প্রস্তুত নয়। তাই কোন নৈসর্গিক ঘটনার কারণে জিন্‌স-এ যে সম্ভাব্য পরিবর্তন ঘটে যায়, তার থেকে খুব সামান্য পরিমাণে শুভ পরিবর্তন সূচিত হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে বিধায় তারই সহায়তায় ক্রমবিকাশ মতাদর্শকে বহাল থাকতে দিতে তাঁদের চেষ্টার অন্ত নেই।

কিন্তু মহাজাগতিক তেজস্ক্রিয়া বিক্ষেপণের কোন লক্ষ্যভ্রষ্ট শর দ্বারা কী ঘটতে পারে বলে আশা করা যায়?...বৈজ্ঞানিক যাচাই পর্যালোচনার ফলে জানা যায়, মহাজাগতিক তেজস্ক্রিয়া বিক্ষেপণের লক্ষ্যভ্রষ্ট শরসমূহ দ্বারা ক্ষতি ছাড়া কোন কল্যাণ সাধিত হওয়ার একবিন্দু আশাও করা যেতে পারে না। বিশ্বমানবতা এ তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে কেবল একবারই শিক্ষাগ্রহণ করেছিল। কিন্তু তার ফলাফল খুবই নৈরাশ্যজনক প্রমাণিত হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে আণবিক বোমা আবিষ্কৃত হয়েছিল। কিছু কিছু বোমা তৈরীও করা হয়েছিল। তখন জার্মানী ও জাপানের ভয়াবহ ও মর্মান্তিক পরিণতিও প্রকট হয়ে উঠেছিল। উভয় দেশ চরম অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল। জার্মানী পরাজয়বরণ করে নিয়েছিল এবং জাপানও অস্ত্র সংবরণে প্রস্তুত হয়ে বসেছিল। ঠিক এই মুহূর্তে মার্কিন কর্তৃপক্ষ সহজভাবে যুদ্ধটাকে শেষ করে দিতে প্রস্তুত হল। তাদের দৃষ্টিতে আণবিক বোমার ধ্বংসকারিতা মানবজাতির ওপর তেজস্ক্রিয়া বিক্ষেপণের প্রতিক্রিয়া কি হয় তা জানার এটাই ছিল উপযুক্ত সময়। তারা এ সুযোগকে কিছুতেই হাতছাড়া করতে রাযী ছিল না। এ কঠিন পরীক্ষা এসময়ই চালানোর প্রয়োজনীয়তা তারা অনুভব করে বসল। তাই জ্ঞানে-বিজ্ঞানে সমুন্নত এ মানব দুশমনেরা হিরোশিমা ও নাগাসাকির ওপর এটম বোমার বিস্ফোরণ ঘটাল। জাপানে অমানুষিক ও অদৃষ্টপূর্ব ধ্বংসযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হল। পরক্ষণেই জাপান বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করে বসল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অবসানকালে হিরোশিমা ও নাগাসাকির ওপর আণবিক বোমা বিস্ফোরণের ফলে যাদের ওপর তেজস্ক্রিয়া বিক্ষেপণ ঘটেছিল, তাদের কারুর ওপর তার প্রতিক্রিয়া মন্দ ছাড়া ভাল হয়েছিল বলে যদি কোন একটা সামান্য দৃষ্টান্তও পাওয়া যেত, তাহলে তেজস্ক্রিয়া বিক্ষেপণকে ক্রমবিকাশ মতাদর্শের অনুকূল ও সমর্থক বলে মেনে নেয়া যুক্তিসঙ্গত হতে পারত। কিন্তু তেমন একটি দৃষ্টান্তও পেশ করা সম্ভব নয়। এ কারণে তেজস্ক্রিয়া বিক্ষেপণকে ক্রমবিকাশের নয়—ধ্বংসের কারণ বলেই মনে করা একমাত্র যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত হতে পারে, অন্য কিছু নয়।

www.nagorikpathagar.org

আর অসম্ভবকে সম্ভব বলে মেনে নেয়া হিসেবে মহাজাগতিক তেজস্ক্রিয়া বিক্ষেপণে কোন পথভ্রষ্ট তীর কোন প্রজাতীয় জীবে কোনরূপ বিকাশমূলক পরিবর্তন সূচিত করেছে বলে যদি ধরে নেয়া যায়, তাহলে ইতিহাস থেকে তো তার কোন না কোন দৃষ্টান্ত অবশ্যই পেশ করতে হবে। উপরন্তু একথাও প্রমাণ করার প্রয়োজন দেখা দেবে যে, সে পরিবর্তন এতই সুস্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ যে, তা যার মধ্যে সূচিত হয়েছে, তাকে এক নবতর প্রজাতি বলে নির্দিষ্ট করা যাবে। তেমন কোন দৃষ্টান্ত পেশ করা গেলেও তা একটা ব্যক্তিসত্তারই (Single individual) হতে পারে, তার বেশী কিছু নয়। তাহলে সে ব্যক্তিসত্তা যদি পুরুষ হয়, তবে তার স্ত্রী এবং স্ত্রী হলে তার পুরুষ কোথায় পাওয়া যাবে, যা হবে এই নবতর প্রজাতিরই একটি? এরূপ হলেই না তাদের যৌন সঙ্গমের মাধ্যমে তাদের এ নবতর বংশ বৃদ্ধি পেতে ও নিচের দিকে তা অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত চলতে পারবে। আর, যদি পুরুষ স্ত্রী একই প্রজাতির না হয়—যদি একজন প্রাচীন প্রজাতির হয় ও তার সাথে সুবিধাজনক যৌন সঙ্গমের সম্ভাবনা অবশিষ্ট থাকে, তা হলে তাদের বংশধারায় নতুন প্রজাতির প্রভাব অর্ধেক মাত্রায়ই সংক্রমিত হতে পারে। এভাবে এ বংশ যতই সম্মুখের দিকে অগ্রসর হতে থাকবে, ততই সে নতুন প্রজাতির বৈশিষ্ট্য ক্ষীণ হতেও ক্ষীণতর হয়ে যাবে এবং সর্বশেষে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তার ফলে ক্রমবিকাশ কার্যক্রমের পরিসমাপ্তি ঘটবে। পক্ষান্তরে যেহেতু মহাজাগতিক তেজস্ক্রিয়ার দরুন এই একক উত্তম পরিবর্তনের বিপরীত দিকে বহুলক্ষ সংখ্যক নিকৃষ্টতম পরিবর্তনের ধারকও থাকবে, তাদের বংশধারাও অব্যাহতভাবে চলবে; কাজেই এ ধরে নেয়া কথাটি বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে তখনই, যখন এ প্রজাতীয় জীবে খাবার ও নিকৃষ্টতম দৃষ্টান্তও দেখানো সম্ভব হয়। কিন্তু সত্যি কথা এই যে, তা আদৌ সম্ভবপর নয়। এরূপ একটি দৃষ্টান্তও কোথাও পাওয়া যায় না।

অতএব এ ধারাবাহিকতা সম্মুখের দিকে অগ্রসর হতে পারে না। বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, কোন দুর্ঘটনার ফলে জিন্‌স-এ অনুষ্ঠিত অস্বাভাবিক পরিবর্তনের ফল এই হয় যে, যার মধ্যে সে পরিবর্তন সংঘটিত হবে, তার সন্তান-সন্ততি বন্ধ্যা হয়ে যাবে। তার বংশধারা স্তব্ধ হয়ে যেতে বাধ্য হবে। মহাজাগতিক তেজস্ক্রিয়া কার্যক্রমের তীব্র প্রভাব জৈব ডিম্বকোষের ওপর খুব-ই মারাত্মক হয়ে দেখা দেয়। একারণেই এধরনের বহু ঘটনা-দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও ইতিহাসে তার কোন চিহ্ন পর্যন্তও অবশিষ্ট থাকে না। এই ধরনের ঘটনা-দুর্ঘটনার পরিণাম ধ্বংস ও বিনাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। নতুন জীবন লাভ তা দ্বারা সম্ভব হয় না। ক্রমবিকাশ মতাদর্শও তার নিকট থেকে কোন সমর্থনই পেতে পারে না।

পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো জীবন সংগ্রাম ও প্রাকৃতিক নির্বাচন

ডারউইনের ক্রমবিকাশ মতাদর্শের চতুর্থ ধাপ হলঃ

পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য সৃষ্টির জন্যে জীবন সংগ্রামের ধারাবাহিক দ্বন্দ্বের

www.nagorikpathagar.org

ফলে প্রাণীর দেহে হালকা ধরনের যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত হয়, এবং তা যদি কল্যাণকর প্রমাণিত হয়, তাহলে তা প্রাণিবংশের স্থিতি ও দৃঢ়তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে তা যদি ক্ষতিকর হয়,তাহলে এই পরিবর্তন ও পরিবর্ধনই পরিবেশের অনানুকূল্যের মাত্রা বৃদ্ধি করে প্রাণিবংশের ধ্বংসের কারণ হয়ে পড়ে। এভাবে জীবন সংগ্রামের দ্বন্দ্বে সেই প্রাণিবংশই রক্ষা পায় ও অবশিষ্ট থাকে, যা কল্যাণকর পরিবর্তনের নিরবচ্ছিন্ন প্রাকৃতিক নির্বাচনের (Natural selection) অধিকারী হয়েছে। কল্যাণকর পরিবর্তনের নিরবচ্ছিন্ন সমন্বয়-ই অবশিষ্ট বংশাবলীতে ক্রমবিকাশ কার্যক্রমের উদ্‌গাতা হয়ে থাকে।

কিন্তু এ চতুর্থ ধাপ ঠিক তখন পর্যন্তই কল্যাণকর ছিল যতক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তনের কার্যক্রম খুবই শ্লথগতি ও বংশানুক্রমিকভাবে কার্যকর বলে মনে করা হয়েছে। কিন্তু এখন যখন জিন্‌স এ আকস্মিক পরিবর্তনই পরিবর্তন সৃষ্টির কারণ বলে নির্ধারিত হয়েছে এবং তার তাৎক্ষণিক ও পূর্ণাঙ্গ প্রভাব পরবর্তী বংশে পুরোমাত্রায় প্রতিফলিত হওয়াকেই বাস্তব বলে ধরে নেয়া হয়েছে, তখন ক্রমবিকাশ কিংবা অক্রমবিকাশ-এর কার্যক্রম অধারাবাহিক ও অনানুকূল নির্ধারিত হয়েছে। তাকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমিত ও লক্ষদানকারী মনে করা হয়েছে। আর সে লক্ষ-ও এমন ধরে নেয়া হয়েছে, যার ক্রমবিকাশমূলক হওয়া অবধারিত ও আবশ্যিক ছিল না। গঠনমূলক ও সৃজনশীল হওয়ার সুযোগের তুলনায় ধ্বংসাত্মক হওয়ার ক্ষেত্রসমূহ অনেক বেশী বলে মনে করা হয়েছে। উপরন্তু জিন্‌স এ সংঘটিত পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়ার সাথে প্রাণীর চাহিদাসমূহের কোন সম্পর্ক থাকল না। মনে হয়, কোন কোন প্রাণীর জিন্‌স-এর কোথাও কোথাও এমন আকস্মিক পরিবর্তন সাধিত হতে শুরু হয়েছে,. যার উত্তম বা নিকৃষ্টতম হওয়া বিষয়ে কোন পূর্বাভাস দেয়া যেতে পারে না। তত্ত্ব ও তথ্যের এই নতুন আবিষ্কারও ক্রমবিকাশ মতাদর্শের মিথ্যা ও অগ্রহণযোগ্য হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হিরোশিমা ও নাগাসাকির অভিজ্ঞতা থেকে জানা গেছে যে, মহাজাগতিক তেজস্ক্রিয়া নিক্ষেপণে আঘাতপ্রাপ্তদের জিন্‌স-এ যতখানি পরিবর্তন সূচিত হয়েছে, তা সবই ছিল ধ্বংসমূলক। লক্ষ লক্ষ আহত মানুষের মধ্যে কোন একজনের মধ্যেও কোনরূপ 'গঠনমূলক বা সৃজনশীল' পরিবর্তন সূচিত হওয়ার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নি। কাজেই প্রাকৃতিক নির্বাচন তো এটাই হবে যে, আঘাত না পাওয়া ব্যক্তিদের অপেক্ষা আণবিক তেজস্ক্রিয়ার প্রভাবে আহত সমস্ত প্রাণিবংশ-ই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে এবং প্রাচীন আঘাত না পাওয়া বংশগুলিই শুধু অবশিষ্ট থেকে যাবে। এ থেকে একথাই প্রমাণিত হল যে, জিন্‌স এ তেজস্ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়াজনিত সমস্ত পরিবর্তনই ধ্বংসমূলক হয়ে থাকে এবং তা কখনো কোন ক্রমবিকাশমূলক কার্যক্রমের কারণ বা নিমিত্ত হয় না। প্রাকৃতিক নির্বাচনের সুযোগই আসে না এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনের আধিক্য ও সমন্বয়ের দরুন ক্রমবিকাশ কার্যক্রমের অস্তিত্ব লাভ এমন একটা দিবাস্বপ্নে পরিণত হয়, যার কোন বাস্তবতা-ই সম্ভব নয়।

www.nagorikpathagar.org

ক্রমবিকাশ মতাদর্শের পঞ্চম ও ষষ্ঠ ধাপ

ক্রমবিকাশমূলক স্তরসমূহ অতিক্রম করার এই কার্যক্রম খুব-ই শ্লথগতি হওয়ার কারণে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে না ও বোঝা যায় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও কার্যত এই কার্যক্রম উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের প্রত্যেক প্রজাতি ও জাতিতে শত সহস্র যুগ ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলে আসছে।

এবং প্রাণীদের প্রজাতি ও জাতিসমূহের অধিকাংশ ধাপ এত দূর ধারাবাহিক ও পরস্পরসন্নিবদ্ধ দেখা যয় যে, তাতে একটি প্রজাতিকে অপর প্রজাতির উন্নত রূপ বলেই মনে হয় এবং তা দেখে ক্রমবিবর্তনের ধারাবাহিকতা প্রকট হয়ে ওঠে, তাতে মানুষকে বনমানুষ ও বানরের ক্রমবিকশিত ও উন্নত রূপ ধরে নেয়াই সমীচীন মনে হয়। আর এ গোটা ক্রমবিকাশ ধারার প্রাথমিক ধাপ এককোষ সমন্বিত জীবনের অধিকারী অণুবীক্ষণীমূলক সূক্ষ্মতম কীটই হবে, যা কখনো দুর্ঘটনাবশত অস্তিত্ব লাভ করে থাকবে।

বলা বাহুল্য, ক্রমবিকাশবাদের শিকড়ই যখন কর্তিত হয়ে গেছে, তখন এসব কথা নিতান্তই অর্থহীন প্রলাপ মাত্র। এ ধরনের যুক্তি দ্বারা তাকে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না। বস্তুর উদ্ভিদ ও প্রাণিকুলের প্রত্যেক প্রজাতি ও জাতিতে ক্রমবিকাশ কার্যক্রম অব্যাহত থাকা একটি ভিত্তিহীন চিন্তা ছাড়া কিছুই নয়। এর সমর্থনে কোন দৃষ্টান্তই পেশ করা সম্ভব হয় নি। সুতরাং আল্লাহর মহান সৃষ্টি এই মানুষকে বনমানুষ ও বানরের ন্যায় নিকৃষ্টতম জন্তুর বংশধর বলার একথা বিভ্রান্তি ও জঘন্য মানসিকতা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। এক প্রজাতীয় প্রাণী ও অপর প্রজাতীয় প্রাণীর মধ্যে বংশপরম্পরায় সংক্রমণ বিধান genetic law এক দুরধিগম্য প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাকে লঙ্ঘন করা কিংবা চূর্ণ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। বিভিন্ন প্রজাতীয় প্রাণীর ক্রোমোসোম ও জিন্‌স-এর বিভিন্ন সংগঠন ও পরিমাণ উদ্ভিদ কিংবা জৈবিক প্রজাতির পরস্পরের মধ্যে পরিবর্তিত হওয়াকে অসম্ভব বলে ঘোষণা করছে এবং সামান্য ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জীবাণুকীট থেকে মহান মানুষের ক্রমবিকশিত ও রূপান্তরিত হয়ে আসাটা একটি রঙিন স্বপ্ন ও বাস্তবতাহীন মায়া-মরীচিকায় পরিণত হয়ে গেছে।

বস্তুত প্রাণিদেহে ক্রমবিকাশমূলক পরিবর্তন সূচিত হওয়ার ধারণাটি ছিল ডারউইনের একটি কল্পনা। এটা তার একটি আত্মপ্রতারণাও বটে। কিন্তু তা-ও বেশীক্ষণ টিকে থাকে নি। অনতিবিলম্বেই তা ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়েছে। একালের বিজ্ঞানীরা তার এ কল্পনাকে বাস্তব বলে মেনে নিতে এবং তাঁর মত গ্রহণ করে বিভ্রান্ত ও সত্যভ্রষ্ট হতে আদৌ প্রস্তুত নন। কেননা ক্রোমোসোম ও জিন্‌স-এর বিশেষত্বসমূহ একথা মেনে নিতে একান্তভাবে বাধ্য করে যে, এক কোষ-সম্পন্ন প্রাণীর সরল রূপ অধিক কোষ-সম্পন্ন প্রাণীর জটিলতম রূপে বিবর্তিত হতে পারে না। তার কারণ এই যে, উভয় প্রাণীর ক্রোমোসোমের

www.nagorikpathagar.org

সংগঠনে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। দৈহিক বিভক্তির দরুন বংশবৃদ্ধিকারী প্রাণিসমূহের রূপ এমনভাবে বিবর্তিত হতে পারে না যা পুরুষ ও স্ত্রীর যৌন মিলনের মাধ্যমে অনুরূপ বংশধর সৃষ্টি করবে। কেননা জিন্‌সই তা হওয়ার পথে প্রধান প্রতিবন্ধক। অতএব প্রাণীদের প্রত্যেক প্রজাতি স্বয়ংসম্পূর্ণ কোন সরলতম অথবা নিম্ন পর্যায়ের প্রজাতি থেকে বিবর্তিত হয়ে আসে নি। একথা মেনে নেয়া ছাড়া উপায়ান্তর থাকতে পারে না। তাই বিজ্ঞানীরা কখনো অস্পষ্ট আর কখনো খোলাখুলিভাবে বলতে বাধ্য হনঃ

'অন্যান্য মতাদর্শের ন্যায় ক্রমবিকাশ মতাদর্শও বিশ্বাস্য নয়'। Modern Science and Nature of Life. P. 133

বর্তমানে এরূপ স্বীকারোক্তির প্রভাব ব্যাপক হয়ে দেখা দিয়েছে। স্বয়ং ডারউইনের চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী গ্রন্থের যে সব নতুন সংস্করণ একালে প্রকাশিত হচ্ছে, তার কোন এক সংস্করণের ভূমিকায় সম্পাদকবৃন্দ নিম্নোদ্ধৃত ধরনের কথাও দিতে বাধ্য হচ্ছেন ইদানিংঃ

ডারউইনের গ্রন্থ প্রকাশের পর দশ বছরের মধ্যেই গ্রেগর মেন্ডেলের ঐতিহাসিক ও বিপ্লবী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। তা সত্ত্বেও একথা সত্য যে, ডারউইনের যুগে আঙ্গিক পরিবর্তনের বংশানুক্রমিক সংক্রমণ নির্ভুলভাবে বুঝতে পারা যায় নি। এখন মানুষ চিন্তা করে যে,ডারউইন যদি মেন্ডেলের প্রবন্ধ পাঠ করতে পারতেন, তাহলে তাঁর অবস্থা কি দাঁড়াত? বর্তমানে আমরা মেন্ডেল প্রদর্শিত চিন্তার নবতর পদ্ধতিতে জানতে পেরেছি যে, বংশানুক্রমিক বস্তুর বিশেষ একক (Unite) জিন্‌স যেমন নির্দিষ্ট তেমনি মিশ্রণ-অযোগ্য। অর্থাৎ এক প্রজাতির জিন্‌স অন্য প্রজাতির জিন্‌স-এ রূপান্তরিত বা সংক্রমিত হতে পারে না। তা বংশানুক্রমিক সংক্রমণে মূলতই পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র এবং নিজস্ব কোষের কেন্দ্রবিন্দুতে বন্দী। আর এদেরই নির্বাচিত ধাপ বা স্তরসমূহ পুরুষ ও স্ত্রী শুক্রকীট কোষের মাধ্যমে বিশেষত্বসমূহকে এক বংশ থেকে ভিন্নতর বংশে সংক্রমিত করে। এসব এককে পরিবর্তন—অর্থাৎ জিন্‌স-এ পরিবর্তনসমূহ—সব সময় আকস্মিকভাবেই সঙ্ঘটিত হয়ে থাকে, হয়ে থাকে কোষসমূহের উপরিভাগে এবং পরিবর্তন কার্যক্রম ক্রমবিকাশমূলক দৃষ্টিভঙ্গীতে ফিরে আসতে পারে না। এ বংশানুক্রমিক পরিবর্তনসমূহের কার্যক্রমে বিশেষ লক্ষ্যযোগ্য বিশেষত্ব এই যে, তা অসংবদ্ধ , পরস্পর সংযোগহীন এবং আকস্মিক। অধিকন্তু এসবের প্রতিক্রিয়ার স্বরূপও আকস্মিক দুর্ঘটনামূলক। তাদের গতি ও লক্ষ্যও অনির্দিষ্ট। এভাবে যে জীবের মধ্যে এসব পরিবর্তন সংঘটিত হয়, তার স্বভাবগত চাহিদার সাথে এসব পরিবর্তনের কোন সংযোগ আছে বলে কোন প্রমাণই পাওয়া যায় না।

(The Origin of Spcies. Introduction; P. 17)

www.nagorikpathagar.org

এমনকি ডারউইনের প্রগলভ প্রচারক থমাস হাক্সলি (Thomas Huxley) ক্রমবিকাশবাদের পক্ষে যে উন্মাদনাময় প্রচারণা চালিয়েছিলেন, শেষকালে তাকে তার প্রায়শ্চিত্তও করতে হয়েছে। ম্যাক ডোগাল (Mc Dougal) এর উদ্ধৃতি দিয়ে উইলিয়ম বেক্ এ সম্পর্কে লিখেছেনঃ

> হাক্সলি ডারউইনের মতাদর্শের একজন শক্তিশালী প্রচারক ছিলেন এবং তাঁর প্রতি ছিলেন দৃঢ় প্রত্যয়সম্পন্ন। জৈব রসায়নের যান্ত্রিক মতবাদটিকে তিনি খুব সুন্দরভাবেই সম্মুখের দিকে অগ্রসর করিয়ে দিয়েছিলেন। সেই হাক্সলি-ই শেষ পর্যন্ত স্বীয় পূর্বকালীন যাবতীয় প্রচার ও শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির প্রতিবাদ করেছেন এবং মানব জাতিকে উপদেশ দিয়েছেন যে, তিনি সারা জীবন ভরে যেসব মতবাদ প্রবলভাবে ব্যাপক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে প্রচার করেছেন, সে সবকে তারা যেন প্রত্যাখ্যান করে দেয়। মনে হয়, মানুষের বাস্তব জীবনের ওপর যান্ত্রিক জৈব মতবাদের কি রকম মারাত্মক প্রভাব প্রতিফলিত হয় তা হাক্সলি নিজেই যখন গভীরভাবে চিন্তা বিবেচনা করে দেখেছেন, তখন এসব মতবাদের প্রতি তাঁর মনে তীব্র ঘৃণার উদ্রেক হয়েছিল। (Modern Science and the Nature of life " P. 144)

বস্তুলোকে জীবনের সঞ্চারণ পর্যায়ে বস্তুবাদীদের পারস্পরিক মতপার্থক্য প্রকট। নিষ্প্রাণ বস্তুতে জীবনের সঞ্চার হওয়ার কোন সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। এ পর্যায়ে তাঁদের দাবিটাই হচ্ছে এ দাবির সমর্থনে তাঁদের একমাত্র যুক্তি। অথবা আন্দাজ-অনুমানমূলক কথাবার্তা ছাড়া তাঁদের বলবার মত আর কোন কথাই নেই।

কেউ কেউ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'বস্তুতেই পারস্পরিক সংমিশ্রণ ও সংঘর্ষের ফলে প্রাণ বা জীবনের সঞ্চার হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে। কিন্তু এটা তো কোন ব্যাখ্যাই হল না। এ যেন একটা অনুভবযোগ্য ঘটনা দ্বারা আর একটা অনুভবযোগ্য ঘটনার ব্যাখ্যা দান।

লর্ড কিনলে বলেছেন, জীবনের 'অণু' এই বিশ্বলোকের মহাশূন্যে বিক্ষিপ্ত তেজক্রিয়া রূপে প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু এ কথার ওপর প্রশ্ন জাগে, এসব জীবাণুর সেই মহাশূন্য থেকে ভূ-লোকের দিকে চলে আসার ও বাস্তব জীবনের সঞ্চার হওয়ার আসল কারণটা কি ছিল? এ বস্তুতে তো মূলত জীবন বা প্রাণের চিহ্নমাত্র ছিল না।

মোট কথা, জীবন সঞ্চারিত হওয়ার ক্ষেত্রে দুটি মতের একটি গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নেই। হয় বলতে হবে স্বয়ং 'বস্তু'র মধ্যেই এর যোগ্যতা বর্তমান ছিল, ফলে কোন 'ইচ্ছাশক্তি' বা স্রষ্টার মেনে নেয়ার প্রয়োজন নেই অথবা বলতে হবে, জীবন সঞ্চারণ এক ইচ্ছাধিকার স্রষ্টারই অবদান; তিনি স্ব-ইচ্ছা ও স্ব-ক্ষমতায়ই সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী।

www.nagorikpathagar.org

এই বস্তুলোক যদি নিতান্ত বস্তুসর্বস্বই হয়ে থাকে, 'বস্তু' ছাড়া আর কিছুই যদি এখানে না থেকে থাকে, তাহলে বলতে হবে, এই 'বস্তু'ই চিরন্তন ও শাশ্বত। তার কোন শুরুও নেই, শেষও নেই। চিরকাল থেকেই তা আছে এবং চিরকালই তা থাকবে স্বীয় পূর্ণাঙ্গ বিশেষত্ব ও যাবতীয় শক্তির অধিকারী হয়ে। বস্তু মহাশূন্যে থাক বা পৃথিবীতে কিংবা অন্য কোথাও, সে-শক্তি ও বিশেষত্বসমূহ বস্তু থেকে কখনই বিচ্ছিন্ন হবে না।

একথা মেনে নিলে একটি কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। অসংখ্য গ্রহের মধ্যে কোন কোন গ্রহে জীবন আছে, কোন কোন গ্রহে নেই। কালস্রোতের বিভিন্ন পর্যায়ে ও অংশে জীবন ছিল, কোন কোন অংশে ছিল না। এ তো সর্বজনমান্য সত্য। তাহলে প্রশ্ন জাগে, বস্তুর অভ্যন্তরে যখন স্বতঃই জীবনের সম্ভাবনা ও যোগ্যতা ছিল, তখন কোটি কোটি বৎসর পর্যন্ত তা কেন কার্যকর হল না? কেন জীবনের সঞ্চার করল না? পরে মাত্র কয়েক হাজার বছরের সীমাবদ্ধ কালের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট সময়ে জীবনের প্রকাশ ঘটল,—এরূপ হল কেন? কেন সেই নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে জীবনের লক্ষণ দেখা গেল না?—এ ধারাবাহিক চিরন্তন ব্যবস্থায় এই নির্দিষ্ট সময়ের সাথে এর বিশেষ সম্পর্ক কি ছিল? সামঞ্জস্য-ই বা কি?

—এর কোন জবাব বিজ্ঞানীরা দিতে পারেন না। পারেন না শুধু এই কারণে যে, বিশ্বলোকের কোন ইচ্ছা-সম্পন্ন স্রষ্টার অস্তিত্ব তারা স্বীকার করেন না। তা স্বীকার করলেই এর জবাব দেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ও সহজ হত।

'বস্তু' বা জড়ে চিরকাল থেকে কতিপয় বিশেষত্ব অবিচ্ছেদ্যভাবে বর্তমান ছিল। কিন্তু তার কার্যকারিতা সেই অনন্তকাল বা চিরকাল থেকে কেন হয় নি, এই সংমিশ্রণজনিত বিশেষত্ব কালের মুখাপেক্ষী বা তার ওপর নির্ভরশীল হল কেন? —একটা বিশেষ সময়ের পূর্বে তা কেন কোন জীবের উৎপাদন করল না? অথচ এই কাল ও সময়ও প্রকৃতিরই ফসল। সে বিশেষত্বসমূহ যখন থেকে আছে, বস্তুর প্রকৃতি তার জন্যে অনিবার্য। এই সংমিশ্রণ কেন নির্দিষ্ট সময়ের ওপর নির্ভরশীল থাকল? আর 'জড়'ভিন্ন কোন অংশে মহাশূন্যের কোন সীমাবদ্ধ স্থানে ছাড়া অন্যত্র এই সংমিশ্রণজনিত ফল কেন আত্মপ্রকাশ করল না? —এর জবাব সেই একটিই। আর তা হল মহাশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা। এ হচ্ছে বৈজ্ঞানিক বিবেকের অকপট স্বীকৃতি।

www.nagorikpathagar.org

বিবর্তনবাদের অসারতা

আল্লাহর অস্তিত্ব ভিত্তিহীন ও অবৈজ্ঞানিক প্রমাণ করার কুমতলবে ডারউইনের এই বিবর্তনমূলক দার্শনিক চিন্তাকে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু কার্যত তা সম্ভবপর হয় নি। শুধু তা-ই নয়, তার দরুন যে সব বৈজ্ঞানিক সমস্যা প্রচণ্ড হয়ে দেখা দিয়েছে তার কোন সমাধান উপস্থাপিত করা অসম্ভব-ই হয়ে রয়েছে। এসব বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা ছিল স্বাভাবিক, একান্তই অনিবার্য। প্রকৃত সত্যকে ঢাকবার উদ্দেশ্যে যত তত্ত্বই উপস্থাপিত হোক, তা যে মূলতই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন হবে, তাতে কোনই সন্দেহ থাকতে পারে না। যুক্তির কষ্টিপাথরে সে 'তত্ত্ব'সমূহের যাচাই করা হলেই মিথ্যার অমানিশা নিঃশেষে বিদূরিত হয়ে যাবে এবং তার ফলে সংঘটিত হবে নবীন সূর্যের নতুন অভ্যুদয়। নিতান্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ পর্যায়ের আলোচনা পেশ করা যাচ্ছে। এ পর্যায়ের সর্বাধিক জটিল প্রশ্ন হল, সবকিছুই যদি 'বস্তু'র স্বতঃক্রমবিকশিত রূপ হয়ে থাকে, তাহলে এ বিশ্বলোকে জীবনসত্তার উদ্ভব কী করে সম্ভবপর হল? 'বস্তু'তে তো জীবনের একবিন্দু অস্তিত্ব নেই?

নির্জীব 'বস্তু' থেকে 'জীবনে'র উদগম হওয়া কি সম্ভব?

ক্রমবিকাশ সংক্রান্ত মতাদর্শ বিশ্ববাসীরা জোর গলায় বলে বেড়ায়, নির্জীব-নিষ্প্রাণ বস্তু (inanimate matter) থেকেই পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রথম জীবনের উদগম হয়েছে। পৃথিবীর সমস্ত বস্তুই মৌল রাসায়নিক উপাদানে গঠিত। সাধারণ ও নগণ্য রাসায়নিক উপায়ে তা বিশ্লেষিত বা বিগলিত এবং মূল পদার্থে পরিণত করা অথবা সহজিকরণ করা সম্ভব নয়।

কিন্তু পৃথিবীর বুকে অবস্থিত মৌলিক পদার্থসমূহে ক্রমবিকাশবাদের কোন প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় কি?.... না, তা আদৌ লক্ষ্য করা যায় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, Atoms বা 'অণু' পরমাণু সাধারণত স্থিতিশীল (Stable)। কোন ক্ষেত্রে তা অবক্ষয়মান হলেও সে অবস্থা স্থায়ী থাকে মাত্র ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ তা কোন স্থিতিশীল উপাদানে পরিণত হয়। যখনই তা হয়ে যায়, তখন আর তা অবক্ষয়মান থাকে না।

এ তত্ত্ব 'entropy' নামে পরিচিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সঙ্গে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। এর অনিবার্য অর্থ হল, উচ্চতর মানে সুসংবদ্ধ নিম্নগামিতার (Downward)

www.nagorikpathagar.org

অপেক্ষাকৃত কম সুসংবদ্ধতার দিকে একটা প্রবণতা রয়েছে। কোন বহিঃশক্তি ছাড়া এতে কোন 'বৃদ্ধি' সাধিত হওয়া সম্ভব নয়। একটু ব্যাখ্যা করে বলা যায়, পৃথিবীর মৌল উপাদানসমূহ নিজেরাই সক্রিয় হয়ে কোন স্বয়ং চালিত যান উৎপাদন করতে পারে না।... পারে না একটি সাধারণ ও সহজ যন্ত্রপাতি (gear) নির্মাণ করতে। পক্ষান্তরে, মৌল উপাদানসমূহ যেমন আছে, তেমনই পড়ে থাকে। সেগুলো যখন কোন মানুষ কর্তৃক একটি যন্ত্রে সজ্জিত হয়, কেবল তখনি তা কোন রূপ পরিগ্রহ করতে সক্ষম হয়। আর যন্ত্রটার অবস্থা হল, মানুষ সেটা যখন অকেজো করে ফেলে রাখে, তখনই তা ক্ষয় হতে শুরু করে।

আর একটি দৃষ্টান্ত দেয়া যাক। একটি বড় পিঁপার মধ্যে লৌহ, কাচ, রবার ও মোটরযান নির্মাণের প্রয়োজনীয় অন্যান্য যাবতীয় সামগ্রী ও যন্ত্রাংশ রেখে দিয়ে তার মুখ বন্ধ করে দেয়া হোক এবং পিঁপাটি হাজার বার ঘোরানো হোক। তারপর যখন তার মুখ খোলা হবে তখন সে সব সামগ্রী ও যন্ত্রাংশ মিলে স্বতঃই একটি সম্পূর্ণ মোটরবাস তৈরী হয়ে গেছে—এমনটা দেখা যাবে কি?

সে সামগ্রীগুলো কোন সংমিশ্রিত রূপও কি কখনো গড়ে উঠবে? না, তা কখনো-ই হবে না। এ পরীক্ষা যতবারই করা হোক না কেন, পরিণামে একই রকম ব্যর্থতারই সম্মুখীন হতে হবে। আর এ তথ্য থেকেই আমরা একটা মৌলিক সত্যের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি। তা হলঃ নির্জীব-নিষ্প্রাণ বস্তু পৃথিবীতে নিজেকে উন্নত করার কোন মহত্তম পন্থাও নিজে উদ্ভাবন করতে পারে না। বরং অকর্মণ্য করা বা স্থিতিশীল করার দিকেই তার ঝোঁক দেখা যাবে। সময়ের একটি বিরাট বিশাল মেয়াদের দাবি-ও এক্ষেত্রে কোন সাহায্যই করতে পারে না। বস্তুত সময় তো অবক্ষয় সৃষ্টি করে, অসংহতি বৃদ্ধি করে। তার ফলে লৌহ পদার্থ ক্রমশঃ ক্ষয় লাভ করে। কালস্রোত বিরাট পাহাড়কেও ভেতর থেকে কুরে কুরে খেয়ে ফেলে। সময় তো ধ্বংসসাধক—সংগঠক নয়। নির্জীব-নিষ্প্রাণ বস্তুর পক্ষে কালস্রোত ক্রমবিকাশের পরম শত্রু।

জড়ত্বের মৌল নিয়মও এ তত্ত্বকে সত্য প্রমাণ করে। সব জিনিসেরই মৌল ভাবধারা ও প্রেরণা হল জড়ত্ব। জিনিস যদি স্থিতিশীল হয় তাহলে তাকে স্থিতিশীলই রাখে। আর তা যদি গতিশীল হয়, তাহলে তা একই লক্ষ্যপানে চলতে থাকবে—যদি না বাইরের কোন শক্তি তাতে হস্তক্ষেপ করে। একটি ফুটবল নিজেই চালিত হতে পারে না এবং এক খেলোয়াড়ের কাছ থেকে আর এক খেলোয়াড়ের নিকটও তা নিজেই নিক্ষিপ্ত হতে পারে না। রেলগাড়ির একটি ওয়াগন চলতে পারে না, যদি অধিক শক্তিসম্পন্ন ইঞ্জিন সেটাকে টেনে না নেয়। নিষ্প্রাণ-নির্জীব পদার্থ নিজেই গতিশক্তি লাভ ও জীবন শুরু করতে পারে না, কোন উচ্চতর বহিঃশক্তি যতক্ষণ না সেজন্যে কাজ করবে। নিষ্প্রাণ-নির্জীব পদার্থ চিরকালই তেমন থাকবে। সেই বহিঃশক্তিই তাকে সুসংগঠিত ও সুসংবদ্ধ করতে পারে, পারে পথনির্দেশ করতে ও চালাতে।

www.nagorikpathagar.org

R. Schuleer লিখিত বই Mechanism and Vitalism-এর সমালোচনা লিখতে গিয়ে ১৯৬২ সনের মে সংখ্যা Discovery পত্রিকা বলেছেঃ

'All molecules result from an electro-chemical tendency to neutralisation. They are therefore expressions of tendencies toward stability; Unhappily for materialists, however, life is characteristically unstable, and it is incredible that a complex of substances, all tending towards a state of stability, would produce the permanent chemical instability which is characteristic of animate matter. Thus it is inconceivable that an organic compound should ever be formed in the absence of life: No condition of inorganic matter is even thinkable in which carbon, oxygen and hydrogen could combine to form a sugar rather than water carbondioxide:

সমস্ত অণু (পদার্থের যে ক্ষুদ্রতম অংশ রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য না হারিয়ে পৃথকভাবে বর্তমান থাকতে পারে) একটি বিদ্যুৎ-রাসায়নিক প্রবণতার ফসল মাত্র। এ কারণে এগুলো স্থায়িত্বের দিকের প্রবণতার প্রকাশ মাত্র। এটা বস্তুবাদীর জন্য অ-সুখকর। জীবন চারিত্র্যগতভাবে অস্থায়ী। এবং এটা বিস্ময়কর ও অবিশ্বাস্য যে, একটি সারনির্যাসের জটিল জট—যাদের সবার ঝোঁক হচ্ছে স্থায়ী অবস্থার দিকে—তা স্থায়ী পরিবর্তনশীলতার উৎপাদন করবে, যা জীবন্ত বস্তুর বৈশিষ্ট্য—। এ কারণে এটা ধারণাতীত যে, একটি জৈবযৌগিক জীবনের অনুপস্থিতি কালে কখনই গড়ে উঠতে পারে। কার্বন, অম্লজান ও উদজান একত্রিত হয়ে পানি ও অঙ্গারাম্লজান বানাতে পারে এমন কোন অজৈব বস্তু কল্পনাও করা যায় না।

এ থেকে জানা গেল যে, পৃথিবীতে মৌল উপাদানের কোন প্রকাশ নিচু থেকে ওপরের দিকে—মোহনা থেকে উৎসাভিমুখে হয় না। তা হয় অধিকতর জটিল মৌল উপাদানের কিংবা আঙ্গিক যৌক্তিকতায়। কিন্তু ক্রমবিকাশ বাস্তবায়িত হওয়ার জন্যে নির্জীব-নিষ্প্রাণ মৌল উপাদানকে অবশ্যই বিকাশ লাভ করতে হবে। কিন্তু তা ঠিক অন্য মৌল উপাদানে কিংবা জৈবিক যৌক্তিকতায়—যা আরো অনেক বেশী জটিল জিনিসে প্রকাশ পায়। এগুলো এক জীবন্ত কোষে বিকশিত হয়ে থাকবে।

জীবন্ত কোষ

নিষ্প্রাণ–নির্জীব পৃথিবীর মৌল উপাদান ও একটি জীবন্ত কোষের মাঝে বিরাট দূরত্ব বিরাজমান। অতি উত্তম ল্যাবরেটরীতেও নিষ্প্রাণ-নির্জীব মৌল পদার্থ থেকে

www.nagorikpathagar.org

একটি জীবন্ত কোষ সৃষ্টি করা সম্ভবপর নয়। তা যদি সম্ভবপর হত, তাহলে তা-ও প্রমাণ করত যে, জীবনসার উৎপাদনের জন্যে একটি পরিচালক শক্তির (Directing force) একান্তই প্রয়োজন।

সামান্য একটি কোষকেও খুব সহজ মনে করা কিন্তু উচিত নয়। মনে করা উচিত নয় যে, নিষ্প্রাণ-নির্জীব বস্তু থেকে তা গড়ে ওঠা কিছু মাত্র দুষ্কর ও দুঃসাধ্য নয়। ১৯৬২ সনের জানুয়ারী সংখ্যা Look পত্রিকা ঘোষণা করেছেঃ

"The cell is complicated as New York city" 'নিউ ইয়র্ক শহর যতটা জটিল, একটি জীব-কোষও ততটা জটিল।' অধিক যত্ন নিয়ে একটি একক কোষ অধ্যয়ন করলে তা যে কতটা জটিল, তা অনুধাবন করা সম্ভব হবে। জার্মান জীববিজ্ঞানী Vor Bertalanffy এর মন্তব্য ক্রমবিকাশবাদী L. Eiseley তার 'The Immense Journey নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেনঃ

To grasp in detail the physico-chemical organization of the simplest cell is far beyond our capacity

সরলতম কোষের পদার্থ রাসায়নিক সংগঠনের বিস্তারিত বিবরণ ধারণ করা আমাদের ক্ষমতার অনেক উর্ধ্বে।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যার অধ্যাপক Sir Tames Gray লিখেছেনঃ Science Today নামক পত্রিকায়

A bacterium is far more complex that any inanimate system known to man. There is not a laboratory in the world which can compete with the biochemical activity of the smallest living organism.

মানুষের জ্ঞাত কোন প্রাণহীন ব্যবস্থার তুলনায় বিভিন্ন অণুবীক্ষণী জীবাণু অনেক অনেক গুণ বেশী জটিল। পৃথিবীতে এমন কোন গবেষণাগার নেই যা একটি ক্ষুদ্রতম জীবন্ত দেহসত্তার জৈব রাসায়নিক তৎপরতার সাথে কিছু মাত্র প্রতিযোগিতা করতে পারে।

The Ideas of Biology গ্রন্থে ক্রমবিকাশবাদী J. T. Bonner লিখেছেনঃ

জীবকোষ বাস্তবিক-ই এমন বিস্ময় উদ্রেককারী চালাক একক যে, আমরা যখন তা ক্রমবিকাশবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করি, তখন একটি একক কোষ জটিল জীবে ও উদ্ভিদে রূপান্তরিত হচ্ছে একথা চিন্তা করা এরূপ চিন্তা থেকে সহজতর মনে হয় যে, রাসায়নিক সারের একটা পুঞ্জ একটি কোষে রূপান্তরিত হচ্ছে। তাহলে প্রথম পদক্ষেপ যে অধিকতর কঠিন ছিল। তা তো সহজেই অনুমেয়। ...প্রাথমিক পর্যায়ের বিবর্তন বাস্তবিকই শিক্ষিত লোকদের নিছক অনুমানপ্রসূত বই আর কিছু নয়।

www.nagorikpathagar.org

১৯৬৬ সনের ১৩ই নভেম্বর প্রকাশিত New York Times পত্রিকার বিজ্ঞান বিভাগে একটি উদ্ভিদ-কোষ সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

The largest single manufacturing process in the world takes place in one of the smallest units of life-cells of green plants.

The manufacturing process is ..... photosynthesis each year this process accounts for "the" transformation of 100 billion tons of the inorganic element carbon into organic forms that support life.

By contrast, all the big blast furnacess of the world make only a half billion tons of steel in the same time.

একটি সবুজ গুল্মের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জৈবকোষ এককের মধ্যে পৃথিবীর একক দ্রব্য প্রস্তুতকরণ পদ্ধতি স্থান গ্রহণ করে।

দ্রব্য প্রস্তুতকরণ পদ্ধতিটি হচ্ছে প্রত্যেকটি বছরের ফটো সংশ্লেষণ। একশ বিলিয়ন টন অজৈব উপাদান কার্বনকে জৈব আকারে রূপান্তরিত করার জন্যে প্রতি বছর এই পদ্ধতি দায়ী যা জীবনকে সমৃদ্ধ করে।

এর বিপরীত পৃথিবীর বড় বড় অগ্নিকুণ্ডের বিস্ফোরণ করে অর্ধ বিলিয়ন টন ইস্পাত—সেই একই সময়ে।

এসব কোষের জটিলতা ও উৎপাদনশীলতা ক্রমবিকাশবাদকে কোনই সমর্থন দেয় না। যেহেতু প্রবল বাত্যা ও প্রবল অগ্নিকুণ্ডলির জটিলতা ও উৎপাদনশীলতা এমন ঘটনা, যা দেখে আমরা এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি যে, এক অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন মন কর্তৃকই তা পরিকল্পিত ও বাস্তবায়িত হয়েছে। তাহলে একটি কোষ সম্পর্কিত তথ্যাবলী দেখে অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কি আমাদের উচিত নয়?

একটি কোষ যে কতটা জটিল তা স্নায়ু (Neuron) বা স্নায়ুকোষ থেকে নির্ভেজালভাবে প্রমাণিত হয়। বলা হয়েছে, এক ব্যক্তির মগজে অন্তত ১০,০০০,০০০,০০০টি এ ধরনের কোষের সমাবেশ রয়েছে। প্রতিটি স্নায়ু প্রতি মুহূর্তে Relay কিংবা টেলিফোন সুইচ বোর্ডের মতই কাজ করে। পরবর্তী অনুসন্ধানে জানা গেছে, একটি জটিল বিদ্যুৎচালিত কম্পিউটার অপেক্ষাও অধিক জটিল হচ্ছে একটি Neuron বা স্নায়ু। বিজ্ঞানীরা যদি এক ইঞ্চি দীর্ঘ মাত্র এক হাজারতম অশেষ জটিলতা সম্পন্ন স্বচালিত ও স্বয়ংপ্রোগ্রামগ্রহণকারী কম্পিউটার আবিষ্কার করতে সক্ষম হতেন, তাহলে তা কি একটি বিরাট সাফল্য বলে গণ্য হত না? তাহলে তখন কি কেউ এ দাবি করতে পারত যে, এই কম্পিউটারটি নিজেই অস্তিত্ব লাভ করেছে? কেউ বলতে পারত যে, নিষ্প্রাণ-নির্জীব বস্তু থেকে আপনা

www.nagorikpathagar.org

আপনিই—কোন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন মনের কোনরূপ পথনির্দেশ ছাড়াই এটির অস্তিত্ব গড়ে উঠেছে?

একটি কোষের তুলনা যদি করা হয় একটি বইয়ের সাথে, তাহলে বাস্তব সত্য প্রমাণ করে দেবে যে, একটি বই একটি কোষের তুলনায় অনেক—অনেক কম জটিল। একটি বই তৈরী করা অনেক অনেক সহজ। এই সহজতর কাজটি, অর্থাৎ একটি বই তৈরী করতেও প্রয়োজন একজন প্রতিভাধর ও ধীশক্তিসম্পন্ন গ্রন্থকার ও একজন মুদ্রাকরের। সে বইটিও তো নিজে নিজেই তৈরী হতে পারে না। Webster-এর অসংক্ষিপ্ত (Un-abridged) ডিকশনারী তৈরী করতেও ৭৫৭টি সম্পাদক-বর্ষের প্রয়োজন হয়েছিল। একাজে টাইপিস্টের, ফটো গ্রাফারের, কেরানী-সাহায্যকারীদের লাগানো সময় এ হিসেবে ধরা হয় নি। দু'শরও বেশী পরামর্শ দানকারী লোকের ব্যয় করা সময়ও এ হিসেবের বাইরে। ছাপা ও কারখানার জিনিসপত্র জোগাড়কারীদের লাগানো সময়ের তো কোন হিসেবই নেই। এখন কেউ বলতে পারে না যে, এ বইটি কেবলমাত্র কালি-অণুসমূহের পারস্পরিক সংযোজনের ফলে ঘটনাক্রমে অস্তিত্ব লাভ করতে পেরেছে। এর জন্যে তো অত্যন্ত প্রতিভাসম্পন্ন লোকদের পরামর্শদানের প্রয়োজন অনিবার্য হয়েছিল। এর তুলনায় একটি কোষের জটিলতা তো অবর্ণনীয়। তাহলে এতদ্‌সংক্রান্ত তথ্যসমূহের ভিত্তিতে কি কোষসৃষ্টি পর্যায়ে অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত নয়? এ অকাট্য যুক্তি চিন্তা করেই প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক Edwin Conklin একদা বলেছিলেনঃ

> The probability of life originating from accident is comparable to the probability of the unbridged dictionary resulting from an explosion in a Printing shop. (Reader's Digest, January. 1963. P-92)
>
> দুর্ঘটনার ফলে জীবন সূচিত হওয়া একটি ছাপাখানায় বিস্ফোরণের ফলে একটি অ-সংক্ষিপ্ত বিরাট অভিধান রচিত ও তৈরী হওয়ার সঙ্গে সমতুল্য।

প্রখ্যাত ক্রমবিকাশবাদী ও নৃতত্ত্ববিদ্ Loren Eiseley তাঁর বই The Immense Journey-তে যা বলেছেন তা এখানে অবশ্য স্মরণীয়। তাঁর কথা হলঃ

> Intensified effort revealed that even the supposedly simple amoeba was a complex, self-operating chemical factory. The notion that he was a simple blob. The discovery of whose chemical composition would enable us instantly to set the life process in operation, turned out to be, at best, a monstrous caricature of the truth.

www.nagorikpathagar.org

With the failur of these many efforts science was left in the somewhat embarrassing position of having to postulate theories of living origins which it could not demonstrate. After having chided the theologian for his reliance on myth and miracle, science found itself in the unenviable position of having to create a mythology of its won: namely, the assumption that what, after long effort, could not be proved to take place today had, in truth, taken place in the primeval past. (p-199)

ব্যাপক-তীব্র চেষ্টা প্রচেষ্টা নিয়োজিত করে এমনটি মনে করে নেয়া হয়েছে যে, সরল এ্যমীবা ছিল জটিল স্ব-চালিত রাসায়নিক কারখানা, মনোভাব বা ধারণা হচ্ছে, তা ছিল সরল দ্রব্য, কার রাসায়নিক সংমিশ্রণ আবিষ্কার জীবন পদ্ধতিকে কার্যোস্থিত করতে আমাদেরকে দ্রুত সক্ষম করতে পারে তা বড় জোর সত্যের একটা বিরাটাকৃতির ব্যাঙ্গাত্মক বর্ণনায় পরিণত হল।

এসব চেষ্টা-প্রচেষ্টার ব্যর্থতা সহকারে বিজ্ঞান অনেকটা হতবুদ্ধিকর অবস্থায় পড়ে গেল মৌলজীবন্ত মতাদর্শের স্বতঃসিদ্ধ হওয়ার দিক দিয়ে—যা সে দেখাতে পারে নি—ভর্ৎসিত হওয়ার পর ধর্মতাত্ত্বিক দুর্জ্ঞেয়ত্ব ও অলৌকিকত্বে বিশ্বাসী হওয়ার কারণে। বিজ্ঞান নিজেকে অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয় অবস্থায় দেখতে পেল সে নিজের একটা পৌরাণিক কাহিনী বানাবার কারণে। যেমন অতীতে যা সত্য ছিল বর্তমানে তা প্রমাণ করতে অক্ষম থাকল।

মতবাদ রচনার ক্ষেত্রে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতা চলছে বটে; কিন্তু পৃথিবীর নিষ্প্রাণ-নির্জীব বস্তু ও মৌল উপাদানসমূহ উপরের দিকে গিয়ে নিজেই নিজেকে জীবন্ত দেহসত্তায় রূপান্তরিত করতে পারে না, এ সত্যকে মিথ্যা প্রমাণ করা কারও পক্ষে সম্ভবপর হয় নি। তা প্রমাণ করার মত যুক্তি আজ পর্যন্ত কেউ উপস্থাপিত করতে পারে নি। ডক্টর Eiseley একথা সমর্থন করে বলেছেনঃ

One does occasionally observe, however, a tendency for the beginning zoological text book to take the unwary reader by a hop, skip and jump from the little steaming pond or the beneficent chemical crucible of the sea, into the lower world of life with such sureness and rapidity that it is easy to assume that there is no mystery about this matter at all or, if there is, that is a very little one.

কখনও কখনও প্রাণিবিদ্যা সংক্রান্ত পাঠ্য বইতে এমন একটি প্রবণতা লক্ষ্য করে থাকবে যে, অমনোযোগী পাঠক ক্ষুদ্র বাষ্প উদ্গীরণকারী পুকুর কিংবা

www.nagorikpathagar.org

সমুদ্রের উপকারী রাসায়নিক ধাতু উদ্‌গীরণ জীবনের নিম্ন পর্যায়ে নিয়ে যায়, অনুরূপ নিশ্চয়তা ও দ্রুততার সঙ্গে এ বস্তু সম্পর্কে যে, এটা খুবই ছোট্ট একটি।

এরূপ আচরণের তীব্র সমালোচনা করেছেন প্রখ্যাত বৃটিশ জীববিজ্ঞানী Woodger। তিনি কয়েক বছর পূর্বে বলেছিলেনঃ

Unstable organic compounds and chlorophyll corpuscles do not persist or come into existence in nature on their own account at the present day, and consequently it is necessary to postulate that conditions ware once such that this did happen although and inspite of the fact that our knowledge of nature does not give us any warrant for making such a supposition—it is simple dogmatism—asserting that what you want to believe did in fact happen.

অস্থায়ী জৈব যৌগিক এবং পত্রহরিৎ মেরুদণ্ডী প্রাণীর রক্ত কনিকা দৃঢ়ভাবে চলতে পারে না কিংবা প্রকৃতিতে বর্তমান সময়ে অস্তিত্ব লাভ করতে পারে নি তাদের নিজেদের চেষ্টায়। পরিণামে স্বতঃসিদ্ধ হওয়ার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে ওরূপ অবস্থা অন্তত কোন এক সময়ে ঘটে যাওয়া। প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান যদিও আমাদেরকে এরূপ-কিন্তু ধরে নেয়ার জন্য তাকীদ করে না যে, এটা একটা যুক্তিহীন দৃঢ় মত। তুমি যা বিশ্বাস কর তা কার্যত হয়েই থাকবে।

জীবন্ত কোষ সম্পর্কে ক্রমবিকাশবাদী রাদারফোর্ড প্লট (Ruther Ford Platt) The River of Life নামক বইতে লিখেছেনঃ

So perfect is the original one-cell form of life, and so potent both for body building, for activating nerves and muscles and for procreation, that the cell has never altered its basic size or nature from the beginning of life even to this day. (P. 100)

মৌলিক এককোষ বিশিষ্ট জীবনই পূর্ণাঙ্গ দেহ গঠন, স্নায়ুমণ্ডলি ও মাংসপেশী সক্রিয়করণ উভয় দিক দিয়েই ক্ষমতা সম্পন্ন এবং উৎপাদন প্রজননের দিক দিয়েও এসব প্রমাণ করে যে, কোষ তার আসল আকার বা প্রকৃতি জীবনের সূচনাকাল থেকে বর্তমান দিন পর্যন্ত বিন্দুমাত্রও বদলায় নি।

কিন্তু কেন করে নি? তা যদি সত্যিই ক্রমবিকাশের ফসল বা ফল হতো, তাহলে এর উন্নয়ন সাধনের বিবর্তন কেন অব্যাহত হয়ে থাকল না? এই অসীম জটিলতা সম্পন্ন যন্ত্রটি যে শুরু থেকেই সর্বদিক দিয়ে সম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ ছিল, এটাও কি একটি দুর্ঘটনা? মানবনির্মিত কোন যন্ত্রের অংশ কি উন্নয়ন ও পূর্ণত্ব লাভের

www.nagorikpathagar.org

দীর্ঘ বছরগুলি অতিক্রম না করেই অস্তিত্ব লাভ করেছে?—মানুষ আজ পর্যন্ত এমন কোন যন্ত্র দেখতে পারে নি, যার উন্নয়নের প্রয়োজন দেখা দেয় নি কখনো। বর্তমান বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাশালী যন্ত্রনির্মাতারাও নয়। একটি কোষ-ও তো একটা যন্ত্রের মতই। মানুষের অতুলনীয় প্রতিভা ও মেধা যা করতে পারে নি, নিষ্প্রাণ-নির্জীব ও মেধা প্রতিভাহীন মৌল উপাদান তা-ই করে দিল-কোন যুক্তি ছাড়া এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কী করে বিজ্ঞানসম্মত হতে পারে?

জীবন এল কোত্থেকে?

প্রাচীন কালের স্বতঃস্ফূর্ত বংশানুক্রমিকতা সংক্রান্ত মতাদর্শের সঠিক পরিশীলিত ও পরিচ্ছন্ন অনুবাদ বা ভাবান্তর হল, জীবনহীন বস্তু থেকে জীবন্ত কোষের ক্রমবিকাশ হওয়ার মতবাদ। এ মতবাদ ক্রমে ক্রমে ও ধীরে ধীরে অসমর্থিত ও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে—প্রকৃত সত্যভিত্তিক ও বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ এবং তথ্যাদির কারণে।

এ সম্পর্কে Review Text it Biology গ্রন্থে ব্যক্ত অভিমত হলঃ 'ফ্রান্সিস্‌কো রেডী (Francesco Redi) নামক ইটালীয় চিকিৎসাবিদ্‌ই প্রথম ব্যক্তি, যাঁর সীমিত পরীক্ষা কার্য (১৬৮৮ খৃস্টাব্দে) এ বিশ্বাসকে অপ্রমাণিত করেছে যে, কোন কোন কীট-পতঙ্গের (maggots) শূক ক্ষয়শীল মাছ, সাপ ও মাংস থেকে তৈরী হয়েছে। ....রেডী প্রমাণ করেছেন যে, কীট-পতঙ্গের শূক এবং ফড়িং জাতীয় জীব জীবন্ত বাপ-মা থেকেই বের হয়ে এসেছে, নিষ্প্রাণ বা মৃত বস্তু থেকে নয়।

লাজ্বারো স্পালানজানী (Lazzaro Spallanzani) নামক এক ইটালীয় পাদ্রী প্রায় ১৭৮০ খৃস্টাব্দে অনেকগুলো সব্‌জী বা তরি-তরকারি ও ফলমূল প্রভৃতি উদ্ভিদের দেহজাত রস (juice) গ্লাস-ফ্লাস্কে মুখ বন্ধ করে রাখেন এবং পরে তা আগুনের তাপে উত্তপ্ত করেন। এগুলোকে ঠাণ্ডা হতে দিয়ে কিছু দিন অতিবাহিত করার পর-ও স্পালানজানী তাতে কোন রূপ জৈব দেহই তেরী হতে দেখতে পেলেন না। এমন কি সূক্ষ্ম আণূবীক্ষণিক পরীক্ষা চালানোর পরও তেমন কিছুই আবিষ্কার করতে পারলেন না। এ থেকে স্পালানজানী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, সে রসের মধ্যে কিছুই গড়ে উঠতে পারে নি। কেননা তাতে কিছু থেকে থাকলেও অগ্ন্যত্তাপ তাকে হত্যা করেছে। ফলে প্রমাণিত হল যে, নতুন কোন জীবদেহ উৎপাদন করতে পারে এমন কোন জীবন্ত দেহ সংগঠন (Organism) তাতে বর্তমান ছিল না।

লুই পাস্তুর (Lauis Pastur) নামক ফরাসী বিজ্ঞান (১৮৬০ সনে) সিদ্ধান্তমূলকভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, সূক্ষ্ম জীবাণু (Micro-organism)—যা যত্রতত্র বর্তমান জৈব বস্তুতে প্রবেশ করে সেগুলোর খাদ্য-প্রয়োজন পূরণ

www.nagorikpathagar.org

করে, খাদ্যগ্রহণ ও ক্রমবর্ধন লাভ করে সূক্ষ্ম জীবাণু পুনরুৎপাদন করে এবং এভাবে তাদেরই মত আরো বহু জীবাণু গড়ে তোলে—খাদ্য বস্তু ভর্তি ফ্লাস্কের মুখ যদি বন্ধ করে রাখা হয় এবং নির্জীব বা প্রজনন ক্ষমতা রহিত করে (Sterilized) দেয়া হয়·····তা হলে এমনকি অনেকগুলো মাস পরেও তাতে কোন জীবাণু জেগে উঠতে দেখা যাবে না। (pp-252-253)

বস্তুত জীবনের মূল—তা যতই সহজ হোক না কেন বাস্তবিকই জীবযোনি (কেবল জীব থেকেই জীবজন্ম সম্ভব এই বৈজ্ঞানিক) পদ্ধতির উপরই ভিত্তিশীল। এ পদ্ধতি সম্পর্কে Encyclopaedia Americana বলছেঃ

From the Greek words bios, life, and genesis, birth, source, creation, is the biological term for the doctrine that living organisms are produced only by other living organisms,.....biclogists are now not only in virtually unanimous agreement that all life derives from preceding life, but that the parent organism and its offspring are of the same kind. (1956, vol 3. p 721)

গ্রীক শব্দ বাইঅস, লাইফ এবং জেনেসিস্—জন্ম, উদ্ভব, সৃষ্টি—প্রভৃতি জীববিজ্ঞান সংক্রান্ত পরিভাষা। এগুলো এই বিশ্বাস ব্যক্ত করে যে, জীব-দেহ কেবলমাত্র অপর জীবদেহ থেকেই উৎপাদিত হয়। .....বর্তমানে জীববিজ্ঞানীরা নীতিগত ও মোটামুটিভাবে এ ব্যাপারে পরিপূর্ণ ঐকমত্যে পৌছেছেন যে, সমস্ত জীবন পূর্ববর্তী জীবন থেকেই উদ্ভুত; শুধু তা-ই নয় বরং এ ব্যাপারেও সম্পূর্ণ একমত যে, পিতা-মাতার দেহসংস্থা এবং তাদের বাচ্চা-কাচ্চা এরা দুইই একই প্রকারের ও অভিন্ন প্রজাতির।

বস্তুত এটাই হল সত্যিকার বিজ্ঞানসম্মত মত এবং বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যশীল। তা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, নিষ্প্রাণ-নির্জীব বস্তু নিজস্বভাবে কোন প্রকারেরই জীবন গড়ে তুলতে সম্মত হয়েছে এমনটি কখনই দেখা যায় নি। যেখানে মূলতই জীবন উপস্থিত, কেবলমাত্র সেখানেই নতুন জীবনের উদ্ভব হওয়ার কথা বিশ্বাস করা যেতে পারে। B. B. Vance এবং D. F. Miller তাঁদের (১৯৬৪ সনের) Biology for You গ্রন্থে বলেছেনঃ

All of the forms of plants and animals that we have studied in biology produce their young from their own bodies and in no other way. (p. 468)

জীব-বিজ্ঞানে আমরা উদ্ভিদ ও প্রাণিকূলের যত আকৃতিরই অধ্যয়ন করেছি, সেগুলোর সবই নিজ নিজ দেহ থেকেই ওদের বাচ্চা-কাচ্চা ও যুযক উৎপাদন করে, অন্য কোন পথে বা উপায়ে নয়।

www.nagorikpathagar.org

এ সব সত্য ও তথ্যকেই বিজ্ঞান বাস্তবিক পক্ষেই সত্য বলে প্রমাণ করেছে। প্রাণিবিদ্যার অধ্যাপক ক্রমবিকাশবাদী E. J. Gardner তাঁর Organic Evolution and the Bible গ্রন্থে লিখেছেনঃ

A tipe of spontaneous generation may have taken place in the remote past (a billion years or more ago) from which the forms presently living on the earth may have descended—

The possibility of the appropriate elements, energy and suitable environment coming together by chance seems remote, indeed, but in tremendously long periods of time the 'impossible' becomes inevitable.

সেই দূর অতীতকালে—এক বিলিয়ন কিংবা তারও অধিক বর্ষকাল পূর্বে এক ধরনের অজীবযোনি অস্তিত্ব লাভ করে থাকতে পারে; যা থেকে বর্তমানে পৃথিবীর বুকে জীবন্ত আকার আকৃতির জীব বংশানুক্রমিকতা লাভ করেছে।

সামঞ্জস্যপূর্ণ উপাদান, শক্তি এবং অনুকূল পরিবেশে ঘটনাবশত একত্রিত ও সংযোজিত হওয়ার সম্ভাব্যতা অনুমিত প্রাচীনকালে—সময়ের বিস্ময়কর দীর্ঘ মেয়াদ ঘিরে 'অসম্ভব' অনিবার্য হয়ে উঠল।

কিন্তু জানা সত্য ও তথ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত এ ধরনের যুক্তি উপস্থাপনকে বিজ্ঞানসম্মত বলে কী করে মেনে নেয়া যেতে পারে? বস্তুত এরূপ কথা কখনই বিজ্ঞানসম্মত হতে পারে না। বরং একে বলা যায়, নিতান্ত অন্ধ সরল বিশ্বাস মাত্র।

কোষের বিবর্তন

শুরুতে একক কোষ যখন এতটা যথেষ্ট কার্যকর ছিল তখন তা কী করে অধিকতর জটিল জীবন পদ্ধতিতে বিকাশলাভ করল? উপরন্তু আমরা যখন মনে করি যে, অ্যামিবার মত এক কোষ সম্পন্ন দেহসংস্থা এখনো আজো আমাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত অবস্থায় রয়েছে, তখন তাদের মধ্য থেকে কতিপয় 'সত্তা' ক্রামবিকাশ লাভ করল, আর বাকিগুলো করল না, এ কথার কী বিশ্লেষণ করা যেতে পারে?

একক কোষসম্পন্ন প্রাণীর যদি তুলনা করা যায় একটি ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের সঙ্গে, তাহলে সহস্র মিলিয়ন কোষযুক্ত জীবন-ধরন কতটা জটিল হতে পারে—যার সব-ই পরস্পর সংযুক্ত দায়িত্ব পালন করেছে, যা অন্য কোন যন্ত্র করতে পারে না? একটি জটিল ইলেকট্রনিক পরিকল্পনার ছবি দেখিয়ে ১৯৬৫ সনের Science Year লিখেছেঃ

A spider appears to be one of nature's simpler creaturs and a spider web seems to be a simple structure, wonderful in its

www.nagorikpathagar.org

symmetry. The fact is, that the spider and its web are far more complex than the machine above, with its tangle of wires and electronic 'brain' .....

in observing nature, scientists are confronted with the simple and the complex, and nothing appears to be more complex than life itself. (p. 18)

মাকড়সাকে প্রকৃতির সরলতর সৃষ্টি বলে মনে করা হয় এবং মাকড়সার পায়ের মাঝখানের বুনট খুবই সরল কাঠামোর মনে হয়। এর প্রতিটির সাম্যেও তা বিস্ময়কর। ব্যাপার হচ্ছে, মাকড়সা এবং তার পায়ের বুনট অনেক অনেক বেশী জটিল যন্ত্রের তুলনায়—তার ও তার বিদ্যুৎ মগজের সূত্রগ্রন্থি সহকারে।... ... ...

প্রকৃতি পর্যবেক্ষণে বিজ্ঞানীরা সরল ও জটিল সংগঠনের মুখোমুখি হয় এবং স্বয়ং জীবনের তুলনায় অধিক জটিল আর কিছুই দেখা যায় না।

খুবই সরল ধরনের জীবন-ধারা একটি নতুন জীবদেহের উদ্‌গম করে—যেমন একটা চক্ষু। চক্ষু যে এতটা উৎকর্ষ লাভ করবে, তা সে কেমন করে জানতে বা বুঝতে পারে—যখন তা পূর্বে কখনো সেটি দেখতে পায় নি? দেখা যে আদৌ সম্ভবপর, তা সে কী করে জানতে পারল? চক্ষু হল প্রকৃতই বহু জটিলতা-কঠিনতা সম্পন্ন আনুষঙ্গিক অঙ্গ—যেমন কর্ণিয়া, চোখের মণি বা তারা, চক্ষুর কনীনিকা (iris), অক্ষিপট (retina), চক্ষুধমনী, পেশী, রক্ত, শিরা প্রভৃতি। এসব অংগ-প্রতঙ্গ একই সময় ক্রমবিকাশের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়ে থাকবে, কিংবা চক্ষুর কোন ব্যবহারই হয়ত থাকবে না। আংশিক চক্ষু হয়তো ভয়ানক অসুবিধার কারণ হয়ে দেখা দেবে। ডারউইনও তা স্বীকার করেছেনঃ

To suppose that eye with all its inimitable contrivances for adjusting the focus to different distances, for admitting different amounts of light and for the correction of spherical and chromatic aberration could have been formed by natural selection, Seems, I freely confess, absurd in the highest degree. (The Origin of Species. p. 190)

মনে কর, চক্ষু তার অননুকরণীয় পরিকল্পসহ বিভিন্ন দূরত্বের জ্যোতি কেন্দ্রকে ভারসাম্যপূর্ণকরণে আলোর বিভিন্ন পরিমাণকে শামিল করার জন্য এবং উপগোলক আয়তাকার ও বর্ণসম্বন্ধীয় বিপথগমন সংশোধনের জন্য, ধারণা হয় যে, এসব প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে সম্ভব হয়েছে, আমি উন্মুক্তভাবে স্বীকার করছি, তা সর্বোচ্চ মাত্রায় অযৌক্তিক কথা।

www.nagorikpathagar.org

ডারউইন একথা ব্যাখ্যা করে করে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, ক্রমবিকাশ প্রক্রিয়াই অসংখ্য ক্ষুদ্র অন্তর্বর্তীকালীন স্তর অতিক্রম করানোর মাধ্যমে এসব সৃষ্টি করেছে। কিন্তু আজকের ক্রমবিকাশবাদীরা বলেছেন যে, ভুল-ভ্রান্তি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে এবং একটি ক্ষুদ্র সংক্রমণ অনুকূল প্রমাণিত হওয়ায় তা এককভাবে অতিক্রম করে এবং পরে তা গড়ে ওঠে।

কিন্তু যেখানে, যেদিকে এবং যারই চক্ষু আমরা পরীক্ষা করে দেখি না কেন; দেখতে পাব, তা সব দিক দিয়েই সম্পূর্ণ, তা ক্রমোন্নয়নের কোন সংক্রমণ-স্তরে অসম্পূর্ণ অবস্থায় আটকে পড়ে নেই।

জীবন্ত কোষ সম্পর্কিত তথ্যাদি আরো অনেক অসুবিধা ও জটিলতার উৎস—এককোষ বিশিষ্ট দেহসংস্থা—যেমন অ্যামিবা অযৌন উপায়ে পুনরুৎপাদন করে। আর তা হয় তাদের নিজস্বভাবে। ওগুলো দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায় এবং দ্বৈতভাবে গড়ে ওঠে। অযৌন পুনরুৎপাদন যথেষ্ট থাকলে এবং এ ধরনের দেহব্যবস্থা আজো আমাদের সাথে রয়েছে বলে যদি সেই একই উপায়ে বহু সংখ্যক ও বারংবার গড়ে উঠতে পারত, তাহলে যৌন পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদনের প্রশ্ন উঠত কেন? পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের যৌন অঙ্গ পরস্পরের সম্পূরক হয়ে ক্রমশ পরস্পরের পাশাপাশি গড়ে উঠতে পারল কেমন করে? তা যতক্ষণ পর্যন্ত সম্পূর্ণতা লাভ না করতে পারত ততক্ষণ পর্যন্ত তা অর্থহীন হয়ে যেত ও থাকত, এটাই তো ছিল স্বাভাবিক।

স্ত্রীলোকের দেহে মাতৃত্বের লালাগ্রন্থি যদি মন্থর গতির ক্রমবিকাশের মাধ্যমে গড়ে উঠত, তাহলে এ সময়ের মধ্যে স্ত্রীলোক তাদের কাচ্চা-বাচ্চাদের প্রয়োজন পূরণ করত ও পুষ্টি সাধন করত কী করে? ওদের প্রয়োজনীয় বস্তু যোগান দেয়ার অন্য কোন উপায় যদি যথারীতি চালু থেকে থাকত, তাহলে স্তন কেন সম্পূর্ণতা লাভ করল? স্তন একটি উন্নতমানের শিশু পালনের উপায় হওয়ার কারণে যদি তা সম্পূর্ণতা পেয়ে থাকে, তাহলে এখনো এমন প্রাণী কেন পাওয়া যাচ্ছে, যা অন্য উপায়ে ও পথে কাচ্চা-বাচ্চাদের প্রয়োজন পূরণ করছে এবং বেশ সুষ্ঠুভাবেই তারা বেঁচে থাকছে?

বহুকোষ সম্পন্ন দেহ-সংস্থার জটিলতাই ক্রমবিকাশবাদী G. S. Carter-কে তার বই Animal Evolution-এ একথা বলতে বাধ্য করেছেঃ

> No one can look at the immensely complicated organisation of an insect or a vertebrate without doubting that our relatively simple theories can completely explain the origin of such complexity. (1954 p. 350)

একটি কীট-পতঙ্গ (মেরুদণ্ডহীন ক্ষুদ্রজীব) অথবা একটি মেরুদণ্ডী জীবের বিরাটাকারের জটিল দেহসংস্থার প্রতি তাকালে কোন সন্দেহ হবে না যে,

www.nagorikpathagar.org

আমাদের তুলনামূলকভাবে সরল মতাদর্শ এ জটিলতার মৌলের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দিতে পারে।

বস্তুত যন্ত্রসংস্থার যান্ত্রিকতা যত জটিল হবে, তার রচয়িতা ও নির্মাতা ততধিক ধীশক্তি সম্পন্ন হবে, সমস্ত মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার এটাই অনিবার্য দাবি। একজন নির্মাতার অত্যন্ত অমার্জিত ও অপরিপক্ক হাতিয়ার থাকা উচিত বলেও আমরা মনে করি। যাদুঘরে আমরা যখন একজন প্রাচীন সূঁচলোমুখ ভারতীয় দেখতে পাই, তখন কি আমরা মনে করি যে, সে 'ক্রমবিকাশ' লাভ করেছে? তাকে কেউ বানিয়েছে, একথা কি তখন আমাদের মনে তীব্রভাবে জেগে ওঠে না? একথা ঘোষণা করতে কি কেউ প্রস্তুত আছে যে, গ্রহমণ্ডলে একটি মহাকাশ-উপগ্রহ পৃথিবীর চারদিকে আবর্তনশীল অবস্থায় পাওয়া গেল তখন, যখন ধাতব-কণাসমূহ ঘটনাবশত সংঘটিত সংযোজন পৃথিবীর বুকে একটি 'ক্যাপসোল' বানাল। তা ক্রমবিকাশ পাওয়া একটি রকেট ও জ্বালানী ট্যাংকের সাথে যুক্ত ও সম্পৃক্ত হয়ে থাকছে এবং আকস্মিকভাবে সংঘটিত এসব জিনিস কোন বুদ্ধিমত্তার (intelligence) পথ প্রদর্শন ব্যতীতই একটি পূর্ণাঙ্গ কক্ষপথের (Orbit) রূপ ধারণ করেছে? .....না, আমরা এজন্য অবশ্যই একজন নির্মাতা বা স্রষ্টার অনিবার্য প্রয়োজন অনুভব করি।

(রকেটেরও একজন নির্মাতার প্রয়োজন—যেমন একটি সহজ সরল সূঁচলো মুখের জন্যে তা দরকার। সব কিছুর মধ্যে সব চাইতে বেশী জটিল জিনিস কোনটি?.....তা হল, জীবন্ত দেহসংস্থা। তার জন্যে কি নির্মাতা বা স্রষ্টার প্রয়োজন নেই?)

অংকশাস্ত্রবিদের অতুলনীয় মেধা ছাড়াই জঠিল অংকশাস্ত্রীয় ফর্মূলা তৈরী হয়েছে এমন দাবি কেউ করতে পারে কি? একটি ব্ল্যাক-বোর্ডের ওপর চক-অণুসমূহের সংযোজন—সহযোগিতার ফলে একটি দুর্ঘটনাবৎ ওগুলো গড়ে উঠেছে বলে মনে করা যায় কি?

তাহলে সৃষ্টির ব্যাপারে কোন্ উদ্ভট আঙ্গিক যথাযথতা ও স্পষ্টতা নিহিত রয়েছে? ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অংকশাস্ত্রের অধ্যাপক P. Dirae ১৯৬৩ সনের Scientific American পত্রিকার মে সংখ্যায় লিখেছেনঃ

'It seems to be one of the fundamental physical law are described in terms of a mathematical theory of great beauty and power, needing quite a high standard of mathematics for one to understand it...one could perhaps describe the situation by saying that God is a mathematician of a very high order and He used very advanced mathematics in constructing the universe. (p. 53)

www.nagorikpathagar.org

এটাকে একটি মৌলিক প্রাকৃতিক আইন মনে করা যাবে, যার বিরাট সৌন্দর্য ও শক্তির গাণিতিক থিওরীর পরিভাষায় ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। সেজন্য প্রয়োজন সম্পূর্ণ উচ্চ মানের গণিত বিদ্যা বোঝার যোগ্যতা। কেউ একথা বলে অবস্থার বর্ণনা দিতে পারে যে, আল্লাহ্ একজন অতীব উচ্চ ধরনের গণিতবিদ্যা বিশারদ এবং তিনি বিশ্বলোকের নির্মাণে অতীব উন্নত মানের গণিত বিদ্যা ব্যবহার করেছেন।

প্রত্যেকটি সৃষ্টির জন্যে একজন স্রষ্টা যে অপরিহার্য এবং স্রষ্টাকে স্বীকার না করে সৃষ্টির যে কোন ব্যাখ্যা দেয়া চলে না, দেয়া সম্ভব নয়, তা বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটন খুবই মনঃপূত পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন। একজন সুদক্ষ কারিগর একদা আমাদের সৌরমণ্ডলের একটি ক্ষুদ্রাকার চিত্রের প্রতিচ্ছবি বানাল। তাতে এমন সব গোলক স্থাপন করল যা মোড় ঘোরার সময় সঞ্চালিত হয় এবং এরূপ খাঁজ বা দাঁত ও বেল্ট দ্বারা এক সঙ্গে পরিচালিত হতে পারে এমন উপগ্রহসমূহ তাতে দেখানো হয়েছিল। পরে স্রষ্টায় অবিশ্বাসী এক বিজ্ঞানী বন্ধু নিউটনের সাথে সাক্ষাৎ করতে যান। তাঁদের পারস্পরিক কথোপকথনের যে বিবরণ Minnesota Technology পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

নিউটন একদিন তাঁর অধ্যয়নকক্ষে পড়াশোনায় ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর নিকটে একটি বিরাট টেবিলের ওপর তাঁর তৈরী যন্ত্রটি রাখা ছিল। এ সময় তাঁর নাস্তিক বন্ধু কক্ষমধ্যে প্রবেশ করেন। তিনি নিজেও বিজ্ঞানী ছিলেন বলে নিউটনের সামনে কি রাখা আছে তা প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝতে পারলেন। সেটির কাছে গিয়ে তিনি ধীরভাবে খাঁজগুলো ঘুরিয়ে দিলেন এবং অপ্রচ্ছন্ন বিস্ময়বোধ নিয়ে তিনি দেখতে পেলেন, আকাশমার্গীয় অবয়বগুলো সমস্তই ওদের নির্দিষ্ট কক্ষপথে আপেক্ষিক গতিবেগে চলতে শুরু করে দিয়েছে। তিনি কয়েক ফুট দূরে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে বলে উঠলেনঃ

My! What an exquisite thing this is! Who made it? আরে! এটা কী নিখুঁত সুন্দর জিনিস! কে বানাল এটা? নিউটন তাঁর বইয়ের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই অবিচলিত কণ্ঠে বলে উঠলেনঃ 'Nobody'-'কেউ না'

একথা শোনা মাত্রই নিউটনের দিকে মুখ করে নাস্তিক বিজ্ঞানী বলে উঠলেনঃ স্পষ্টত মনে হচ্ছে, তুমি আমার প্রশ্নটি বুঝতে পারনি। আমি জিজ্ঞেস করেছি, এই জিনিসটি বানাল কে?

এ সময় নিউটন উপরের দিকে চোখ তুলে শান্তস্বরে তাঁকে নিশ্চয়তা দিয়ে বললেনঃ 'না, ওটিকে কেউ-ই বানায় নি। তবে বস্তুর সংযোজন এতই বিস্ময়কর যে, তার-ই ফলে এটি গড়ে উঠেছে। একথা শুনে বিস্মিত নাস্তিক তীব্র ভাষায় বলে উঠলেনঃ

You must think I am a fool! Of course somebody made it, and he is a genius and I'd like to know who he is.

www.nagorikpathagar.org

'তুমি আমাকে বোকা মনে করেছ নিশ্চয়? অবশ্যই এটা কেউ না কেউ বানিয়েছে। সে একটি মস্ত বড় প্রতিভা, তাতে সন্দেহ নেই। তাই তো আমি জানতে চাচ্ছি, লোকটা কে?'

নিউটন তখন বইখানি একপাশে রেখে উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁর স্কন্ধে হাত রেখে বললেনঃ

This thing is but a puny imitation of a much grander system whose laws you know, and I am not able to convince you that this mere toy is without a designer and maker; yet you profess to believe that the great original form which the design is taken has come into being without either designer or maker! Now tell me by what sort of reasoning do you reach such an incongrous conclusion? (October 1957)

এটা একটি ক্ষুদ্র অনুকরণ একটি অনেক বড় পদ্ধতির, যার নিয়ম তুমি জান। আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না যে, এ খেলনাটা কোন পরিকল্পনাকারী ও নির্মাতা ছাড়াই হয়েছে। হ্যাঁ, তুমি তখনও বলবে যে, বড় মৌল আকৃতি যেখান থেকে এ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে তা কোন পরিকল্পনা নির্মাতা ছাড়াই অস্তিত্বমান হয়েছে। এখন তুমি বল, তুমি এ ধরনের একটি সঙ্গত সিদ্ধান্তে কোন্ ধরনের যুক্তির বলে উপনীত হলে?

নিউটন তাঁর বন্ধুকে এ বিষয়ে প্রত্যয়শীল বানিয়েছিলেন যে, নির্মাণ যে ধরনেরই হোক, তার একজন নির্মাতা একান্তই অপরিহার্য। আমরা যদি কেবল আমাদেরই নিজস্ব জীবন-ধারা লক্ষ্য করি, তাহলে বার বার সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেই আমরা বাধ্য হব। তুমি যখন তোমার কক্ষে উপবিষ্ট থাক, তখন চিন্তা কর, তার কতটা ক্রমবিকাশ পদ্ধতিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠেছে আর কতটা তার এক ধী-শক্তিসম্পন্ন নির্মাতার দ্বারা নির্মিত হয়েছে। তোমার বাতি, বিছানা, চেয়ার, টেবিল, স্টোভ, কম্বল, প্রাচীর—তোমার গোটা বিল্ডিংটা সম্পর্কে তোমার কি সিদ্ধান্ত?....এসব কিছুরই একজন নির্মাতা অপরিহার্য। তোমার নিজের একজন গর্ভধারিণী মাতা ও জন্মদাতা পিতার অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। তাহলে কোন্ সব যুক্তিধারার ভিত্তিতে তুমি দাবি করতে পার যে, সমস্ত জীবন্ত জিনিস স্বতস্ফূর্তভাবেই অস্তিত্ব লাভ করেছে এবং সে সবের জন্যে কোন স্রষ্টার আদৌ প্রয়োজন হয় নি। সমস্ত তথ্যভিত্তিক ন্যায়শাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত তা-ই হতে পারে, যা জনৈক রাসায়নবিদ অনুসন্ধানীর লেখনীতে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি লিখেছেনঃ

'So highly intricate are the organic and bio-chemical processes functioning in the animal organism, that it is not surprising that malfunction and desease occasionally

www.nagorikpathagar.org

intervene. One is rather amazed that a mechanism of such intricacy could ever function properly at all. All this demands a planner and sustainer of infinite intelligence...

The simplest man-made mechanism requires a planner and a maker, How a mechanism ten thousand times more involved and intricate can be conceived of as self coustructed and self developed is completely beyond me. (The Evidence of God in an Expanding Universe 1958)

প্রাণিদেহে কত না উচ্চমানের আঙ্গিক ও জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়া সতত কাজ করছে! তাতে কোনরূপ অমঙ্গলজনক ঘটনা বা রোগ সময় সময় বাধাদানকারী হলে তা কিছুমাত্র বিস্ময়কর নয়। এ রকম জটিল একটি যন্ত্রব্যবস্থা যথাযথভাবে চলতে ও কাজ করতে পারে, এটা ধারণা করাই কঠিন।—এসবের জন্যে একজন পরিকল্পনাকারী ও সংরক্ষকের একান্তই প্রয়োজন রয়েছে এবং আবশ্যক তার অসীম অবিনশ্বর ধীশক্তি বর্তমান থাকা।

সহজতর মানবনির্মিত যন্ত্রব্যবস্থার জন্যেও একজন পরিকল্পনাকারী ও নির্মাতার প্রয়োজন। তাহলে দশ সহস্রগুণ বেশী পেঁচানো ও জটিল যন্ত্র ব্যবস্থা—এই মহা বিশ্বলোক—স্বয়ংগঠিত এবং স্বয়ং উৎকর্ষপ্রাপ্ত বলে কী করে মনে করা যেতে পারে, তা আমার বোধগম্য নয়।

নিউটন তাঁর 'প্রিন্সিনিয়ার' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেনঃ

This most beautiful system of the sun planets and comets could only proceed from the councel and dominion of an intelligent and powerful being. The Universe is a clock which to be regulated every now and again by its creature.

এ ধরনের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা যখন স্বীকৃত, তখনো কিছু লোক ভাবছে, ক্রমবিকাশ প্রক্রিয়া অবশ্যই কার্যকর হয়েছিল। তারা তাদের দাবির স্বপক্ষে ফসিলতত্ত্ব পেশ করে—যা দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গেছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, ফসিল দ্বারা সত্য-ই কি ক্রমবিকাশবাদ প্রমাণ করা যায়?

www.nagorikpathagar.org

ফসিলতত্ত্ব ও বিবর্তনবাদ

জীবন্ত জিনিসগুলো যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে এক-কোষ বিশিষ্ট দেহব্যবস্থা থেকে অতি উচ্চ ধরনের প্রাণী ও উদ্ভিদ জীবন পর্যন্ত ক্রমবিকাশ লাভ করে পরিণত হয়ে থাকে, তাহলে আমার ফসিলতত্ত্বে তার প্রমাণ পাওয়ার খুবই আশা করতে পারি। সেই প্রাথমিক কালের আকার-আকৃতি নিশ্চয়ই তাদের ফসিল রেখে গেছে, রেখে গেছে তাদের দেহাকৃতির ছাপ কিংবা এমন সাক্ষ্য প্রমাণ,? যার দ্বারা ক্রমবিকাশের সত্যতা প্রমাণিত হতে পারে। তাই প্রশ্ন হল, ফসিলতত্ত্ব কী প্রমাণ করে, কী জানা যায় ফসিল থেকে?

এক শতকেরও বেশীকাল পূর্বে ফসিলতত্ত্ব বেশ খানিকটা গণ্ডগোল বাঁধিয়ে দিয়েছিল—এমনকি চার্লস্ ডারউইনকেও করেছিল বিভ্রান্ত। তিনি তাঁর The Origin of Species গ্রন্থে নিজেই লিখেছেনঃ

> There is another and allied difficulty, which is much more serious. I allude to the manner in which species belonging to several of the main divisions of the animal kingdom suddenly appear in the lowest known fossiliferous rocks.....
>
> If the (evolution) theory be true, it is indisputable that before the lowest Cambrian stratum was deposited long periods elapsed, as long as, or probably far longer than, the whole intervel from the Cambrian age to the present day; and that during these vast periods the world swarmed with living creatures

আর একটি সদৃশ অসুবিধা রয়েছে। তা আরও অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। আমি তা প্রসঙ্গত এভাবে উল্লেখ করছি যে, তাতে পশু রাজ্যের মূল বহু বিভক্তির মধ্যে প্রজাতিগুলো রয়েছে, সহসাই সর্বনিম্ন ভূ-স্তরের মধ্যে প্রস্তরীভূত জৈব শিলায় পরিণত হয়ে গেল। .....

বিবর্তনতত্ত্ব যদি সত্য হয়, তাহলে এটা বিতর্কহীন হবে যে, নিম্নস্থ ক্যাম্ব্রীয়ান স্তর সংরক্ষিত ছিল অতীত হয়ে যাওয়া দীর্ঘকাল ধরে। কিংবা সম্ভবত তার চেয়েও অনেক দীর্ঘকাল ধরে, ক্যাম্ব্রীয়ান কাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত

www.nagorikpathagar.org

সমস্ত অন্তবর্তীকাল ধরে। এবং এই বিস্তীর্ণ সময়ে পৃথিবী জীবন্ত সৃষ্টির ভিড়ে ভরে গেছে।

অতঃপর তিনি লিখেছেনঃ

To the question why we do not find rich fossiliferous deposits belonging to these assumed earliest periods prior to the Cambrian system, I can give no satisfactory answer....the difficulty of assigning any good reason for the absence of vast piles of strata rich in fosiles beneath the Cambrian system is very great. (PP—359-361)

ক্যামব্রীয়ান পদ্ধতির প্রাক্কালে নিকটবর্তী কল্পিত সময়ে তৈরী সমৃদ্ধ জৈব ফসিল শিলা দেখতে পাই না কেন এ প্রশ্ন করা হলে আমি তার যথার্থ উত্তর দিতে পারব না। অসুবিধা হচ্ছে, ফসিলের বিপুল স্তূপ ভর্তি কোন ভূ-স্তর না পাওয়া। ক্যামব্রীয়ান পদ্ধতির অনুপযুক্ততা অনেক বড়।

ডারউইন নির্দেশিত ওয়েলসীয় ভূমিস্তর—ক্রমবিকাশবাদীরা বলেছেন—প্রায় ৬০০,০০০,০০০ বছর প্রাচীন। ডারউইনের সময় প্রাগ-ওয়েলসীয় স্তর ছিল শূন্য। এখন, ব্যাপক অনুসন্ধান কার্য চালাবার একশ' বছরেরও বেশীকাল পর আসল তথ্য কি প্রমাণ করছে? ১৯৬৪ সনের ২৫ অক্টোবরের New York Times পত্রিকায় ক্রমবিকাশবাদ সমর্থন করে লেখা একটি প্রবন্ধে স্বীকার করা হয়েছে যে, এ সময়কালটা এখনো শূন্যঃ

The chief puzzle in the record of life's history on earth: the sudden appearance, some 600 million years ago of most basic divisions of the plant and animal kingdoms. There is vitrually no record of how these divisions came about. Thus the entire first part of evolutionary history is missing.

পৃথিবীতে জীবনের ইতিহাসের তথ্য সহসাই আত্মপ্রকাশ করে মাত্র ৬০০ মিলিয়ন বছর পূর্বে—এটাই প্রধান হতবুদ্ধিকারী ব্যাপার। উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের মৌল বিভক্তিতে কার্যত এমন কোন প্রমাণ তথ্য নেই কী করে এ বিভক্তি এল। এ কারণে বিবর্তন ইতিহাসের প্রথম অংশটাই সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে গেছে।

The World We Live in বইখানিও এ কথারই প্রতিধ্বনি করে বলেছেঃ

For at least three quarters of the book of ages engraved in the earths crust the pages are blank. (by the editorial staff of life and lincoln Barnett. 1955, P-93)

www.nagorikpathagar.org

পৃথিবীর শক্তপৃষ্ঠের ওপর অঙ্কিত যুগগ্রন্থের অন্তত একতৃতীয়াংশ পৃষ্ঠা একেবারে শূন্য—তাতে কিছুই লেখা হয় নি।

১৯৬৪ সনের আগস্ট সংখ্যা Scientific American পত্রিকা এ কথারই প্রতিধ্বনি করেছে। ১৯৫৯ সনের অক্টোবর সংখ্যা Natural History ম্যাগাজিনও Darwin and the Fossil Record শীর্ষক এক প্রবন্ধে এ সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছে। বলেছেঃ

'ওয়েলস দেশীয় লোকদের শুরু থেকে জীববিজ্ঞানমূলক শেষ পরিণতি পর্যন্ত প্রত্যেক স্তরেই প্রাণী জীবনের প্রচুর প্রতিনিধিত্ব রয়েছে।—এমনকি নিম্নতর ওয়েলসীয় সংযোজনেও বহুসংখ্যক ও বহু প্রকারের সামুদ্রিক মেরুদণ্ডহীন জীব দেখতে পাই, তার নিচেও তলানির বহু গুরুত্ব বিদ্যমান। তাতে ওয়েলসীয় লোকদের আদি পুরুষ বর্তমান থাকার আশা করা যায়। কিন্তু তা আমরা চোখে দেখতে পাই না। এই প্রাচীনতম শয্যায় অধিকাংশই জীবনের অস্তিত্ব প্রমাণের ব্যাপারে একেবারেই বন্ধ্যা এবং সাধারণ ছবি—যুক্তিসঙ্গতভাবেই বলা যেতে পারে যে, ওয়েলসীয় কালের শুরুতে অবস্থিত বিশেষ সৃষ্টি সংক্রান্ত ধারণার সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ওয়েলসীয় সিস্টেমের পূর্ববর্তী এই নির্দিষ্ট প্রাথমিক কালীন ফসিল সঞ্চয়ের প্রচুর স্তর আমরা দেখতে পাই না কেন, এ প্রশ্নের জবাবে ডারউইন বলেছেনঃ

আমি তার কোন সান্ত্বনাদায়ক উত্তর দিতে পারি না। আমরাও বলছি, আজো আমরা তা পারি না।—তা দেয়া সম্ভবই নয়।

এ কি ধরণের ব্যাখ্যা হল? ক্রমবিকাশবাদীরা সর্বশেষে একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেনঃ

The objection is based merely on negative evidence which experience often shows to be worthless: (Natural History. October 1959. PP—469-467)

শুধু নেতিবাচক প্রমাণের উপর আপত্তি, যার অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ রূপে অর্থহীন।

অন্য কথায়, ক্রমবিকাশবাদীরা যদিও প্রাগ-ওয়েলসীয় ফসিল দেখতে পারছেন না,—কেননা 'অনুলিপির চার ভাগের তিন ভাগই শূন্য'—তাই তাঁরা এ নিয়ে তর্ক তুলেছেন যে, ক্রমবিকাশ যেভাবেই হোক বাস্তবায়িত হয়েছে। কেননা মোট প্রমাণাভাব শুধুমাত্র নেতিবাচক প্রমাণ (অর্থাৎ ক্রমবিকাশ ঘটে নি, তার কোন প্রমাণ নেই)।

এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্পষ্টভাবেই অবৈজ্ঞানিক। সত্য প্রমাণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হল তা-ই, যাতে যুক্তি ও তথ্যাদির ভিত্তিতে কোন ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ

www.nagorikpathagar.org

করা হয়। কিন্তু তাঁরা সেরূপ করতে যখন অক্ষম তখন তাঁদের সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করা ছাড়া উপায় থাকে না। সমর্থনকারী সাক্ষ্য প্রমাণের অভাব থাকা সত্ত্বেও ক্রমবিকাশবাদীরা যে দৃঢ় মনোভাব প্রদর্শন করেন তা নিতান্ত হাস্যকর। উপরি উক্ত প্রবন্ধটিতেই বলা হয়েছেঃ

> In the century since Darwin's controversial theory first appeared, paleontologists have established a solid foundation for evolution.
>
> ডারইউনের বিতর্কমূলক মতটি প্রকাশিত হওয়ার শতকে জীবাশ্মবিজ্ঞানীরা বিবর্তনতত্ত্বের একটা শক্ত ভিত্তি রচনা করেছিল।

পরে সে প্রবন্ধেই দেখানো হয়েছে যে,—যেমন পূর্বে বলা হয়েছে—মতাদর্শ প্রমাণের জন্যে প্রয়োজনীয় ফসিল সঞ্চয়ের অধিকাংশই সম্পূর্ণরূপে বাস্তব সত্যতা ও সাক্ষ্য-প্রমাণহীন।

কিন্তু নিতান্ত অন্ধ বিশ্বাস ছাড়া এটাকে কি এ মতাদর্শের জন্যে কোন শক্ত ভিত্তি বলে অভিহিত করা চলে? একজন প্রাসাদ নির্মাতা যদি বলে যে, সে একটি প্রাসাদের শক্ত ভিত্তি রচনা করেছে; কিন্তু অনুসন্ধান করার পর যদি দেখা যায় যে, সেখানে কিছুই নেই,—কংক্রীট নেই, লোহা নেই, কাঠ নেই, দাবি সমর্থনের অনুকূলে কোন ধরনের বস্তু উপাদানও নেই, সেখানে রয়েছে শূন্যস্থান; তাহলে তার এরূপ কথাকে কি প্রাসাদের জন্যে শক্ত ভিত্তি বলে মেনে নেয়া যেতে পারে?—শুধু এজন্যে যে, তা একটি নেতিবাচক প্রমাণ?

না, এ ব্যাপারে অপরিহার্য প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে আমরা কিছুতেই প্রত্যাখ্যান করতে পারি না। পৃথিবীর ফসিল রেকর্ড এক আকস্মিক সৃষ্টিকে সমর্থন করে বটে; কিন্তু ধীর গতিতে সম্পন্ন ক্রমবিকাশ—সেই আদিম কালের জীবন-ধরণ থেকে ক্রমবিকাশ—আদৌ সমর্থন করে না, প্রমাণ করতে পারে না।

মধ্যবর্তী সূত্রগুলো কোথায়?

ক্রমবিকাশ ধারার মধ্যবর্তী তিনভাগ সূত্রই অবলুপ্ত। কিন্তু যে ফসিল পাওয়া গেছে, সে সম্পর্কে কি বলা যায়? সেগুলো কি ক্রমবিকাশ প্রমাণের জন্যে প্রয়োজনীয় সূত্রগুলো আমাদের সামনে তুলে ধরে?—তা কি ক্রমবিকাশ ধারার শেষ ভাগের সূত্র পরিবেশন করে? ব্যাপারটি গভীরভাবে যাচাই ও পরীক্ষা করে দেখতে হবে। তথাকথিত মধ্যবর্তী সূত্র সম্পর্কে চার্লস ডারউইন নিজেই বলেছেনঃ

> 'Why, if species have descended from other species by fine gradations, do we not everywhere see innumerable transitional forms? Why is not all nature in confusion, instead of the species being as we see them, well defined?

www.nagorikpathagar.org

But as by this [evolution] theory innumerable transitional forms must have existed. Why do we not find them embeded in countless numbers in the crust of the earth?

Geological research....does not yield the infinitely many fine gradations between past and present species required. (The Origin of Species. PP-178-179. 503)

প্রজাতিসমূহ যদি অপর প্রজাতিসমূহ থেকে ধাপে ধাপে পরিবর্তিত হয় ক্রমোন্নতির মাধ্যমে, তা হলে কি আমরা যত্রতত্র অন্তর্বর্তীকালীন আকৃতি দেখতে পেতাম না? সমস্ত প্রকৃতি সংশয়পূর্ণ কেন? প্রজাতিসমূহ আমরা যেমন দেখছি তার পরিবর্তে ভালোভাবে বর্ণিত নয় কেন?

এই বিবর্তনতত্ত্ব অনুযায়ী তো অসংখ্য মধ্যবর্তী আকার-আকৃতি দেখতে পাওয়া একান্তই অপরিহার্য ছিল। আমরা তা দেখতে পাচ্ছি না কেন পৃথিবীর বুকে সংখ্যাতীতভাবে শক্তভাবে পড়ে থাকা অবস্থায়?

ভূ-তত্ত্ব বিষয়ক গবেষণা..... অতীত বর্তমান প্রজাতিসমূহের মধ্যবর্তী স্থানে অজস্র সংখ্যক পরিবর্তন পড়ে থাকা অবস্থায়?

.... অতীত ও বর্তমান কালের প্রজাতিসমূহের মাঝে অসীম অনন্ত অনেক উত্তম পরম্পরা বর্তমান থাকা কাম্য ছিল, অথচ ভূতত্ত্ব বিষয়ক অনুসন্ধান তার কোন অস্তিত্ব স্বীকার করে না।

সূত্র পরম্পরায় এই শূন্যতা ও অনুপস্থিতি কিভাবে ব্যাখ্যা করেছেন ডারউইন? তিনি বলেছেনঃ

I believe the answer lies in the record being incomparably less perfect than is generally supposed. (ঐ—p74)

আমি বিশ্বাস করি, সংরক্ষিত বিবরণে এ প্রশ্নের উত্তর রয়েছে যা তুলনাহীনভাবে অপরিপূর্ণ—যতটা সাধারণত ধরে নেয় হয় তার চেয়েও অনেক বেশী।

কিন্তু এর পরবর্তী অধ্যায়েই তিনি বলেছেনঃ

If we confine our attention to any one formation, it becomes much more difficult to understand why we do not therein find closely graduated varieties between the alied apecies (ঐ-P. 349)

আমরা যদি যে কোন একটি আকৃতির উপর আমাদের লক্ষ্য নিবদ্ধ করি তাহলে সদৃশ প্রজাতিসমূহের মধ্যবর্তী নিকটবর্তী ক্রম পরিবর্তিত বৈচিত্রসমূহ বুঝতে আরও বেশী অসুবিধা হবে।

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু ডারউইনের যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর এ পর্যন্ত এ অবস্থার কি কোনরূপ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে? জীবন্ত প্রাণি সমূহের বড় বড় শ্রেণীর মধ্যবর্তী সূত্রগুলো ফসিল সঞ্চয়ের মধ্যে দেখা গেছে কি?..... বিশ্ববিখ্যাত ক্রমবিকাশবাদী মনীষী হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক George Gaylord Simpson তাঁর The Major Features of Evolution গ্রন্থে বলেছেনঃ

It remains true, as every paleontologist knows, that most new species, genera and families and that nearly all new categories above the level of families appear in the record suddenly and are not led up to by known, gradual completely continuous transitional sequences (1853, P-360)

প্রত্যেক নৃতত্ত্ববিদ যেমন জানেন তা সত্য হয়েই থাকবে যে, অতি নতুন প্রজাতিসমূহ মহাজাতি এবং পরিবারসমূহ ও পরিবার স্তর-উর্ধ্ব সব নতুন শ্রেণিসমূহ রেকর্ডে হঠাৎ করে দেখা দেয়, ক্রমাগত পূর্ণ ধারাবাহিকতা সহ অন্তর্বর্তীকালীন পর্যায়ক্রমিক ও জ্ঞাতভাবে নয়।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিষয়ের অধ্যাপক এ. এস. রোমারও একথারই পুনরুক্তি করেছেন। তিনি ঐ enetics, Paleontology and Evolution গ্রন্থে লিখেছেনঃ

In reppid evolutionary changes in animal lines the process may have been a typically, Neo-Darwinian of the accumulation of numerous small adaptive mutations, but an accumulation at an unusualy repid rate, unfortunatiely there is in general little evidence on this point in the fossil record, for intermediate evolutionary forms representative of this phenomenon are extremely rate.

"Links are missing just where we most fervently desire them, and it is all too probable that many 'links' will continue to be missing. (1963)

পশুকুলে তীব্র বিবর্তনমূলক পরিবর্তনে পদ্ধতিটি প্রতীকী হয়ে নব-ডারউইনবাদী রূপে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র শামিল করা পরিবর্তনসমূহ একত্রীভূত হয়ে থাকতে পারে। বরং অস্বাভাবিক দ্রুত হারে একীভূত হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু তা দুর্ভাগ্যবশত অভাবিত গতিতে হয়ে থাকবে এবং এ বিষয়ের প্রমাণ খুব সামান্য ফসিল রেকর্ডে দেখা যায়। মধ্যবর্তী বিবর্তনমূলক আকৃতি এবং অবস্থার প্রতিনিধিত্বকারী ফসিল খুবই বিরল দেখা যায়।

www.nagorikpathagar.org

সংযোগগুলো হারিয়ে গেছে যেখানে আমরা সেগুলো খুবই আগ্রহ নিয়ে কামনা করি। এ-ও হতে পারে যে, বহু সংযোগেরই এমনিভাবে হারিয়ে যাওয়ার ধারা চলতেই থাকবে।

এই মধ্যবর্তী সূত্র সম্পর্কে Professor D. Arey Thompson তাঁর 'On Grouth and Form' নামক বইতে বলেছেনঃ

Eighty years study of Darwinian evolution has not taught us how birds descend from reptiles, mammals from earlier quadrupeds, quadrupeds from fishes, or vertebrates from the invertebrate stock. the invertebrates themselves involve in the same difficulties...the breach between vertebrate and invertebrate worm and coelenterate and protozoan is so wide that we cannot see across the intervening gaps at all....

We cross boundary every time we pass from family to family, or group to group .....

A principle of discontinuity, then, is inherent in all our classifications.....to seek for stepping stones accross the gaps between is to seek in vain for ever.....

ডারউইনী বিবর্তনের আঠারো বছরকালীন অধ্যয়নও আমাদেরকে শেখাতে পারল না পাখি কী করে সরীসৃপের বংশধর হল, স্তন্যপায়ী জীব বংশধর হল প্রাথমিক কালের চতুষ্পদ জন্তু থেকে, চতুষ্পদ জন্তু হল মাছ থেকে, বা মেরুদণ্ডী জীব অমেরুদণ্ডী কাণ্ড থেকে। অমেরুদণ্ডী জীব নিজেরাই একই অসুবিধার সম্মুখীন ..... মেরুদণ্ডী ও অ-মেরুদণ্ডীর মধ্যকার ফাঁক, পোকা-কীট ও caclenterate এবং Protozoan... এ এত বিস্তীর্ণ যে মাঝখানের শূন্যতা অতিক্রম করার কোন উপায়ই আমরা পাই না।.....

প্রত্যেকটি সময় আমরা পরিবার থেকে পরিবার পর্যন্ত বা গোষ্ঠী থেকে গোষ্ঠী পর্যন্ত পরিক্রমা করে চলেছি...

ফলে সম্পর্কহীনতা ও অ-ধারাবাহিকতা আমাদের সমস্ত শ্রেণী বিন্যাসে জন্মগত হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফাঁক অতিক্রম করার জন্যে পা ফেলার ধাপের অন্বেষা সব সময়ের জন্যেই নিষ্ফল।.....

উদ্ভিদ জীবনেও আমরা অনুরূপ বাস্তবতার সম্মুখীন হই। সুইডেন-এর Lund বিশ্ববিদ্যালয়ের Botany-র অধ্যাপক Dr. Heribert Nilsson তাঁর Syethetic Speciation গ্রন্থে লিখেছেনঃ

If we look at the peculiar main groups of the fossil flora, it is quite striking that at difinite intervals of geological time they

www.nagorikpathagar.org

are all at once and quite suddenly there, and moreover, in full bloom in all there manifold forms and it is quite as surprising that after a time which is to be measured not only in millions but in tens of millions of years, they disappear equally suddenly. Further more at the end of their existance they do not change into forms which are transitional towards the main types of the next period: such are entirely lacking.

ফসিলকুলের বিভিন্ন মৌল গ্রুপগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করলে এটা খুব দুঃখজনক হয়ে দাঁড়ায় যে, ভূ-তাত্তিক সময়ের নির্দিষ্ট ফাঁকগুলোতে ওরা সব হঠাৎ এবং সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে এসে পড়ে। উপরন্তু তাদের বহুসংখ্যক আকৃতির চরম উৎকর্ষকালে তা আসে। এটা খুবই বিস্ময়কর যে, একটি সময়ের পর—যখন তা জরীপ করা হবে তখন কেবল মিলিয়ন নয় বহু বহু মিলিয়ন বছর ধরে তা অনুরূপভাবে ও হঠাৎ করে অনুপস্থিত হয়ে পড়ে। এখানেই শেষ নয়, সেগুলোর বেঁচে থাকার শেষকালে তারা এমন আকৃতিতে পরিবর্তিত হয় না, যা পরবর্তী সময়কালের আসল ধরনের দিকে অন্তবর্তীকালীন আকৃতি হতে পারে যেন সমস্তটাই শূন্য।

পশু প্রাণী ও উদ্ভিদের বড় বড় গ্রুপগুলোর মধ্যবর্তী অন্তর্বর্তীকালীন আকৃতি নেই—শুধু তা-ই নয়, বর্তমানকালের জীবিত উদ্ভিদ ও প্রাণিসমূহের বড় বড় গ্রুপগুলোর মধ্যে কোন অন্তঃবর্তীকালীন আকার আকৃতিও নেই। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত ক্রমবিকাশবাদী বিজ্ঞানী Professor Dobzhansky তাঁর Genetics and the Origin of Species বইতে লিখেছেনঃ

If we assemble as many individuals living at a given time as we can notice at once that the observed variations does not form any kind of continuons distribution. Instead, a multitude of seperate, discreted, distributions are found. The living word is not a single array in which any two variants are connected by unbroken series of intergrades. but an array of more or less distinctly seperate arrays intermediates between which are absent or at least rate (P. 4).

আমরা এক সময়ে বাস করা বহু ব্যক্তি যদি একত্রিত হই—যা আমরা হতে পারি, সহসাই আমরা দেখতে পাব যে, পর্যবেক্ষিত পরিবর্তন ধারাবাহিক বিভক্তির কোন আকার ধারণ করছে না। তদস্থলে ভিন্ন স্বতন্ত্র বিভক্তিসমূহের একটা সাধারণ রূপ দেখা যাবে। জীবন্ত জগত একটা একক শ্রেণিবদ্ধ হয় যাতে যে কোন দুটি পার্থক্যশীল ভিন্ন ভিন্ন জিনিসকে আন্তঃশ্রেণিসমূহের

www.nagorikpathagar.org

অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা দ্বারা সম্পর্কিত করা হয়েছে। বরং একটি শ্রেণিবদ্ধতা বেশী বা কম সুস্পষ্টরূপে ভিন্ন শ্রেণিসমূহের মধ্যস্থতার মাঝখানে যা অনুপস্থিত কিংবা অন্তত বিরল।

মানুষের নিকটতর আত্মীয় বলে অনুমিত হয় গরিলা বা লেজবিহীন বানর। তা থেকে মানুষ পর্যন্ত কোন জীবন্ত অন্তর্বর্তীকালীন প্রাণী-স্তর নেই; গরিলা বা লেজবিহীন মানুষ পর্যন্ত কোন জীবন্ত অন্তর্বর্তীকালীন পর্যায়ও দেখা যায় না কোথাও। এমনকি ফসিল রেকর্ডেও বানরের ক্রমবিকাশমূলক পূর্বপুরুষ বলে মনে করা যেতে পারে এমন-ও কিছু দেখা যায় না। ১৯৬৫ সনে কদণ যরধবর্ট্রঃ নামক বইতে বলা হয়েছেঃ

Unfortunately, the fossil record which would enable us to trace the emergence of the apes is still hopelessly incomplete. We do not know either when or where distinctively apelike animals first began to divarge from monkey stock. (by Sarel Eimeria and frven De Vore and the Editors of Life (1965—P. 15)

দুর্ভাগ্যবশত ফসিল তথ্য যা আমাদেরকে লেজবিহীন বানরের জরুরী অবস্থান-আবির্ভাব আবিষ্কার করতে সক্ষম করবে তা এখন পর্যন্ত নৈরাশ্যজনকভাবে অসম্পূর্ণ। আমরা এতটুকুও জানি না যে, কখন কোথায় সুস্পষ্টভাবে বানর সদৃশ পশু সর্বপ্রথম বানর স্তর থেকে বিভিন্ন অবস্থিতির দিকে যাত্রা শুরু করল।

সে যাক, কেউ কেউ দাবি করেছেন যে, অন্তত ঘোড়া ফসিল রেকর্ডে ঊর্ধ্বগামী অন্তর্বর্তীকালীন স্তরের একটা উচ্চমানের দৃষ্টান্ত পেশ করছে। ক্রমবিকাশবাদীরা শুরু করেন Eohippus নামক একটি ক্ষুদ্র প্রায় খেঁকশিয়াল প্রাণী থেকে। তার পরে স্থাপন করেন ক্রমাগত বড় আকারের ফসিলগুলো উপরের দিকে আধুনিক ঘোড়া পর্যন্ত। সত্যিকার ব্যাপার হল, ফসিল রেকর্ডে এ তথ্যগুলো কোন একটি স্থানে এভাবে সাজানো অবস্তায় দেখা যায় নি। দুটি বা তিনটি ঘোড়া একই ধরনের আকার-আকৃতিতে কখনো কখনো দেখা যেতে পারে। আবার অনেকগুলো দেখা গেছে অনেক অনেক দূরবর্তী লোকবসতিতে।

ঘোড়ার ক্রমবিকাশ সম্পর্কে Science News Letter পত্রিকা একটি বড় শিরোনাম দিয়ে ঘোষণা করেছেঃ 'Little Eohippus not direct ancestor of the horse' ক্ষুদ্রাকার 'এওহিপাস' ঘোড়ার প্রত্যক্ষ পূর্ব পুরুষ নয়। পরে এ সম্পর্কে মত প্রকাশ করা হয়েছে এই বলেঃ

The ancestral framily tree of the horse is not what scientists have thought it to be. Prof. T.S. Westoll, Durham University

www.nagorikpathagar.org

giologist, told the British Association for the Advancement of Science at Edinburgh that the early classical evolutionary tree of the horse beginning in the small dog-sized Eohippus and tracing directly to our present day Equinus, was all wrong.

অশ্বের পূর্ব বংশীয় বৃক্ষ কাণ্ড তা নয় যা বিজ্ঞানীরা হতে পারে বলে ধারণা করেছে। অধ্যাপক টি. এস. ওয়েস্টল ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূ-তত্ত্বের শিক্ষক এডিনবার্গস্থ বিজ্ঞান উন্নতি সমিতিকে বলেছেন যে, অশ্বের প্রাথমিক বিবর্তনবৃক্ষ শুরু হয়েছে একটি ক্ষুদ্র কুকুরাকৃতি এবং 'এওহিপাস' রূপে এবং তা আমাদের বর্তমান দিনের 'একুইনাম' পর্যন্ত সোজাসুজি চলে এসেছে। এ সব কথাই ভুল।

Eohippus এবং আধুনিক ঘোড়ার মধ্যবর্তী জীব নিদর্শন হিসেবে যে ফসিল সাজানো হয়েছে, সে সম্পর্কে ক্রমবিকাশবাদী Lecomte du Nouy Human Destiny পত্রিকায় লিখেছেনঃ

Each one of these intermediaries seems do have appeared suddenly, and it has not yet been possible because of the lack of fossils to reconstitute the passage between these intermediaries.....The known forms remain seperated like the piers of a ruined bridge—The continuity we surmise may never be established by facts. (1947-P-45)

মাঝখানের এই সিঁড়িগুলোর প্রত্যেকটিই হঠাৎ করেই দৃশ্যমান হয়েছে বলে মনে হয় এবং তা এখন পর্যন্ত বাস্তবে সম্ভব হয়ে ওঠে নি। কেননা সে অনুপাতে ফসিল পাওয়া যায় নি যদ্দারা এই মাঝখানের শূন্যস্থানসমূহ পুনর্গঠিত করা যেতে পারে।...জানা আকার-আকৃতিসমূহ ভিন্ন ভিন্ন হয়েই থাকল, যেমন একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত পুলের জেটি—উত্তরণ-মঞ্চ। আমরা যে ধারাবাহিকতা অনুমান করি তা হয়ত কোনদিনই বাস্তব ঘটনা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হবে না।

তাহলে ক্রমবিকাশ ধারার মধ্যবর্তী স্তর বা সূত্রসমূহ ফসিল রেকর্ডে রয়েছে, না বর্তমানে জীবিত জিনিসগুলোর রেকর্ডে?.....সব সময় এর একই অবস্থা হয় কেন? কেন হয় একই কাহিনীর বার বার পুনরাবৃত্তি? উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের বড় বড় গ্রুপের মধ্যবর্তী সূত্র অন্তর্বর্তীকালীন আকার-আকৃতি বিলুপ্ত রয়েছে কেন? এসব জটিল দেহ সংগঠনের বড় বড় গ্রুপ সব সময়ই 'আকস্মিকভাবে' সম্মুখে আসে কেন? তা অন্য সব গ্রুপ সদস্যদের থেকে আঙ্গিক ও কাঠামোগত শূন্যতার কারণে পরস্পর বিচ্ছিন্ন কেন? বহু পা, চক্ষু এবং ডানাগুলো সব সময়ই পূর্ণাঙ্গ এবং পরিপূর্ণ গঠিত দেখা যায় কেন? ক্রমবিকাশ যদি সত্যই হয়ে থাকবে, তাহলে

www.nagorikpathagar.org

দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উন্নয়ন ও উৎকর্ষের বিভিন্ন পর্যায় ও স্তর বর্তমান থাকাই তো যথেষ্ট ও স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু বাস্তবে এরূপ পর্যায় ও স্তর আদপেই কখনো দেখা যায় নি।

এই কঠোর-কঠিন সত্য ক্রমবিকাশবাদীদেরকে অত্যন্ত দুদর্শায় ও চরম ক্লেশদায়ক অবস্থায় নিক্ষেপ করেছে। H. J. Berrill কৃত The Origin of Vertebrates গ্রন্থটি সম্পর্কে G. G. Simpson যখন Science পত্রিকার লিখলেনঃ

> Berrill's last sentence is, 'proof may be for ever unobtainable, and it may not matter, for here is such stuff as dreams are made on;
>
> Berrill-এর শেষ বাক্যটি হচ্ছেঃ প্রমাণ হয়ত কোন দিনই পাওয়া যাবে না এবং এটা এখানে তেমন কোন ব্যাপারও হয়ত হবে না। কেননা এখানে এই বস্তু তেমনি যেমন স্বপ্ন হয়ে থাকে।
>
> তখন সিম্পসন নিজেই ব্যাখ্যা করে বললেনঃ
>
> Perhaps this is the last word on the chordate ancestry of the vertebrates. As for the ancestry of the chordates, all is left in darkness without even the dream of 60 years ago.
>
> মেরুদণ্ডীদের পূর্বপুরুষগণ সম্পর্কে সম্ভবত এটাই শেষকথা। যেমন Chordates-এর পূর্বপুরুষগণ সম্পর্কে সবই অন্ধকারে নিমজ্জিত, যা ষাট বৎসর পূর্বে স্বপ্নেও ভাবা যায় নি।

ক্রমবিকাশবাদ সত্য হওয়ার জন্যে সহস্র, মিলিয়ন সংখ্যক অন্তর্বর্তীকালীন আকার-আকৃতি দিয়ে একটি অবিচ্ছিন্ন সূত্র তৈরী হওয়া একান্তই আবশ্যক ছিল। ফসিল রেকর্ড কিংবা জীবন্ত প্রাণিসমূহের অন্তর্বর্তীকালীন বা সংক্রমণগত আকার-আকৃতির অনুপস্থিতি একটা কাল্পনিক সূত্র বানায় বটে, কিন্তু তা পরস্পর সংযুক্ত নয়। সংযুক্তকারী সূত্রের পরিবর্তে ফসিল রেকর্ড দেখাচ্ছে যে, উদ্ভিদ ও প্রাণিকুলের গ্রুপসমূহ পরস্পর বিভিন্ন ও পার্থক্যমূলকভাবে আলাদা-আলাদা। প্রশ্ন হল, ফসিল রেকর্ডে প্রকৃত অবস্থা এরূপ দেখছি কেন আমরা? উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলের গ্রুপসমূহ সব সময় পৃথক বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর স্বাতন্ত্রপূর্ণ কেন?....কেন এগুলো একাকার নয়?

www.nagorikpathagar.org

সমগ্র জীবন্ত বস্তুর মৌলিক বিধান

সমস্ত জীবন্ত প্রাণীর মধ্যে একটি বিধান বিরাজ করছে। কোন একটিও তা থেকে মুক্ত নয়। সে বিধানটিকে বিজ্ঞান স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে আমাদের সম্মুখে পরীক্ষিতভাবে। ১৯৬৬ সনের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত Scientific American পত্রিকা লিখেছেঃ

> Living things are enormously divers in form but form is remarkably constant within any given line of descent. Pigs remain pigs and oak trees remain oak trees generation after generation. (p-32)
>
> জীবন্ত জিনিসগুলো বিশালভাবে বিভিন্ন আকার—আকৃতির। কিন্তু আকার-আকৃতিসমূহ লক্ষণীয়ভাবে ধারাবাহিক যে কোন সময়ের বংশধরদের মধ্যে। শুকর শুকরই থাকছে, ওকগাছ ওকগাছই থাকছে-বংশের পর বংশ ধরে।

জীবন্ত সৃষ্টিসমূহের মূল প্রকারগুলোর স্থিতিস্থাপকতার এই নিয়মটি পৃথিবীর বুকে এক চির-অপরিবর্তনীয় বিধান। বিজ্ঞান এ জিনিসটিকেই স্পষ্ট করে তুলেছে। দুনিয়ার প্রাণী ও উদ্ভিদের বিভিন্ন বিভাগের পরস্পরের মধ্যে কোনরূপ যোগসূত্র নেই। প্রত্যেকটি গ্রুপ-ই বহুধা বিভক্ত, প্রত্যেকটিরই নিজস্ব বাচ্চা কাচ্চা রয়েছে নিজের মতই, সম্পূর্ণ পার্থক্যহীনভাবে। তা অন্য প্রধান গ্রুপের সাথে মিলিত-সংযুক্ত হলে কোন তৃতীয় ধরনের আকার-আকৃতি উৎপাদন করতে পারে না।

জীববিজ্ঞানে নামকরণের যে পদ্ধতি প্রচলিত, তাতে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তি-দেহ সংস্থাগুলো একটি প্রজাতি (Species) বলে অভিহিত। এক বা একাধিক পরস্পর সন্নিহিত প্রজাতিসমূহ মিলে গড়ে তোলে একটি জাতি বা genus। একটি পরিবার জাতির (genera) একটি গ্রুপ। এর একটি দৃষ্টান্ত হল বিড়াল পরিবার, Felidae। এ পরিবারের একটি খণ্ডভ্র বা জাতি হল Felis । বাঘ, সিংহ, গৃহ-বিড়াল এবং অন্যান্যরা এর মধ্যে গণ্য। বিড়াল পরিবারের অপর জাতি হল Lynx, বন বিড়ালী এর মধ্যে শামিল।

www.nagorikpathagar.org

আলোচনার জন্যে আমরা পরিবার শ্রেণী বিভাগের কথা তুলতে পারি। বিড়াল-পরিবারের সবাই সব সময় বিড়ালই থাকবে। তা আজকের জীবন্ত সত্তা হিসাবেই হোক; কিংবা ফসিল রূপে। বিড়াল পরিবারে বহু বৈচিত্র্য রয়েছে। সিংহ, বাঘ, চিতাবাঘ বন-বিড়াল, গৃহ-বিড়াল ইত্যাদি বহু বিচিত্র আকার-আকৃতির জীব। কিন্তু এগুলো সব সময়ই বিড়াল পরিবারে গণ্য হবে। কুকুর পরিবারের সব সেই পরিবারেই চিরকাল গণ্য হবে, যদিও তাতে থাকবে বহু রকমের বৈচিত্র্য।—যেমন গার্হস্থ্য কুকুর, খেঁকশিয়াল, নেকড়ে, পাতিশিয়াল ইত্যাদি।

তাই আমরা যখন বিড়াল-পরিবার কিংবা কুকুর-পরিবার দেখি তখন দেখতে পাই বিভিন্ন ধরনের আকার-আকৃতি, গঠন এবং বর্ণ ও রঙ। কিন্তু একে তো আঙ্গিক ক্রমবিকাশ বলা যেতে পারে না। এটা হল একটা মূল জাতীয় প্রকারে নানাবিধ বৈচিত্র্য। কিন্তু সে প্রকার ও প্রজাতিগুলো পরস্পর কখনো মিলে-মিশে একাকার হয়ে যায় না। হাজার হাজার বছরের অভিজ্ঞতা থেকেও বলা যেতে পারে না যে, একটি মৌল প্রকার বা প্রজাতি কখনো সমান পূর্ব বংশ থেকে ক্রমবিকাশ পেয়েছে। ক্রমবিকাশবাদের দাবির সমর্থনে কোন একটি প্রমাণও পেশ করা যেতে পারে না এ থেকে।

এমনকি পরিবারেরও নিম্নে লিস্টিভুক্ত শ্রেণিবিভাগ—যেমন জাতি বা genus, এতেও পার্থক্য চিহ্নিত হয়েছে।

কাজেই নিশ্চিত করে একথা বলা যায় না যে, আধুনিক শ্রেণিবিভাগ জন্মগত প্রকার ও প্রজাতির মতই। এ-একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শ্রেণী, এগুলোর মধ্যে শরীরের দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে। তা-ই এক প্রকারের জীব-কোষের পক্ষে অন্য প্রকারের জীব-কোষের সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়া অসম্ভব করে দেয় এবং বাচ্চা-কাচ্চা উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। এই কারণে এ্যমিবা বা জীবাণু চিরকালই জীবাণু হয়ে পড়ে থাকে, মশা-মাছি সর্বকালে মশা-মাছিই থেকে যায় এবং বানর চিরকালই বানর হয়ে থাকে।

একটি বিড়াল ও একটি কুকুর একত্রিত হয়ে বাচ্চা জন্ম দিতে পারে না। কেননা ওরা সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতীয়। একটি ঘোড়া ও একটি গাধা দোঁআশলা খচ্চর জন্মাতে পারে। কিন্তু খচ্চর বন্ধ্যা। তা তার 'জাতির' শেষ স্তর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। ওদের কোন ভবিষ্যৎ বংশধর নেই। সমস্ত বিচিত্র ধরনের আকৃতির মানুষ পরস্পরের জন্যে উর্বর ও অনুকূল। ক্ষুদ্রাকার ও সবচেয়ে দীর্ঘকায় মানুষ একত্রিত হতে পারে—বিভিন্ন জাতি ও বংশের লোক যেমন পারে। কেননা সব মানুষ একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত।

বস্তুত এ সত্যগুলো বিজ্ঞানীদের দ্বারা পরীক্ষিত ও সত্য বলে ঘোষিত। প্রখ্যাত ক্রমবিকাশবাদী প্রাণিবিদ্যার অধ্যাপক Richard B. Goldschmidt তার The Material Basis of Evolution নামক বইতে লিখেছেনঃ

> The facts fail to give any information regarding the origin of actual species, not to mention higher categoris.

www.nagorikpathagar.org

প্রকৃত ঘটনা প্রকৃত প্রজাতিসমূহের মৌল সম্পর্কে কোন তথ্য দিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। উচ্চস্তরের প্রাণিসমূহ সম্পর্কে কোন উল্লেখ না হয় না-ই করলাম।

তিনি আরো বলেছেনঃ

Now here have the limits of the species been transgressed, and these limits are separated from the limits of the next good species by the unbridged gap, which also includes sterility. (p-165-168)

সীমালংঘনকারী বলে কথিত প্রজাতিসমূহের সীমা এ পর্যন্তই। এই সীমাসমূহ পরবর্তী শুভ প্রজাতিসমূহের সীমা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর রয়েছে অপূরিত ফাঁক দ্বারা। বন্ধ্যাত্বও এর অন্তর্ভুক্ত।

দোঁআশলা জীব

সে যা-ই হোক, দোঁআশলা জীবগুলো কি বিভিন্ন সৃষ্টিগত প্রজাতির পরস্পর সংযুক্ত হওয়ার প্রমাণ নয়? Biology for Today এই দোআঁশলা সৃষ্টি সম্পর্কে লিখেছেঃ

In the process of hybridization, two different species of the same genus (in most cases) are crossed in order to combine the good qualities of both.....Frequently the new hybrid is stronger than either parent. Sometimes the offspring are sterile and require constant hybridizing. (p-294)

দোঁআশলা জীব সৃষ্টি ব্যপদেশে একই বংশের দুটি ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি (প্রায় ঘটনাতেই) উভয়ের উত্তম গুণসমূহের সমন্বয় করার জন্যে পরস্পর মিলিত হয়। উন্মুক্তভাবে নতুন দোঁআশলা অধিক শক্তিশালী হয় অপরটির বাপ-মা থেকে। কখনও কখনও বাচ্চা-কাচ্চা অনুর্বর হয় এবং ক্রমাগত দোঁআশলা থেকে যায়।

মনে রাখা আবশ্যক, দোঁআশলা জীবন্ত সত্তা থেকেই আসে, শুরু করার সাথে তার নিকট সম্পর্ক। তার অর্থ, ওগুলো সম্ভবত সব সময় একই জনন প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। এ দোঁআশলাদের অনেকেই বন্ধ্যা, উন্মুক্ত পরিবেশেও সাধারণত অধস্তন বংশ সৃষ্টি করে না। এবং ওগুলোর দ্বারাই তা উর্বর হতে পারে। পরবর্তী দোঁআশলা বানানোর ব্যাপারটি একটি সীমা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে—সে সীমা হল বন্ধ্যাত্ব। পরিবর্তন যদিও বিরাট, কিন্তু তা সত্ত্বেও তা একটি প্রকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তা অসীম নয়। ক্রমবিকাশবাদীদের ধারণা এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত হয়েছে। দোঁআশলা বীজ নিয়ে কাজ করলেও এই সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট দেখতে পাওয়া

www.nagorikpathagar.org

যায়। বহু যুগ বহু শত বছর পর্যন্ত দোঁআশলা বীজের উন্নয়নের জন্যে চেষ্টা চালানো হয়েছে, কিন্তু উত্তরকালে তা কিছুমাত্র উন্নয়ন লাভে সমর্থ হয় নি। এটা তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার। কেননা এ বিশেষ চারিত্র্য উন্নয়নের সমস্ত কারণ ব্যবহার করা সত্ত্বেও তা সব সময় বীজ হয়েই থেকেছে, অঙ্কুরিত হতে পারে নি। তা অন্য কোন উদ্ভিদে রূপান্তরিত হয় নি—করা সম্ভবপরও হয় নি। আজ পর্যন্ত যত পরিবর্তনের অভিজ্ঞতাই অর্জিত হয়েছে, তা এর মৌল প্রজাতীয় সীমার মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। প্রাণী দোঁআশলার ব্যাপারেও এ কথাই সত্য। তাদের পরিবর্তন সাধনের অশেষ চেষ্টা যত্নও সব সময় ব্যর্থ ও নিরর্থক প্রমাণিত হতে বাধ্য। কেননা তা অনতিবিলম্বে বন্ধ্যা পর্যায়ে পৌঁছে যায়। আর বন্ধ্যাত্বের এ প্রাচীর এতই শক্ত যে, তা কখনো লঙ্ঘন করা সম্ভব হয় না। এ মূল কারণই সমস্ত মৌল প্রজাতিকে চিরকাল পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও অপরিবর্তনীয় করে রাখে।

খাপ খাওয়ানো

অসংখ্য উদ্ভিদ ও প্রাণীকুল সম্পূর্ণ ভিন্নতর পরিবেশ-পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে টিকে থাকতে চেষ্টা করেছে এবং নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে; নিজের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও বিপরীত পরিবেশ-পরিস্থিতিতে বেঁচে থাকার কৌশল অবলম্বন করেছে। আবহাওয়ামূলক পরিবেশ বৈপরীত্য এ পর্যায়ে বিশেষ উল্লেখ্য।—কিন্তু এটা কি ক্রমবিকাশবাদের সাক্ষ্য বহন করে? না, তা করে না। কেননা উদ্ভিদ আর জীব-জন্তু এমন নয় যে, প্রথমে তা খাপ খাইয়ে নিতে অস্বীকৃত হয়েছে এবং পরে খাপ খাইয়ে নিয়েছে, বরং তাদের দেহসংস্থায় খাপ খাওয়ানোর যোগ্যতা কমবেশী সব সময় এবং চিরকালই ছিল, এখনও রয়েছে। নাগফণী সম্পূর্ণ ভিন্নতর এক উদ্ভিদ থেকে আবহাওয়া শুষ্ক হয়ে যাওয়ার কারণে ক্রমবিকশিত হয়ে আসে নি। মেরু অঞ্চলের বৃহদাকার শ্বেত ভল্লুক কি ক্রমবিকাশ লাভ করে ঠাণ্ডা আবহাওয়ার প্রাণী হয়েছে?* না, কেননা তা অধিক উষ্ণ আবহাওয়ায়ও বেঁচে থাকতে পারে—দুনিয়ার অন্য হাজারো জীব-জন্তু যেমন পারে। কিন্তু তা অন্যান্য প্রাণীদের অপেক্ষা ঠাণ্ডা আবহাওয়ার সাথে খাপ খাওয়ানোর অধিক যোগ্যতার অধিকারী। অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদের স্থানীয় আবহাওয়ার সাথে খাপ খাওয়ানোর ব্যাপারটিও ঠিক এমনিই। এই খাপ-খাওয়ানোর যোগ্যতার বিষয়ে ক্রমবিকাশবাদী Dobzhansky উক্তি করেছেন এ ভাষায়ঃ

The English sparrow introduced in the United States from Europe has changed detectably in its new home. The

* মেরু অঞ্চলের বৃহদাকার শ্বেত-ভল্লুক যদিও শীত প্রধান আবহাওয়া পছন্দ করে, তবুও তা গরম আবহাওয়ার সাথে খাপ-খাইয়ে থাকতে পারে। খাপ-খাওয়ানোর এ যোগ্যতা তার বংশানুক্রমিকতাজনিত যোগ্যতা-বৈশিষ্ট্যের একটি অংশ, এটা মোটেই বিবর্তন নয়।

www.nagorikpathagar.org

average size of the bird has increased, and they became differintiated into incipient local raccs. (Genetics and the Origin of Species, p-96)

(লক্ষ্য করা গেছে যে,) ইউরোপ থেকে আমেরিকায় প্রেরিত ইংলিশ চড়ুই পাখি তার এই নতুন আবাসে দৃশ্যমানভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। পাখিগুলোর গড় আকার বৃদ্ধি পেয়েছে, এরা আদিম স্থানীয় প্রজাতিগুলোর মধ্যে ভিন্নতর হয়ে গেছে।

ইংলিশ চড়ুই আমেরিকায় গিয়ে বৃহদাকার হয়ে কি প্রমাণ করেছে? প্রমাণ করেছে যে, নিজের মধ্যে পরিবর্তন সাধনের যোগ্যতা সদা বর্তমান। কিন্তু পরিবর্তন স্বীকার করেও সে চড়ুই সর্বাবস্থায় চড়ুই-ই থেকেছে, অন্য কিছু হয়ে যায় নি। অন্য কোন জীব বা প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়নি। খাপ-খাওয়ানোর যোগ্যতাকে ক্রমবিকাশ বলে অভিহিত করা হলে মারাত্মক ভুল করা হবে।

ক্রমবিকাশবাদী De Beer ক্রমবিকাশ প্রমাণের জন্যে অন্য একটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। একটি কাঠঠোকরার ছবি দিয়ে তাঁর বই বলছেঃ

The woodpecker has two toes on each foot pointing backward, enabling it to get a firm foothold on the bark of trees, stiff tall feathers serving to prop it securely against the tree, a long stcut beak with which it chisels holes in the bark, and a very long tongue with which it reaches and takes the grubs at the bottoms of the holes...these adaptation must have arisen during the evolution of the woodpecker. (Charles Darwin, Plate. 8)

কাঠঠোকরা পাখির প্রত্যেকটি পায়ের দুটি আঙুল রয়েছে পিছনের দিকে নির্দেশক। তা পাখিটিকে গাছের ছালের উপর শক্ত করে দাঁড়াতে সাহায্য করে। কর্কশ দীর্ঘ পালক গাছের বিরুদ্ধে ঠেকিয়ে রাখতে সাহায্য করে। একটি দীর্ঘ বলিষ্ঠ তীক্ষ্ণ চঞ্চু আছে, তার সহায্যে সে গাছের বাকলের মধ্যে গর্ত করে। এ ছাড়া তাকে সাহায্য করে দীর্ঘ লম্বা জিহ্বা। যদ্দ্বারা সে গর্তের গভীর থেকে খাদ্য সামগ্রী আহরণ করে। কাঠঠোকরা পাখির বিবর্তন কালে এই উপযোজন অবশ্যই সঙ্ঘটিত হয়েছিল।

সে যা-ই হোক, কাঠঠোকরা যা কিছু করছে, তার পূর্বেই কি সে তার পিছে মোড়া পা, লম্বা চঞ্চু এবং জিহবা লাভ করেছে? তা কি এককালে অন্যান্য পাখিদের মত ভিন্নতর পা, অধিক খাটো চঞ্চু ও জিহবা নিয়ে বেঁচেছিল?...তাহলে পরে অন্যান্য বিষয়গুলো গড়ে উঠল কেন?....নবতর পরিস্থিতিতে এসব অন্যান্য অস্ত্রাদি যদি বাঁচার জন্যে অপরিহার্য ছিল, তাহলে এসব খাটো চঞ্চুধারী পাখিগুলো

www.nagorikpathagar.org

তখন কী করে বেঁচে থাকল? আসল কথা হল, সকল প্রকার পাখিই বিভিন্ন উপায়ে খাদ্য সংগ্রহ করে থাকে। আজকে তারা পাশাপাশি বাস করছে এবং বেঁচে থাকছে। ওরা নির্দিষ্ট চারিত্র্য বৈশিষ্ট্য নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছে এবং পরিবর্তিত পরিবেশে অনেকটা খাপ খাওয়াতে পারছে। কিন্তু তার অর্থ কিছুতেই এটা নয় যে, এ সুবিধাটুকুর জন্যে তারা ক্রমবিকাশ লাভ করেছে।

খাদ্য গ্রহণের বিভিন্ন ধরনের অভ্যাস যদি ক্রমবিকাশ লাভের ফলে হয়ে থাকে, এবং তা-ই যদি কিছুকে অন্যদের তুলনায় উন্নতমানে বেঁচে থাকতে সক্ষম করে থাকে, তাহলে গরু এবং ঘোড়া সম্পর্কে আমাদের বলবার কি আছে? ওরা তো এক তৃণভূমিতে একই ঘাস খেয়ে থাকে? ওদের একটি কেন ক্রমবিকাশ লাভ করল উপরের মাড়ির দাঁতসহ এবং অপরটি কেন তা ছাড়া হল। ওরা পাশাপাশি বাস করতে পারছে কিভাবে? ওদের প্রত্যেকটিই তো বেঁচে থাকার জন্যে উন্নতমানে উপযুক্ত? তা কি এজন্যে যে, একজনের দাঁত ওরকম এবং অন্যটি এজন্যে যে, তার দাঁত নেই?

ফড়িং যখন ডি. ডি..টি. ছড়ায় তখন যা ঘটে তা খাপ-খাওয়ানোর যোগ্যতাকে ক্রমবিকাশ বলে ভুল করার আর একটা দৃষ্টান্ত। এক সময় D. D. T. খুব বেশী ক্রিয়াশীল প্রমাণিত হয়, যে সব ফড়িং-এর সাথে তার যোগাযোগ হয় তাদের অনেককেই তা হত্যা করে; কিন্তু কিছু ফড়িং আবার D. D. T. প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয় বলে সেগুলো বেঁচে যায় এবং বাচ্চা-কাচ্চা উৎপাদন করে। এ বাচ্চা-কাচ্চাগুলোও প্রতিরোধশক্তিসম্পন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেগুলো এখনো ফড়িং; ফড়িং ছাড়া আর কিছুই তো নয়। এই যা ঘটল, তা তো ক্রমবিকাশ নয়। তাহল কিছু ফড়িং অধিক প্রতিরোধশক্তিসম্পন্ন D. D. T.-এর সাথে অধিক খাপ-খাওয়ানোর যোগ্যতার অধিকারী বলে তারা রক্ষা পেয়ে যায়, আর অন্যদের সে ক্ষমতা নেই বলে তারা ডি.ডি.টি-র বিষে মরে শেষ হয়ে যায়।

খাপ-খাওয়ানোর যোগ্যতা জীবন্ত জিনিসের চেহারায় কিছুটা পরিবর্তন আনতে পারে, এ কথায় সন্দেহ নেই। কিন্তু সে পরিবর্তনটা এমন বিরাট ও মৌলিক কিছু নয়, যার দরুন সম্পূর্ণ ভিন্নতর প্রকারের বা প্রজাতির জীব গড়ে উঠবে—সময় তাতে যত দীর্ঘই অতিবাহিত হোক না কেন।

পরিব্যক্তি কি নবতর জীবন-পদ্ধতি দিতে পারে?

সমগ্র আঙ্গিক পরিবর্তন মতাদর্শের একটা মূল ও ভিত্তিগত কথা হল এই বিশ্বাস যে, সামান্য অঙ্গচ্ছেদজনিত পরিবর্তন যা পরিব্যক্তি এমন কিছু পরিবর্তন সৃষ্টি করতে পারে, যা ধীরগতিতে এক ধরনের জীবন-পদ্ধতি থেকে ভিন্ন ধরনের জীবন-পদ্ধতিতে পরিণত হতে পারে। কিন্তু এ ব্যাপারে আসল তথ্য কি প্রমাণ করে? অঙ্গচ্ছেদজনিত পরিবর্তন কি কখনো কল্যাণকর হতে পারে? তা কি কখনো সম্পূর্ণ নতুন ধরনের জীবনধারার পরিণতি সৃষ্টি করতে পারে?

www.nagorikpathagar.org

'Mutation' শব্দটি ল্যাটিন 'Mutare' শব্দ থেকে উদ্ভূত। তার অর্থ to change—'পরিবর্তন বা রূপান্তরিত করা'। পরিব্যক্তি একটি আঙ্গিক পরিবর্তন—বংশানুক্রমিক পরিবর্তন বিশেষ তথা কোষের অধীন জীবাণু রসের পরিবর্তন।

Dobzhansky বলেছেনঃ

Mutation produces changes in the genes and variants of the gene structure; these are the raw materials of evolution, (The Biological basis of Human Freedom—p-56)

পরিব্যক্তি পরিবর্তন সাধন করে বংশ ধারায় এবং বংশ কাঠামোর বিভিন্নতায়। আর এগুলোই হচ্ছে বিবর্তনের কাঁচামাল।

The New You and Heredity নামক গ্রন্থে A. Scheinfeld বলেছেনঃ

It is through the rare instances of favourable mutations of innumerable kinds and countless numbers. Occurring successively over very extended periods that the whole process of evolution may now be explained. (p-476)

অসংখ্য প্রকারের ও অগণিত সংখ্যক অনুকূল পরিব্যক্তির বিরল নিদর্শনসমূহের মাধ্যমে এটি সংঘটিত হয়। সাফল্যজনকভাবে খুব বেশী বাড়তি সময় কালে যে সমস্ত বিবর্তন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে তা এক্ষণে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

জীবদেহে Mutation পরিব্যক্তি বা কৃত্রিম আঙ্গিক পরিবর্তন সংঘটিত হয় কেন? Biology for Today বলছেঃ

Mutations probably occur due to factors normally found in the environment; cosmic rays and other ionizing radiations; metabolic processes in cells; or errors in gene replication. (P-273)

পরিব্যক্তি সম্ভবত ঘটে সেসব কারণে যা সাধারণত পরিবেশের মধ্যে দেখা যায়। মহাজাগতিক আলোক রশ্মি এবং অন্যান্য পারমাণবিক বিকিরণ জীবকোষে সৃষ্ট ধাতব প্রক্রিয়া কিংবা বংশ পূর্ণতায় ভুল হয়ে যাওয়ার কারণে।

Mutation বা আঙ্গিক কৃত্রিম পরিবর্তন কি অবাধে ও নির্বিঘ্নে সংঘটিত হয়? Professor B. Wallace এবং T. Dobzhansky লিখিত Radiation, Genes and Man শীর্ষক গ্রন্থে আমরা পড়িঃ

Mutational changes in any one gene are rare events. This is a different way of saying that, ordinarily, the genes reproduce themselves accurately. (P-35)

www.nagorikpathagar.org

কোন একটি বংশে পরিব্যক্তিমূলক পরিবর্তন খুবই বিরল ঘটনা। একথা বলার জন্য এটা ভিন্নতর পথ যে, সাধারণত একটি বংশ যথাযথভাবে সেই বংশকেই পুনরুৎপাদন করে।

ক্রমবিকাশবাদী C. H. Waddington—Science Today পত্রিকায় বলেছেনঃ

It happens rarely, perhaps once in a million animals or once in a million lifetimes. (P.-36)

এটা খুবই বিরলভাবে সংঘটিত হয়। সম্ভবত এক মিলিয়ন প্রাণীর মধ্যে একবার কিংবা এক মিলিয়ন জীবন-কালে একবার।

১৯৬৬ সনের World Book Encyclopaedia বলেছেঃ

Mutations rarely occur most genes mutate only once in 1,00,000 generations or more (vol-13, P-809; vol-9, P-194)

পরিব্যক্তি খুব বিরলভাবে ঘটে পরিবর্তিত বংশ শুধু ১,০০,০০০ বংশের মধ্যে বা ততোধিক।

এই সূত্র আরো বলেছেঃ

Researchers estimate that a human gene may remain stable for 2,500,000 years.

গবেষকগণ অনুমান করেছেন যে, একটি মানব বংশ ২,৫০০,০০০ বছর পর্যন্ত স্থায়ী ও অপরিবর্তিত থাকে।

সে যা-ই হোক, এই বিশ্বকোষ এ-কথাও বলছেঃ

Most Mutations are harmful. Some make it impossible for the cells in which they occur to develop and grow.

অধিকাংশ পরিব্যক্তিই ক্ষতিকর। তার কতক তো জীব-কোষের জন্য এটিকে অসম্ভব বানিয়ে দেয়, যার মধ্যে তা ঘটে উন্নত ও সমৃদ্ধ করার জন্য।

কিন্তু ব্যাপারটি কি সত্যিই তা-ই? এ বিরল সংঘটিত আঙ্গিক পরিবর্তনের অনেকগুলোই কি তুলনামূলকভাবে ক্ষতিকর হয়ে থাকে?

কৃত্রিম আঙ্গিক পরিবর্তনের চরিত্র নির্ধারণের উদ্দেশ্যে বিগত কয়েক শতকেরও বেশী-কাল ধরে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়েছে। তাতে বিশেষভাবে এ পর্যায়ে একই রকমের ফল লক্ষ্য করা গেছে। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮৬৬-১৯৪৫ সন পর্যন্ত Drosophila, Melanogaster ও অন্যান্যরা T. H. Morgan-এর কাজে যোগদান করেন। H. J. Muller এ কাজকে আরো অগ্রসর

www.nagorikpathagar.org

করে নিয়ে যান। তিনি ১৯৪৬ সনে এ-কাজের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্যে নোবেল পুরষ্কার লাভ করেন। এ সকল বিজ্ঞানীর গোটা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার ও নির্দিষ্ট। মূলার নিজেই বলেছেনঃ

Most mutations are bad, in fact good ones are so rare that we may consider them all as bad. (Time-Nov-II, 1946-p-46)

অধিকাংশ পরিব্যক্তিই খারাপ। বস্তুত, একটি ভালো পরিব্যক্তি এত বিরল যে, আমরা সবগুলোকে একই রকম খারাপ মনে করতে পারি।

The Mechanism of Evolution গ্রন্থে Doweswell-ও এ কথা স্বীকার করে বলেছেনঃ

Of the many mutants detected in the laboratory, all are either recessives or 'semi-dominants' and the majority cause harmful physiological effects. Hardly any have ever been observed which could possibly be beneficial to an organism under wild conditions. (P-30)

গবেষণাগারে বহু পরিব্যক্তিই আবিষ্কার করা হয়েছে। তার সবই হয় পশ্চাদাপসারণমূলক কিংবা প্রায় প্রধান প্রবল। এবং অধিকাংশই ক্ষতিকর হয়েছে শারীরবৃত্তিক প্রতিক্রিয়া রূপে। এমন খুব কমই কখনও দেখা গেছে, যা সম্ভবত উপকারী হতে পারে বলে ধারণা করা যায়। একটি দেহ কাঠামোর পক্ষে আপোষমানা অবস্থায়।

ডব্‌ঝানস্কি আরো স্বীকার করেছেনঃ

'A majority of mutations, both those arising in laboratories and those stored in natural populations, produce deteriorations of the viability, hereditary diseases and monstrosities. Such changes, it would seem, can hardly serve as evolutionary building blocks.' (Genetis and the Origin of Species-pp-73)

বেশীর ভাগ পরিব্যক্তি গবেষণাগারে হয়ে থাকুক বা প্রাকৃতিক জনতার মধ্য থেকে সংগৃহীত হোক—উভয় ক্ষেত্রেই তা হয় জীবনী শক্তির পতনে। বংশানুক্রমিক রোগে এবং ঋতুশ্রাবে, এধরনের পরিবর্তন কোন বিবর্তনমূলক নির্মাণ কাজে সহায়ক হতে পারে বলে মনেই করা যায় না।

কৃষি বিজ্ঞানে পারদর্শী Dr. W. E. Lammerts গোলাপ ফুল সংক্রান্ত তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে নিজেই বলেছেনঃ

My own work on neutron radiation of roses describes a technique by which we can induce 50 radiated buds of

www.nagorikpathagar.org

Queen Elizabeth, more mutations than could hitherto be found in a lifetime of searching among several million rose plants grown annually from non-radiated buds, without exception, all mutations induced were found to be defective or weaker than Queen Elizabeth.....biologically they would hardly compete because of reduced vigor and partial sterility. (The Creationist, December 1964. P-10)

গোলাপ ফুলে নিউট্রন বিকিরণ পর্যায়ে আমার নিজের গবেষণা একটি টেকনিক বলে দিয়েছে। যদ্দারা আমরা কুইন এলিজাবেথের ৫০টি বিকিরিত কুঁড়ি ঘটাতে পারি। তা অনেক বেশী পরিব্যক্তি অবিকিরিত কুঁড়ি থেকে প্রতি বৎসর বহু বিলিয়ন গোলাপ গাছ গজিয়ে উঠে তার মধ্যে একটি অনুসন্ধান কাজের সময়ের মধ্যে সম্প্রতি হয়ত দেখা যেতে পারে। ব্যতিক্রম ছাড়াই প্রবৃত্তি করা সমস্ত পরিব্যক্তি ত্রুটিপূর্ণ দেখা যাবে। কিংবা কুইন এলিজাবেথের তুলনায় দুর্বলতর।.....জীবতাত্ত্বিকভাবে তা প্রতিযোগিতা করতে খুব কমই পারে স্বাধীন প্রাণশক্তি এবং আংশিক বন্ধ্যাত্বের কারণে।

১৯৬৩ সনের ১৭ই জানুয়ারীর New Zealand Herald পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছেঃ

Whether the mutations are natural or induced by some artificial means such as radiation..... the evidence today suggests that much more than 99 percent of mutations are undesirable. (p-16)

পরিব্যক্তি কি স্বভাবসম্মত কিংবা কতক কৃত্রিম উপায়ে প্রবৃত্ত করা—যেমন বিকিরণ.....আজ প্রমাণাদি বলে যে, শতকরা ৯৯ ভাগেরও বেশী পরিব্যক্তি অবাঞ্ছনীয়।

অধ্যাপক এইচ. জে. মূলার-ও একথা বলেছেন। Radiation and Human Mutation শীর্ষক একটি প্রবন্ধে—যা Scientific American (November 1955) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল—লিখেছেনঃ

In more than 99 percent of cases the mutation of a gene produces some kind of harmful effect, some disturbances of function. (p-58)

শতকরা ৯৯ ভাগেরও বেশী ক্ষেত্রে একটি বংশের পরিব্যক্তি কতগুলো ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, কাজের মধ্যে কিছু বিশৃঙ্খলারও সৃষ্টি করে।

www.nagorikpathagar.org

১৯৬৩ সনের Progress and Decline গ্রন্থে Professor Hugh Miller লিখেছেনঃ

The relative rarity of these aberrant or mutant changes, together with their usually maladaptive and more often than not lethal effects upon development, does not incline us to assign to them an important role in the maintenance of group adaptability..... it should be observed that the great importane currently attached to genemutations as a factor in evolutionary history is a part of the result of erroneous expectations initially aroused by their discovery. (p-38)

এসব বিপথগামী বা পরিব্যক্তিমূলক পরিবর্তনের আপেক্ষিপ বিরলতা—সেই সঙ্গে সাধারণভাবে খারাপ খাপ খাওয়ানো উন্নয়নের উপর অধিক প্রাণঘাতী প্রতিক্রিয়া আমাদেরকে নত করে না দলীয় অভিযোজন সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে তাকে আপন করে নিতে।.....লক্ষ্যণীয় যে, বিবর্তনী ইতিহাসে একটি কারণ হিসেবে সাম্প্রতিক কালে বংশধারার পরিব্যক্তির উপর একটি বিরাট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এটা হচ্ছে ভ্রান্তিপূর্ণ আশা-আকাঙ্ক্ষার একটি ফসল—যা তাদের আবিষ্কারের শুরুতে উত্থিত হয়েছিল।

জীবন্ত বস্তুর জীবাণুরস জটিল ভারসাম্যপূর্ণ। তাই তার যে কোনরূপ ভাঙনই বিশ্লিষ্ট ও বিশৃংখলকরণের দিকে নিঃসন্দেহে চালিত করবে। জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকীতে এর একটা বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে। ১৯৪৫ সনে এসব শহরের উপর যে আণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়, তা অসংখ্য আঙ্গিক পরিবর্তন সূচিত করেছে।

কিন্তু তার কোনটিই কল্যাণমূলক ছিল না। অতএব তাকে ক্রমবিকাশের দিকে অগ্রগতি সৃষ্টিকারী বলে অভিহিত করা কিছুতেই চলে না। তার ফলে বহু মানুষের মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়েছে, তা অনেককে বিকলাঙ্গ করে দিয়েছে। আবার বহু কোটি মানুষকে মৃত্যুর করাল গ্রাসে নিক্ষেপ করেছে নিমেষের মধ্যে। বৈদ্যুতিক প্রতিফলন থেকে নিজেদেরকে বাঁচানোর জন্যে বৈজ্ঞানিক-গবেষকরা বর্তমানে এত বড় পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন শুধু এ কারণেই।

রাসায়নিক দ্রব্যাদিও অনেক আঙ্গিক পরিবর্তন সাধনের কারণ হতে পারে—যেমন বেদনানাশক ওষুধ-thalidomide ব্যবহারে আমরা প্রত্যক্ষ করে থাকি। এগুলোর ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট আঙ্গিক পরিবর্তনসমূহ কি কল্যাণকর প্রমাণিত হয়েছে?.....না, বরং ফল হয়েছে সম্পূর্ণ বিপরীত। গর্ভাবস্থায় এ ধরনের

www.nagorikpathagar.org

ওষুধ সেবন ভয়ঙ্করভাবে বিকলাঙ্গ শিশু জন্ম দিয়েছে। তাদের অনেকে জন্মেছে হাত-পা ছাড়াই।

রাসায়নিক দ্রব্যাদি মাছ উন্নয়নে সহায়ক হয়েছে। কিন্তু তা দুটো চক্ষু নয়-এক চক্ষু-বিশিষ্ট মাছ উৎপাদন করেছে। তা হলে এক চক্ষু-বিশিষ্ট মাছ কি বাঁচার জন্যে অধিক যোগ্য? এ ধরনের মাছের সহযোগী স্বাভাবিক মাছের তুলনায় এগুলোর বাঁচার যোগ্যতা কি অধিক? যমজ শিশুরা পরিবর্তনসম্পন্ন জীব। তারা কি স্বাভাবিক মানুষের তুলনায় বাঁচার জন্যে অধিক উপযোগিতা পেয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে? মাছ উৎপাদন ক্ষেত্রসমূহে (hatchery) দুই মাথা বিশিষ্ট মাছও কৃত্রিম উপায়ে ডিম ফুটিয়ে পাওয়া গেছে। কিন্তু পর্যবেক্ষকরা এ বিষয়ে অবহিত যে, সেগুলোকে জলপ্রবাহে ছেড়ে দেয়া হলে ওরা শিগ্‌গীরই মরে যাবে। কেননা Mutation—কৃত্রিম উপায়ে সাধিত পরিবর্তন সেগুলোকে হীন ও নগণ্য বানিয়ে দিয়েছে এবং তাই সেগুলো বাঁচার জন্যে খুবই কম যোগ্যতাসম্পন্ন।

পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে আরও অনেক প্রকারের পরিবর্তন—Mutations উদ্ভাবিত হয়েছে। পালকহীন মোরগ রয়েছে, অনেক কীট-পতঙ্গ রয়েছে, যাদের চক্ষুর রং অস্বাভাবিক ধরনের। অনেক দেহ সংস্থার বাহুতে ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আকার আকৃতিতে অনেক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। কিন্তু বাস্তব দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যাবে, এসবের খুব কম পরিবর্তনই অনুকূল ও কল্যাণকর প্রমাণিত হতে পেরেছে।

জীবন্ত জিনিসের প্রজনন-যন্ত্রে সৃষ্ট দুর্ঘটনার সাথে তুলনা করা হয়েছে কৃত্রিমভাবে আঙ্গিক পরিবর্তন সাধনকে। আসলে তা একটি স্বয়ংচালিত যন্ত্রযানের ধ্বংসাবশেষের মতো। তা কিছু নির্মাণ করে না। দুর্ঘটনা কখনো উন্নয়ন বলে বিবেচিত হতে পারে না। তা আকস্মিকভাবে সৃষ্ট চরম দুর্দশা বিশেষ। একটি কম্পিউটার যন্ত্রে একটি জটিল ঘড়ি ছেড়ে দিলে কিংবা একটি রেন্‌চ নিক্ষেপ করলে তার কার্যসাধনে উন্নতি হবে বলে মনে করা খুবই হাস্যকর ব্যাপার।

সময়ের দীর্ঘতার বিশালতা কিংবা সহস্র-লক্ষ বছরের নিকট আবেদন-নিবেদন জানালে আসল অবস্থাতে কোন পরিবর্তন সাধিত হবে না। গতকাল যা ছিল অসম্ভব, তা অসম্ভব আজও এবং তা অসম্ভব থাকবে আগামীকালও; অন্তত এক্ষেত্রে। স্বয়ংচালিত যন্ত্র-যানের দুর্ঘটনা তার যন্ত্র-ব্যবস্থায় গতকাল যদি কোন উন্নয়ন সাধন করতে সক্ষম না হয়ে থাকে, তা কি আজ, কি আগামীকাল সেই উন্নয়ন সাধন করতে পারবে? এমনকি, আমরা যদি মেনেও নিই যে, একশত দুর্ঘটনার মধ্যে অন্তত একটা স্বয়ংচালিত যন্ত্রযানে অবশ্যই উন্নয়ন সাধন করে থাকবে, তাহলে অবশিষ্ট দুর্ঘটনাকে কি দোষযুক্ত ধরে নিতে হবে? আর ৯৯টি দুর্ঘটনাই যদি দোষযুক্ত ও ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়, তাহলে আর থাকবে কি?.....এরপরও যদি তা চলতে পারে এবং একটি স্বয়ংচালিত যন্ত্র তৈরী হয়েই থাকে, তাহলেও তা হবে অত্যন্ত নিম্নমানের।

www.nagorikpathagar.org

জীবন্ত জিনিসের ক্ষেত্রেও এ কথাই সত্য। সময়ের এক বিশাল ক্ষেত্রে দেহ-সংস্থাগুলোর কাতার ৯৯টি ক্ষতিকর পরিবর্তনের দ্বারা আহত হবে এবং বেঁচে থাকার জন্যে তা কম যোগ্য বানাবে। অসংখ্য বংশানুক্রমিকতার মধ্য দিয়ে তা যদি বেঁচেও যায়, তবু তা হবে নিছক দুর্বলতম প্রজাতি এবং তা নিশ্চয়ই কোন নবতর জীবন প্রজাতিতে রূপান্তরিত হবে না।

এখানে আমাদের সামনে অন্য একটা সত্য উদঘাটিত হচ্ছে। তা অবশ্যই বিবেচনা করে দেখতে হবে। কৃত্রিম উপায়ে আঙ্গিক পরিবর্তনের—Mutation—এর হাজার হাজার পরীক্ষা-নিরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতাও আজ পর্যন্ত প্রাণী বা উদ্ভিদ জগতে কোন নবতর প্রজাতির উৎপাদন করতে পারে নি। শুধু তা-ই নয়, কৃত্রিম উপায়ে আঙ্গিক পরিবর্তনগুলো চিরকালই একটা মৌল জনন-প্রজাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে—ঠিক তাতে, যাতে উদ্ভিদ বা প্রাণী মূলতই উদ্ভূত হয়েছে। Drosphila-র ব্যাপারে সাধিত বহু কৃত্রিম আঙ্গিক পরিবর্তন যে মৌমাছি উৎপন্ন করেছে, তা ওদের পূর্ববংশীয় প্রজাতিরই অন্তর্ভুক্ত—যদিও ওদের আকার-আকৃতি এবং রং ও বর্ণ বিভিন্ন কৃত্রিম উপায়ে সাধিত আঙ্গিক পরিবর্তন—কিংবা তার বিশাল সারি ভিন্নতর কোন দেহ সংস্থা রচনা করতে পারে নি আজ পর্যন্ত।

এসব বাস্তব তথ্য নিরপেক্ষভাবে বিচার-বিবেচনা করে দেখলে যে যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায়, তাহল, কৃত্রিম আঙ্গিক পরিবর্তন স্বভাবতই কোন ক্রমবিকাশমূলক কার্যক্রম নয়। বরং তা বংশগত মর্যাদা হানিকর মাত্র এবং বেশ কৌতুক-বহ। The Encyclopaedia Britannica ক্রমবিকাশবাদ সমর্থন করেও স্বীকার করেছেঃ

> Although combinations, reshufflings and duplications of existing genes may give rise to many mutations, they can hardly account for the vast changes which have taken place in organic evolution (1946-vol-8-p-922)

যদিও সংযোগ সাধন, পুনর্গঠন ও অনুলিপিকরণ বর্তমান থাকা বংশাবলীর বহু পরিব্যক্তিকে উঁচিয়ে দিতে পারে তবুও তা ব্যাপক পরিবর্তন রূপে গণ্য হওয়া খুব শক্ত—যা দৈহিক বিবর্তনে স্থান পেয়েছিল বলে বোঝা যাবে।

'প্রাকৃতিক নির্বাচন'

বস্তুত কৃত্রিম উপায়ে আঙ্গিক পরিবর্তনের কোন অনুকূল প্রবণতা কোথাও নেই। বরং তার পরিবর্তে অননুকূল প্রবণতা-ই সর্বত্র বিরাজিত। সর্বত্র একটা নিম্নগতি, বংশবিকৃতির প্রবণতা-ই প্রবলভাবে বর্তমান। তাহলে এ সত্য তথ্যের

www.nagorikpathagar.org

ভিত্তিতে আধুনিক ক্রমবিকাশ মতাদর্শের অপর অংশের পরিণতি কি দাঁড়ায়? ...সে অংশটি হল Natural selection.....'প্রাকৃতিক নির্বাচন'।

ডি. বিয়ার তাঁর Charles Darwin নামক গ্রন্থে লিখেছেন Natural selection.....controls evolution.

'প্রাকৃতিক নির্বাচন—ক্রমবিকাশকে নিয়ন্ত্রিত করে।

একথার মাধ্যমে দাবি করা হয়েছে যে, 'প্রকৃতি' কল্যাণকর কৃত্রিম আঙ্গিক পরিবর্তনকে সব সময় 'বাছাই' বা 'নির্বাচন' করতে থাকে। আর দোষযুক্ত পরিবর্তনকে করতে থাকে প্রত্যাহার। ফলে এ ধরনের প্রজাতীয় জীবন পরিণামে অন্য এক ধরনের হয়ে দাঁড়ায়। এবং তা হয় উন্নত ধরনের প্রজাতীয় জীবন। কিন্তু শতকরা ৯৯ ভাগেরও বেশী 'মিউটেশন' যখন দোষযুক্ত, তখন 'প্রকৃতির' জন্যে 'বাছাই' বা 'নির্বাচন' করার অপেক্ষায় আর কি-ই বা অবশিষ্ট থাকবে? একটা দেহ সংস্থা যদি কল্যাণকর 'মিউটেশন' দিয়ে থাকে—যা অবশ্য কোনক্রমেই সমর্থনীয় নয়—তবে তারপরই সেখানে দোষযুক্ত 'মিউটেশন' এসে কাতারে দাঁড়িয়ে গেছে। 'প্রকৃতি' যদি কিছু করে-ই, তবে তা এ অঙ্গ সংস্থাকে বাতিল ও প্রত্যাহার করে দেবে। কেননা তা তো অনেক হীন মানের জিনিস। আর অপেক্ষাকৃত হীন মানের জিনিস কখনই টিকে থাকতে পারে না জীবন-সংগ্রামের ঘাত-প্রতিঘাতে। 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' তো শেষ পর্যন্ত ক্রমবিকাশের শত্রু হয়ে দাঁড়াবে, ঠিক যেমন 'মিউটেশন' গুলো ক্রমবিকাশের পরিপন্থী।

'প্রাকৃতিক নির্বাচন' কিংবা যোগ্যতমের উদ্বর্তন তো কোন নতুন জিনিস উৎপাদন করে না। কেননা একটা জীবন্ত জিনিসই তো বেঁচে গেছে, বেঁচে থাকে। কিন্তু তার মানে তো এ নয় যে, তা ক্রমবিকাশ লাভ করেছে। একটি মুরগি যদি এক ডজন বাচ্চা দিয়ে থাকে আর তার কয়েকটি যদি চিল ছোঁ মেরে নিয়ে উড়ে গিয়ে থাকে, তা হলে অবশিষ্টরা ক্রমবিকাশ লাভ করেছে বলে কি দাবি করা যায়,আর করলে তা কি কখনো যুক্তিসঙ্গত হতে পারে? না, এটার সোজা অর্থ হল, কতক বাচ্চা বেঁচে গেছে, আর কতক মরে গেছে,নিহত হয়েছে। 'প্রকৃতির' এ 'নির্বাচন' মুরগীর বাচ্চাগুলোকে কোন নতুন জিনিস বানিয়ে দেয়নি তো।

এ কারণে 'মিউটেশন, ও 'প্রাকৃতিক নির্বাচন'-এর সংমিশ্রণকে ক্রমবিকাশের মাধ্যমে বা ব্যবস্থা (mechanism) বলে মেনে নিতে খোদ ক্রমবিকাশবাদীরাও অস্বস্তি ও অমত প্রকাশ করেছেন। Science Today বইতে সর্বজনমান্য ক্রমবিকাশবাদী Sir James Gray বলেছেনঃ

> সব জীব-বিজ্ঞানীই সমানভাবে আশ্বস্ত নন। কতক মনে করেন, উপরিউক্ত ধরনের যুক্তি উপস্থাপন অস্বস্তিকরভাবে এমন একটা কথার উদ্রেক করে ও মেনে নিতে বাধ্য করে যে, বিপুল সংখ্যক বানর যদি একটা যথেষ্ট দীর্ঘ সময়

www.nagorikpathagar.org

ধরে টাইপরাইটার চালাতে থাকে, তাহলে তার ফলে অনিবার্যভাবে একটি এনসাইক্লোপিডিয়া তৈরী হয়ে যাবে। এধরনের ব্যাপার হয়ত কল্পনা করা যায়, কিন্তু কোন সুস্থ মানুষ বাস্তব জীবনে এ ধরনের জিনিস চিন্তা করতেও প্রস্তুত হতে পারে না।

'প্রাকৃতিক নির্বাচন'কে আমাদের হয় ক্রমবিকাশবাদের মাধ্যমে বা ব্যবস্থার দিকে একমাত্র লভ্য পথপ্রদর্শকরূপে মেনে নিতে হবে, এবং একথা—স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত থাকতে হবে যে, তা আন্দাজ-অনুমানের অনেকগুলো উপাদানের সাথে জড়িত। অথবা আমাদের হাড়ে-মজ্জায় অনুভব করতে হবে যে, প্রাকৃতিক নির্বাচন কতগুলো এলোমেলো 'মিউটেশন' বা পরিবর্তন সৃষ্টি করে, কেবল সুযোগের উপর নির্ভর করে থাকে। আমরা যদি আঙ্গিক ক্রমবিকাশকে প্রকৃতির সুযোগের খেলার ফল বলে মনে করে নিই, তাহলে তার এতগুলো বিজয়ী হাত থাকার কথা মনে করতে আমাদের পক্ষে নিতান্তই অস্বস্তিকর মনে হবে। কিন্তু তোমার ধারণা যতটা ভালো, আমার ধারণাও ততটা-ই।'

সেই একই বইতে ক্রমবিকাশবাদী C. H. Waddington-এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণী বংশ (animal genetics)-এর অধ্যাপক—মিউটেশন ও প্রাকৃতিক নির্বাচন সম্পর্কে বলেছেনঃ

This is really the theory that if you start with any fourteen lines of coherent english and change its one letter at a time, keeping only those things that still make sense, you will eventually finish up with one of the sonnets of Shakespeare.....it strikes me as a lunatic sort of logic, and I think we should be able to do better. (p-38)

এটা বাস্তবিকই একটি থিওরী যে, তুমি যদি কোন সহজ ইংরেজীর যে কোন চতুর্দশপদী শুরু কর এবং তাকে একই সময় একটি অক্ষরে পরিবর্তন কর শুধু সেই জিনিসগুলো রেখে যা এখনও কোন অর্থ দেয় তাহলে তুমি ফল স্বরূপ শেক্সপিয়রের একটি সনেট দিয়েই শেষ করতে পারবে। এটা আমার নিকট পাগলাগারদীয় ব্যাপার মনে হয়েছে। এবং আমি মনে করি, আমাদের এর চেয়েও ভালো করতে পারা উচিৎ।

ক্রমবিকাশবাদী জীববিজ্ঞানী Rostand যা বলেছেন, তা এখানে স্মরণীয়ঃ

No, decidedly, I cannot make myself think that these 'slips' of heredity have been able, even with the cooperation of natural selection, even with the advantage of the immense periods of time in which evolution works of life, to build the entire world,

www.nagorikpathagar.org

with its structural prodigality and refinements, its astounding adaptations. (The Orion Book of Evolution P-79)

না, চূড়ান্ত কথা, আমি একথা মনে করতে নিজেকে প্রস্তুত করতে পারি না যে, বংশানুক্রমিকতার এই ভুল করা পিছলে পড়াটা সম্ভব হয়েছিল—এমন কি প্রাকৃতিক নির্বাচনের সাহায্যেও; এমন কি সময়ের বিশাল অবসরেও যখন জীবনের বিবর্তন কার্য গোটা বিশ্ব নির্মাণে তার কাঠামোগত অসাধারণ প্রতিভা ও বিশুদ্ধতা সহ এর বিস্ময়কর অভিযোজন।

এটাও আশ্চর্যজনক যে, George Gaylord Simpson তাঁর The Geography of Evolution গ্রন্থে ১৯৬৫ সনে লিখেছেনঃ

Search for the cause of evolution has been abandoned. It is now clear that evolution has no single or simple cause. (P-17)

বিবর্তনের কারণ সন্ধান পরিত্যক্ত হয়েছে। এখন এটা সুস্পষ্ট যে, বিবর্তনের কোন একক বা সহজ কারণ ছিল না।

এ সবই কি ক্রমবিকাশের সত্যতা প্রমাণের জন্যে যথেষ্ট সাক্ষ্য হতে পারে?....পূর্ণ দৃঢ়তা ও নিশ্চয়তার সঙ্গে বলা চলে যে, তা নয়। খুব বেশী হলেও 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' কিংবা 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' শুধু শক্তিশালীকে দুর্বল থেকে বিচ্ছিন্ন করে মাত্র। এতটুকুই বলা যায়। কিন্তু কোন নব প্রাজাতীয় প্রাণী কখনো শুধুমাত্র বেঁচে থাকার ফল নয়। উপরন্তু জীবন্ত বস্তু বা প্রাণীর কোন নতুন প্রজাতি মিউটেশন-এর ফল হতে পারে না। বস্তুত ক্রমবিকাশবাদ বাস্তব ও যুক্তিগ্রাহ্য কোন প্রমাণের অভাবে সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হয়ে গেছে।

www.nagorikpathagar.org

বংশানুক্রমিকতা পরিবার-প্রজাতির স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষক

বংশানুক্রমিকতা সংক্রান্ত যাবতীয় বিস্ময়কর সত্য তথ্যের ভাঁজ খুলবার এখনকার বড় হাতিয়ার হল বিজ্ঞান। বিজ্ঞান-ই আমাদের সামনে এ তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত করেছে যে, ক্রমবিকাশবাদের প্রবক্তাদের পরিকল্পিত মিউটেশনই বল, আর প্রাকৃতিক নির্বাচনই বল—তার কোনটিই পূর্ববর্তী কোন প্রজাতীয় পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর কোন পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে সক্ষম নয়।

বিজ্ঞান এখন এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট ধারণা পেশ করেছে যে, বংশ বৃদ্ধি সংক্রান্ত সংজনন বিধান 'অনুরূপ প্রজাতি সৃষ্টির' কাজ সম্পূর্ণ করে ক্রমাগত ও অবিচ্ছিন্নভাবে এবং এ ব্যবস্থাপনা D.N.A. নামক সার দ্বারাই কাজ করতে বাধ্য। আর D.N.A. হলো Deoxyribonucleic acid-এর সংক্ষিপ্ত নাম। জীবন্ত বস্তুগুলোর মধ্যে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বিধান সতত কার্যকর করে রাখে D.N.A.। এটি স্মৃতিলোকে সংগঠনশীল অণুবীক্ষণ কম্পিউটারের মতো। তা 'পরিকল্পনাসমূহের' কল্পিত সংখ্যা সঞ্চয় করে রাখে এবং সঠিক সময়ে ও সঠিক স্থানে প্রত্যেক উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহের কাঠামো ও কোষ গড়ে তোলার নির্দেশ জারী করে। এই DNA হলো এমন এক রাসায়নিক সংমিশ্রণ, যা দিয়ে জীনস্ তৈরী হয়। বিজ্ঞান লেখক Rutherford Platt এ সম্পর্কে বলেছেনঃ

'তোমার ব্যক্তিগত DNA তোমার সমগ্র দেহ-সত্তায় প্রায় ষাট হাজার বিলিয়ন কণিকায় ছড়িয়ে রয়েছে। এটাই হল একটি পূর্ণবয়স্ক মানবদেহের জীবন্ত কোষের গড় সংখ্যা।

DNA অণু মূলতই এবং বিস্ময়করভাবেই খুব সহজ সরল সংগঠন। তা দুটি পাক খাওয়ানো ফিতার মত সারিবদ্ধ অণু সমন্বিত, নিয়মিত ফাঁকসহ আড়াআড়িভাবে কুণ্ডলি পাকানো খণ্ডগুলোর সাথে সংযুক্ত—ঠিক সর্পিল সিঁড়ির মতো।..... DNA-এর আকৃতি-সংগঠনের দীর্ঘ সিলিন্ডারের একটা যৌক্তিকতা ও নিয়ম নীতি রয়েছে। তা একে একটা শক্তি ও যোগ্যতা দান করে চৌম্বক শক্তিসম্পন্ন রেকর্ড ফিতার মতো—সারা জীবনব্যাপী প্রয়োজনীয় বিরাট সংখ্যক পরিসংখ্যান সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে।

DNA ফিতাগুলি মূলত চিনি ও আম্লিক লবণ বিশেষ (Phosphate)। সর্পিল সিঁড়ির আড়াআড়িভাবে সজ্জিত খণ্ডগুলো হচ্ছে নাইট্রোজেন কম্পাউণ্ড। ওদেরই

www.nagorikpathagar.org

বিভিন্ন রকমের অনুক্রম প্রতিফলিত হয় DNA-এর ফিতার উপর। তা এমনসব ঘটনার দিকে পরিচালিত করে যা দেহকে ক্রমবৃদ্ধি দান করে। —অতি সামান্য পার্থক্য অপেক্ষা অনেক বেশী চুম্বক শক্তিসম্পন্ন ফিতার উপর যেমন প্রতিধ্বনিত হয় সংগীতের ধ্বনি শ্রেণীবদ্ধভাবে।

ডঃ বিড্‌ল বলেছেন, 'একটি একক ব্যক্তির কোষ সংক্রান্ত রীতিভুক্ত DNA নির্দেশাবলী যদি ইংরেজীতে সাজানো হয়, তাহলে তা এক হাজার খণ্ডের বিশ্বকোষ পুরোপুরি ভরে দেবে। মূল কেন্দ্রস্থলে বসে DNA যখনই নির্দেশ দেবে, তখনও তা ক্রমবৃদ্ধির, হজমের, হৃৎকম্পের, চিন্তা করার ও অনুভব করার প্রেরণা দান করবে। তা তার গঠন পরিকল্পনা অনুসরণ করে চলে, যা সময়ের গলিপথকে নিচের দিকে টেনে নেয়। তা সে পরিকল্পনায় কোন রদবদল করে না। তবে কোষের বহির্দেশ থেকে তাড়িত চুম্বক দ্বারা সঞ্চারিত শক্তি বা দুর্ঘটনার ফলে কোন পরিবর্তন চাপিয়ে দেয়া হলে ভিন্ন কথা। (Readers Digest, October 1962, PP-144, 148)

কাজেই DNA একটি নির্মাণ-বিধি রচনা করে ও গড়ে তোলে। রচনা করে একটি ব্লু-প্রিন্ট, একটি টেপরেকর্ডিং। তা-ই সমস্ত জীবন পদ্ধতিকে তার মৌল প্রজাতীয় সীমার মধ্যে আটকে রাখে। তা কোনরূপ পরিবর্তনের অনুমতি দেয় না, যতক্ষণ না কোন দুর্ঘটনা কর্তৃক কিছু চাপানো হয়—যেমন কোষবহির্ভূত রশ্মি বিচ্ছুরণ। মিউটেশন এ পর্যায়েই গণ্য। এবং আমরা যেমন দেখেছি, তা উন্নতি বিধান করতে পারে না; বরং একটি দেহ-সংস্থাকে তার জন্যে মূলগতভাবে নির্মিত চৌহদ্দির মধ্যে আটকে রাখে। এ চৌহদ্দি থেকে বিচ্যুত ও স্খলিত হলে ক্ষতি না হয়ে পারে না। ১৯৬৩ সনের অক্টোবর মাসের Scientific American বলেছেঃ

If the code is indeed universal, as these and other results suggest, in implies that it has been fixed throughout most of organic evolution, in other words; that it is not subject to mutation.

নীতিমালা যদি বাস্তবিকপক্ষেই বিশ্বব্যাপক হয়—যেমন এগুলো ও অন্যান্য ফলাফল প্রকাশ করছে—তাহলে তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তা অধিকাংশ আঙ্গিক ক্রমবিকাশকে সর্বাংশে আঁটো ও নিশ্চল করে দিয়েছে। অন্য কথায়, এটা মিউটেশনকে চলতে দেয় না।

DNA তার প্রজাতীয় সীমার মধ্যে কতটা বৈচিত্র্য অনুমোদন করে? ১৯৬৬ সনের Science Year এ বিষয়ে বর্ণনা দিয়েছেঃ

সুপ্রজনন বিদ্যা সকল প্রজাতির বংশানুক্রমিকতা সংক্রান্ত তথ্যাদি DNA অণুতে সংস্থাপিত যবক্ষারজান ভিত্তিসমূহের অনুবর্তিতা বা অনুক্রমের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

একটি জীব বা বংশের এক হাজার কিংবা ততোধিক একক রয়েছে যা একটি লম্বা সুতোয় পরস্পর সংযোজিত। বংশপরম্পরা সংযোজিত, আবর্তিত হয়ে ক্রোমোসোম (Chromosome) তৈরী করে। একটি মানবকোষের হাজার হাজার জীন্‌স রয়েছে, যা ২৩ জোড়া ক্রোমোসোমে জড়িভূত। হাজার হাজার জীন্‌স—প্রত্যেকটির রয়েছে সহস্র লক্ষ কিংবা ততোধিক একক। একটি প্রজাতির চতুঃসীমার মধ্যে বৈচিত্র্যের বিপুল সম্ভাবনা রচনা করে। কিন্তু তা কেন হয়? মানব পরিবার সম্পর্কে বলা যায়, সেখানে দুজন মানুষও দেখতে একই রকম—তেমনটা বলা খুব কমই সম্ভব। দুনিয়ায় তিন হাজার মিলিয়নের-ও অধিক লোকসংখ্যা এখন রয়েছে। তাদের এ কথিত হাজারো বৈচিত্র্য সত্ত্বেও তারা মৌল মানবীয় প্রজাতিসীমার মধ্যেই রয়েছে। তা ছাড়িয়ে ছাপিয়ে বাইরে চলে যায় নি কেউ।

DNA এর মত একটা বিস্ময়কর যান্ত্রিকতা-ভবিষ্যতে উন্নয়নের জটিল 'ব্লু প্রিন্ট' সহ একটা আশ্চর্যজনক সংগঠন। আমরা যখন দেখি, ব্লু প্রিন্ট-ই একটি সুন্দর পুল, প্রাসাদসমূহ ও বড় বড় কল-কারখানা নির্মাণের জন্যে দায়ী। কিন্তু সে সব কোন প্রতিভাধর পরিকল্পনাকারী ব্যতীতই সম্ভবপর হয়েছে বলে আমরা ধারণা করতে পারি কি?—তাহলে তার চাইতেও অধিক জটিল DNA ব্লু প্রিন্ট সম্পর্কে আমরা অনুরূপ সত্য ভাষণে প্রস্তুত হই না কেন?

বিভিন্ন জীবন্ত জিনিসের DNA-এর রাসায়নিক সংমিশ্রণ এমন আর একটি বিষয়ে উপলব্ধি লাভে আমাদের সাহায্য করে, যা ক্রমবিকাশবাদের প্রমাণ হিসেবে পরোক্ষভাবে ঘন ঘন উল্লেখ করা হয়। তা হল দেহ কাঠামোর সাদৃশ্য। দেহসংগঠন সংক্রান্ত বিদ্যা (Anatomy)-র তুলনামূলক অধ্যয়ন প্রমাণ করে যে, জীবন্ত জিনিসের বহু প্রজাতির প্রায় একই রকমের দেহকাঠামো রয়েছে। টিকটিকির (Lizard) সামনের দিকে দুটি পা, পাখিকুলের দুটি ডানা, লেজবিহীন বানরকুলের দুটি বাহু রয়েছে। কেউ যদি এদের প্রত্যেকের কঙ্কাল সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে দেয়, তাহলে তার নক্‌শায় পূর্ণসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যাবে। ক্রমবিকাশবাদীরা এর-ই ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, ক্রমবিকাশ অবশ্যই সংঘটিত হয়েছে। এবং একজন অপরজন থেকে বের হয়ে এসেছে।

কিন্তু DNA অণু এ-কথা প্রমাণ করে যে, বিভিন্ন জীবন্ত সৃষ্টি মূলগতভাবে একই রসায়ন থেকে গড়ে উঠেছে। Rutherford Platt এ-কথাটি তুলে ধরেছেন এ ভাষায়ঃ

These DNA specks have a similar chemical composition art about the same size and look very much like those in your dog or in a housefly, a bread mold or blade of grass. Yet somehow the specks are coded to make every living thing

www.nagorikpathagar.org

different from every other living thing. They make dogs different from fish or birds, bread mold from apple trees, elephants from mosquitoes

(Reader's Digest, October-1962, P-144)

এই D.N.A. চিহ্নের অনুরূপ রাসায়নিক সংমিশ্রণ রয়েছে। সেগুলো সমান আকারের এবং দেখায় ঠিক যেমন তোমার কুকুরের মধ্যে রয়েছে।.....কিংবা ঘাসের ফলকে। তা যেমন করেই হোক, চিহ্নগুলো নীতিবদ্ধ প্রত্যেক জীবন্ত জিনিসকে অন্য সব জীবন্ত জিনিস থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করে রাখবে। ওরাই কুকুরকে মাছ থেকে বা পাখি থেকে ভিন্ন করে রাখে, ব্রেডমোল্ডকে আপেল গাছ থেকে, হাতিকে মশা থেকে।

মোট কথা, সমস্ত দেহসংস্থা একই প্রকারের মৌল উপকরণ থেকে সংগঠিত হয়ে ওঠে। এরা সবাই একই গ্রহে বসবাসকারী এবং একই স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক আইন দ্বারা প্রভাবিত। এদের অনেকটা একই ধরনের আকার-আকৃতি ও নাক-নক্‌শা হওয়াটাই কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এদের মধ্যে ব্যবধান ও পার্থক্য রয়েছে। সে পার্থক্যই কতক জীবকে বায়ুলোকে উড়ে বেড়াবার, মাটির বুকে চলাচল করার এবং অন্যদের পানিতে সাঁতার কাটার যোগ্যতা দান করেছে। এদের বিস্ময় উদ্রেককারী DNA ওদের মৌল প্রজাতীয় সীমার মধ্যে এ পার্থক্যকে গ্রাহ্য করে। আর এ পার্থক্যই ওদের মধ্যে একটা বিশাল দুর্লংঘ্য ব্যবধান রচনা করে দিয়েছে।

দুর্লংঘ্য ব্যবধান

কিন্তু মানুষ ও যে-কোন প্রাণীর মধ্যকার যে পার্থক্য, তার চাইতে অধিক পার্থক্য অন্য কোন ক্ষেত্রেই নেই। এ দুয়ের মধ্যে এমন বিরাট ব্যবধান বিদ্যমান, যা ওদের পরস্পরকে স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। বিশেষ করে মানস শক্তির (Mental ability) ক্ষেত্রে এ ব্যবধান কল্পনাতীত এবং দুর্লংঘ্য।

পৃথিবীর বুকে অবস্থিত জীবকূলের মধ্যে একমাত্র মানুষই এমন সৃষ্টি যারা স্বীয় জ্ঞানকে ক্রমাগতভাবে অধিক উন্নত করে তুলতে ও ক্রমবিকশিত করে তুলতে সক্ষম। পশু ও সাধারণ প্রাণীরা খুব সামান্য জিনিসই জানতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তারা একটা নির্দিষ্ট সীমাকে কখনই লংঘন করতে পারে না। পাখি নীড় রচনা করে, মৌমাছিরা মৌচাক নির্মাণ করে। উভচর জীব বাঁধ তৈরী করে। কিন্তু ওদের কোনটিও ওদের মূল নির্মাণ কাঠামোর কোনো উন্নয়ন কিংবা তাতে একবিন্দু পরিবর্তন সাধন করতে পারে না। ওদের জড়বদ্ধ জ্ঞান যে ক্রমাগতভাবে গড়ে উঠেছে, তার একটিমাত্র দৃষ্টান্তও সারা দুনিয়ায় খুঁজে পাওয়া যাবে না।

www.nagorikpathagar.org

.....এই শক্তি আছে—ছিল—অনন্তকাল পর্যন্ত থাকবে কেবল মানুষের করায়ত্ত। কেবল মানুষই তা পারে। অন্য কোন জীব নয়।

মানুষের খুবই ঘনিষ্ঠ ও অতিশয় নিকটবর্তী জীব হল শিম্পাঞ্জী। শিম্পাঞ্জীরা খুব বুদ্ধি সম্পন্ন হয় বলে দাবি করা হয়েছে। কিন্তু ওদের সম্পর্কে Dobzhansky সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা বলেছেনঃ

> The chimpanzee is much superior to other nonhuman primates in memory, imagination, and learning ability. Nevertheless, there is a vast gulf between the intellectual capacity of chimpanzees and of man, symbolic responses can be learned by chimpanzees only with considerable difficulty, and their frequency fails to increase with experience and age, (The Biological Basis of Human Freedom. P-102)

শিম্পাঞ্জী স্মরণ শক্তি, কল্পনা শক্তি ও শিক্ষার্জনের যোগ্যতার দিক দিয়ে অনন্য অন্যান্য অমানুষ জীব থেকে। তথাপি মেধা ও বুদ্ধিমত্তার যোগ্যতার দিক দিয়ে শিম্পাঞ্জী ও মানুষের মধ্যে বিরাট পার্থক্য। ইঙ্গিতমূলক উত্তর দান শিম্পাঞ্জীকে শেখানো যায় মাত্র যথেষ্ট মাত্রার অসুবিধা ভোগ করে; কিন্তু ওদের বয়স ও অভিজ্ঞতার মধ্যে তা বৃদ্ধি করা অসম্ভব।

শিম্পাঞ্জীদের কিংবা বানর পরিবারের অপর কোন সদস্যকে সুশিক্ষিত করে তুলবার সর্বাত্মক চেষ্টা-ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। কোন নতুন জ্ঞান শিখবার ব্যাপারে ওদের যোগ্যতা অল্পতেই নিঃশেষ হয়ে যায়। ওদের স্বাভাবিক জ্ঞানের উর্ধ্বে ওরা কোনদিনই উঠতে পারে না। ওরা যা, তা-ই থেকে যায়—সর্বকালে ও সর্বযুগে। কেননা ওদের DNA ওদেরকে তার বেশী করতে দেয় না।

মানুষের মগজ বা চিন্তাশক্তির শ্লথ গতিতে ক্রমবিকাশ লাভের কোন প্রমাণ আছে কি? ১৯৫৩ সনের ডিসেম্বরে প্রকাশিত Scientific American পত্রিকায় নৃতত্ত্ববিদ Loren C. Eiseley বলেছেনঃ

> The arrival of the human brain, measured in geological terms, appears to have been surprisingly sudden.

ভূ-তাত্ত্বিক মানদণ্ড দিয়ে মানুষের মস্তিষ্ক শক্তির উপস্থিতির পরিমাপ করা হয়েছে, দেখা গেছে, তা বিস্ময়করভাবে আকস্মিক।

মানবীয় মগজ ও চিন্তাশক্তি-যা ভূ-তাত্ত্বিক পরিভাষায় পরিমাপ করা হয়েছে, তার আবির্ভাব বিস্ময়করভাবে আকস্মিক বলে মনে হয়। একটি মগজের এই বিরাট ভুঁইফোঁড় রূপে গজিয়ে ওঠা—যা রাত্র ও সকাল বেলার মধ্যবর্তী সময়ে যাদুর মত

www.nagorikpathagar.org

গড়ে উঠেছে—এ বিষয়ে তিনি বলেছেনঃ 'আমি যখন বলি যে, মানবীয় মগজের বিস্ফোরণ ঘটেছে, তখন আমি এর দ্বারা কিছুই বোঝাতে চাই না।' (Scientific American, December-1953, PP-71-72)

The Story of Man গ্রন্থে ক্রমবিকাশবাদী H. Mellersh মানুষের মস্তিষ্ক সম্বন্ধে বলেছেনঃ

His is a different brain, admittedly superior in no more than degree, yet in so great a degree as to constitute something virtually new in the world. (1196-P.14)

মানুষের মগজশক্তি সম্পূর্ণ ভিন্নতর ও স্বতন্ত্র ধরনের। স্বীকৃতভাবে অধিক উন্নত—তবু মাত্রা লংঘনকারী বা মাত্রাতিরিক্ত নয়। তা সত্ত্বেও তা এত উচ্চ ও বিরাট মানের, যা পৃথিবীতে সত্যিই সম্পূর্ণ নতুন কিছু গড়ে তুলতে সক্ষম।

এ মগজ—যা পৃথিবীর বুকে 'বিস্ফোরিত' হয়েছে, তা মানুষের সকল জাতিই লাভ করেছে। সত্যকথা হল, আজকেও যারা প্রাচীন কালীয়,—যেমন অস্ট্রেলীয় আদিম মানব—একই বংশকালে তাদেরও এতটা শিক্ষিত করে তোলা সম্ভব। বিজ্ঞানও এ কথাকে সত্য বলে প্রমাণ করেছে যে, মানুষ—তা প্রাচ্যদেশীয়, পশ্চিমদেশীয়, সুসভ্য বা প্রাচীন কালীয়—যা-ই এবং যেখানকারই হোক, তারা সবাই প্রায় সমান উচ্চ যোগ্যতার অধিকারী। সে যোগ্যতা এমন, যা মানব প্রজাতি ও প্রাণী প্রজাতির মধ্যে বিশাল ব্যবধান সৃষ্টি করে।

মানুষের মগজকে এত উচ্চমানের কাজ করায় কি জিনিস সাহায্য করে? ১৯৬৩ সনের ২৮শে জুনের Life Magazine তার বিশ্লেষণ দিয়ে বলেছেঃ

Neurons in the brain make thousands of connections with each other. But the innumerable extra connections that the larger human cortex provides multiplies virtually to infinity the brains capacity for receiving and analyzing data. And it is this sheer, massive power for handling data that places man in a class which is incomparably superior to any other living thing.

মগজের স্নায়ু সূত্রগুলো পরস্পরের সাথে হাজারো রকমের সংযোগ সাধন করে। কিন্তু সংখ্যাতীত স্বতন্ত্র সংযোগ—যা বৃহত্তম মানবীয় মগজের ধুসর বাহ্যাংশ—বহুবিধ যৌগিক উপাদান সংযোজিত হয়ে পরিসংখ্যান ধারণ ও বিশ্লেষণ করার জন্যে মগজের যোগ্যতা সীমাহীন করে দেয় এবং এটাই পরিসংখ্যান ধারণের বিপুল শক্তি। তা মানুষকে এমন একটা পর্যায়ে সংস্থাপন করে, যা অন্য যে-কোন জীবন্ত জিনিসের তুলনায় অতুলনীয়ভাবে অধিক শ্রেষ্ঠ ও উন্নত।

www.nagorikpathagar.org

মানুষের বিস্ময় উদ্রেককারী যোগ্যতাসম্পন্ন মগজ সম্পর্কে জৈব রাসায়নিক ইসাক এসীমভ্ ১৯৬৬ সনের ৯ই অক্টোবরের নিউইয়র্ক টাইমস্ ম্যাগাজিনে পর্যালোচনা করেছেন। তিনি তাতে বলেছেনঃ

Some estimates are that the brain, in a lifetime, absorbs as many as one million billion (1,000,000,000,000,000) separate bits of information. But there are some 10 billion gray cells, or neurons, in the brain.

কেউ কেউ অনুমান করেছে যে, মগজ একটি জীবন কালে এক মিলিয়ন বিলিয়ন (১,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০) স্বতন্ত্র তথ্য অংশ শুষে নেয়। কিন্তু মস্তিষ্কে যে আরও ১০ বিলিয়ন ধূসর বর্ণের কোষ বা নিউরণ রয়েছে।

একটি স্নায়ুতন্ত্রী কতটা যোগ্যতা রাখে? এসীমভ্ বলেছেনঃ

A healthy, mature human being of normal intelligence may have upward of 20 Million RNA molecules (DAR massenger) in each neuron...An RNA molecule made up of merely 25 links could have any one of a million billion different combinations....In fact. every RNA molecule contains many hundreds of units—not merely 25, there is no questions, then that RNA presents filing system perfectly capable of handling any load of learning and memory which the human being is likely to put upon it—and a billion times more than that quantity too. (The New York Time Magazine. October 9, 1966 PP-142)

একটি স্বাস্থ্যবান পূর্ণত্বপ্রাপ্ত মানুষের স্বাভাবিক মেধা সম্পন্ন প্রতিটি স্নায়ুতন্ত্রীতে সর্বোচ্চ ২০ মিলিয়ন পর্যন্ত আর.এন.এ অণু থাকতে পারে.....একটি আর.এন.এ অণু প্রায় ২৫টি সংযোগ স্থাপন করে মিলিয়ন বিলিয়ন সংখ্যক বিভিন্ন সংযোগ সৃষ্টি করতে পারে।.....সত্যিকথা, প্রত্যেক আর.এন.এ অণু বহু শত এককের ধারক—মাত্র ২৫টি নয়। এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। এই আর.এন.এ একটি পদ্ধতি পেশ করে যা স্মরণ শক্তি ও শিক্ষার যে কোন বোঝা বহণ করতে সক্ষম, যা মানুষ সম্ভবত স্থাপন করে থাকে—এমনকি সেই পরিমাণের বিলিয়ন গুণ বেশীও।

ক্রমবিকাশ এ ধরনের উদ্ভট পর্যায়ের কিছু তথ্য উপস্থাপন করে অথচ হাজার বছর ধরে তা কেউ ব্যবহার করেনি—এমন কি বর্তমানেও নয়। এর কি কারণ থাকতে পারে? ..... যেমন স্মরণ করার এবং জ্ঞান আহরণ ও ব্যবহার করার

www.nagorikpathagar.org

পার্থক্যকারী যোগ্যতা ৭০ বছর কিংবা ততোধিক সময়ের একটা জীবনকালের মধ্যে যা ব্যবহার করতে পারে তার চাইতেও অনেক অনেক বেশী যোগ্যতা এ কথাই প্রমাণ করে যে, মানবীয় মগজ স্রষ্টা কর্তৃক অশেষ ও চিরকালের জন্যে পরিকল্পিত হয়েছিল। অপরপক্ষে পশুজগত ও অন্যান্য প্রাণীকূলের এ ক্ষমতা একবিন্দু নেই। কেননা তা আরো অধিক সীমাবদ্ধ কর্মক্ষেত্রে ব্যবহৃত হওয়ার জন্যে বানানো হয়েছে।

এ কারণেই বলা হয়, মানুষ তার অতি উন্নত মস্তিষ্কের শক্তি নিয়ে অতি উচ্চমানের বুদ্ধিমত্তার জন্যে সৃষ্ট হয়েছিল। দীর্ঘকাল ধরে দুনিয়ার বুকে বসবাস করার জন্যে তাকে উপযুক্ত করে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাকে দেয়া হয়েছে এমন একটি মগজ, যা তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে তাকে সাহায্য করতে পারে। কোন প্রাণী বা পশু এজন্যে তৈরী হয় নি।

বস্তুত মানুষ আর পশুর মাঝে এক অনতিক্রম্য বিশাল ব্যবধান বিদ্যমান। (ডারউইনীয় ধরনের) ক্রমবিকাশ যদি সত্য হতোই, তাহলে এ দুইয়ের মাঝে এরূপ ব্যবধান অকল্পনীয়। সেক্ষেত্রে জ্ঞান ও বিবেক শক্তির একটা মধ্যম অবস্থা থাকা উচিত ছিল। কিন্তু তা কোথাও দেখা যায়না। ক্রমবিকাশবাদীরা দাবি করছেন, এ মধ্যম পর্যায় বা স্তরই হল, 'প্রাগৈতিহাসিক' মানুষ যা অধুনালুপ্ত। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বানরের ন্যায় একটা অনুন্নত প্রাণী কেন বেঁচে থাকবে এবং কল্পনায় ধরে নেয়া সমস্ত 'উন্নত' প্রাগৈতিহাসিক' মানুষ কেন নিঃশেষ ও অদৃশ্য হয়ে যাবে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে?..... আর সে ধরনের 'প্রাগৈতিহাসিক' মানুষ কি বাস্তবিকই এখনো বেঁচে আছে?.... এসব প্রশ্নের কোন জবাব দেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

www.nagorikpathagar.org

বানরসদৃশ মানুষই কি আমাদের পূর্ব-পুরুষ

ক্রমবিকাশবাদীরা দাবি করেছেন, দুনিয়ায় 'প্রাগৈতিহাসিক' মানুষ 'বানর সদৃশ' ছিল। বর্তমান সময়ে মানুষ ও জন্তু-জীবের মধ্যকার বিরাট ব্যবধান এরাই পূর্ণ করেছে। অবশ্য বর্তমানে তারা অবলুপ্ত। ১৯৬৫ সালের ২৯শে মে প্রকাশিত Science News Letter এ সম্পর্কে বলেছেঃ

They [evolutionists] see our ancestors as hairy, tailless, and a little larger than present-day gibbons. They had mobile facial muscles and no mental eminence.'

They were expert climbers and spent much of their lives in trees, on the ground they could stand with a semi-upright posture. They could walk on all fours and could run on their feet. The proto-hominolds apparently did not have the power of speech. (PP-346-437)

বিবর্তনবাদীরা আমাদের পূর্ব পুরুষকে দেখেছে লোমশ, লেজবিহীন এবং বর্তমান কালের দীর্ঘবাহু বানরের তুলনায় খানিকটা বড়। ওগুলির ছিল ঘূর্ণায়মান মুখাবয়বীয় মাংসপেশী, মানসিক উচ্চতা কিছুই নয়। ওরা দক্ষ আরোহী ছিল, জীবনের বেশীর ভাগ সময় তারা গাছেই অতিবাহিত করেছে। জমিনে ওরা আধাসোজা আকৃতিতে দাঁড়াতে পারত, তারা চার পায়ে ভর দিয়ে হাঁটতে পারত, পায়ে দৌড়াতেও পারত। এই আধা বন মানুষ বাহ্যত কথা বলতে পারত না।

'প্রাগৈতিহাসিক' মানুষের এ পরিচিতি বিশ্লেষণ আঁকা ছবি ও পলেসতারা করা ছাঁচের অঙ্গাকৃতিতে সাহিত্যের পৃষ্ঠাগুলো ভর্তি হয়ে রয়েছে। পৃথিবীর যাদুঘরগুলোতেও তা-ই সংগৃহীত হয়েছে প্রচুর। দেখতে পশুবৎ বানর-মানুষের একটা লম্বা সূত্র, যা বর্তমান মানুষ পর্যন্ত ধারাবাহিকতা সংস্থাপক—দর্শকদের চোখের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, এ সূত্রের কতটা অংশ শক্ত ও নির্ভুল তথ্যের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে? কিংবা এটা কি নিছক আন্দাজ-অনুমান ও অমূলক কল্পনা-বিলাসের ফল?

www.nagorikpathagar.org

এ সূত্র গ্রন্থি সম্পর্কে ক্রমবিকাশবাদী Rostand বলছেনঃ

We are still arguing and doubtless will continue to argue for a long time, about the real connection among all these forms..... did man descend from an ape resembling the anthropoids we know today? Or from an inferior ape? or even from a primate which did not as yet deserve the name of ape?

আমরা এখনো যুক্তি পেশ করি এবং নিঃসন্দেহভাবে দীর্ঘদিন পর্যন্ত এই যুক্তি পেশ করতে থাকব এই সমস্ত আকৃতির পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে। মানুষ কি সত্যিই লেজবিহীন বানরের বংশধর, আমরা কি মানুষ জাতি সদৃশ? অথবা কোন নীচ পর্যায়ের লেজবিহীন বানরাকৃতির? অথচ কোন প্রাচীন প্রাণীর আকারে, যা এখনো লেজবিহীন বানর হয়ে উঠতে পারে নি?

মানুষের পূর্ববংশ নির্ধারণে এত সব অসুবিধে দেখা দিচ্ছে কেন? New Scientist (২৫শে মার্চ, ১৯৬৫) ব্যাখ্যা করেছেঃ

One of the prime difficulties is that really significant human fossil skulls are exceptionally rare everything which has been found to date could be tucked away in a large cofin. All the rest must be refered to something else.

প্রাথমিক পর্যায়ের একটি বড় অসুবিধা হচ্ছে, বাস্তবিকই তাৎপর্যপূর্ণ মানবীয় ফসিল কংকাল ব্যতিক্রমভাবে বিরল। আজ পর্যন্ত যা যা দেখা গেছে, সব কিছুকেই একটি বড় কফিনে ভরে বহন করে নেয়া যেতে পারে। অবশিষ্ট যা থাকে সেসবকে অন্য কোন দিকে চালিয়ে দেয়া যেতে পারে।

১৯৫৬ সনের জুন মাসের Scientific American-এর নিম্নোদ্ধৃত সমালোচনাও এ পর্যায়ে স্মরণীয়

অতএব, শত মিলিয়ন বছরেরও বেশী কালের এ বিরাট ব্যবধান সম্পর্কে প্রাচীন জীবতত্ত্ববিদদের আবোল-তাবোল বুলি পরিহার করা উচিত। কেননা একটি পূর্ণাঙ্গ বানর-কংকালও আমাদের হাতে আসে নি। আমাদের পূর্ব পুরুষ মানুষের কংকালের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। ....প্রাচীন কালের ক্রমবিকাশের কাহিনী আমাদের পড়তে হচ্ছে সামান্য একমুঠি ভাঙ্গা হাড় ও দাঁত থেকে। উপরন্তু এ ফসিল সংগ্রহ করা হয়েছে প্রাচীন পৃথিবীর স্থলভাগের হাজার হাজার মাইলব্যাপী বিস্তীর্ণ অঞ্চল থেকে।

শেষকালে আমরা আমাদের এ ব্যর্থ মাথায় ঝাঁকানি দিতে পারি। যদিও আমরা বিহ্বলতার মাঝে দাঁড়িয়ে আছি এবং আমরা এখানে কেমন করে এলাম এ বিষয়ে আর কিছুই স্মরণ করতে পারি না।

www.nagorikpathagar.org

Evolution as a process নামক বইতে একটা অতিরিক্ত অসুবিধার উল্লেখ করা হয়েছে। ক্রমবিকাশবাদী জুলিয়ন হাক্সলী এ বইটি সম্পাদনা করেছেন। তাতে লেখা হয়েছেঃ

> খুব বেশী ও বিপুল সংখ্যক ক্ষেত্রে আবিষ্কারকদের উপস্থাপিত নমুনাসমূহের বিবরণ এমন রূপ পরিগ্রহ করেছে, যা বোঝাতে চায় যে, ফসিল অনুসন্ধানের কয়েকটি বিশেষ স্থান কিংবা তাৎপর্য রয়েছে সরাসরি মানবীয় পূর্ববংশের দিকে, যা তাদের বানর পরিবার থেকে উদ্ভূত হওয়ার কথা অস্বীকার করে। ওদের সবাই এ মর্যাদা ভোগ করতে সক্ষম হবে, তার সম্ভাবনা খুবই কম'।

প্রাচীন জীবদের ক্রমবিকাশ ক্ষেত্রে প্রমাণ-সাক্ষ্যের চরম অভাব ও অপ্রতুলতার কারণে সিদ্ধান্তসমূহ বেশ খানিকটা দুর্বল ভিত্তির উপর স্থাপিত। সে যাহোক, ক্রমবিকাশবাদীরা বর্তমানে প্রায়-ই স্বীকার করেন যে, মানুষ ও বানর পরিবার একই মূল পূর্বপুরুষ থেকে নির্গত ভিন্ন ভিন্ন শাখা মাত্র। কিন্তু এ মূল পূর্ব পুরুষ সম্পর্কিত ব্যাপারে ফসিল কি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে? ১৯৬৫ সনে New Scientist বলেছেঃ

> The unmistakable correspondence between man and anthropoids points clearly to a common ancestor. But it has not yet been found and we may have some difficulty in recognizing it. (March 25. p 800)

> মানুষ ও বনমানুষের মধ্যকার নির্ভুল যোগাযোগ স্পষ্ট করে তোলে যে, এরা দুজনেই একটা অভিন্ন পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত। কিন্তু তা আজ পর্যন্ত দেখা যায় নি এবং তা মেনে নিতে আমরা কতগুলি অসুবিধার সম্মুখীন হই।

কাজেই ক্রমবিকাশবাদীরা যখন দাবি করেন যে, মানুষ অবশ্যই নরাকার পশু থেকেই উৎসারিত,—মানুষ ও বানরের পূর্বপুরুষ এক ও অভিন্ন, তখন দেখা যায়, এ দাবির সমর্থনে কোন প্রমাণের অস্তিত্ব নেই। তা সত্য ও তথ্যমূলক প্রমাণের সমর্থন ছাড়াই গৃহীত একটি সিদ্ধান্ত। ১৯৬৬ সনের ৩রা ডিসেম্বর প্রকাশিত The Saturday Evening post পত্রিকা প্রতিপন্ন করেছেঃ Investigators—have yet to trace the origins of human line— অনুসন্ধানীরা মানুষের বংশমূল এখনো সন্ধান করতে পারে নি।

মানুষ ও পশু একই পূর্বপুরুষ থেকে এসেছে, ধরে নেয়া এ কথাটির প্রথম পর্যায়ের সাক্ষ্য বা প্রমাণ আছে কি? ১৯৬৫ সনের বই The primates-এর ক্রমবিকাশবাদী লেখকরা স্বীকার করেছেনঃ

> Unfortunately, the early stages of man's evolutionary progress along his individual line remain a total mystery.

www.nagorikpathagar.org

দুর্ভাগ্যবশত মানুষের বিবর্তনমূলক অগ্রগতির প্রাথমিক স্তরসমূহ তার ব্যক্তিগত ধারাসহ একটা রহস্যে আবৃত রয়েছে।

১৯৬৬ সনের নভেম্বর মাসের Scientific American পত্রিকা বলছেঃ

The nature of the line leading to living man remain a matter of pure theory.

যে ধারা বর্তমান জীবন্ত মানুষের উদ্ভব ঘটিয়েছে, তার প্রকৃতি এখনও নিছক একটি দার্শনিক মত হয়েই রয়েছে।

জীবন্ত মানুষ পর্যন্ত পৌঁছার সূত্রের প্রকৃতি একটা নিছক মতাদর্শ হয়েই রয়ে গেছে। যার বাস্তবতা কিছু নেই।

আমরা যদি সেই প্রস্তাবিত ও পরিকল্পিত ধারা (Chain)-টিকে প্রলম্বিত করি, তাহলে স্বপক্ষে খুব শক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ কি পাওয়া যাবে? ১৯৬৫ সনে প্রাচীন জীবতত্ত্ববিদদের একটা সম্মেলনে একটা সময়-ঘন্টা তৈরী হয়েছিল। এবং ১৯৬৫ সনের ১১ই এপ্রিল New York times পত্রিকায় এর ভিত্তিতে একটা নকশা (Diagram)তে একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছেঃ

Even today surprisingly little is known of man's own family tree...there are still enormous gap.

এমন কি আজও মানুষের নিজস্ব বংশবৃক্ষ সম্পর্কে বিস্ময়করভাবে খুব কমই জানা গেছে। এখানে এখনও দুর্লংঘনীয় ফাঁক রয়েছে।

যা-ই হোক, ফসিল প্রমাণের দ্বারা বলতে শুরু করা হয়েছেঃ

At least 30 million years ago the features that distinguish man from all other animals had begun to emerge.

অন্তত ৩০ মিলিয়ন বৎসর পূর্বে মানুষকে অন্যান্য সব প্রাণী থেকে পৃথককারী ধারা দৃষ্টিগোচর হতে শুরু করে।

চার্টে প্রথম যে নমুনা পেশ করা হয়েছে, তাকে বলা হয় প্রপলিও পিথেকাস (proplio pithecus)। গিবন-দীর্ঘভূজ মর্কট-এর মত একটা সৃষ্টি, মিসরে দেখতে পাওয়া জীবের ক্ষুদ্র অংশ বিশেষ।

কিন্তু লিস্টিভুক্ত পরবর্তী পর্যায় কি? এর সম্পর্কে Times এই প্রতিবেদন পেশ করেছেঃ

'পরবর্তী পদক্ষেপ স্বরূপ প্রায় ১৯ মিলিয়ন বছর আগে মানুষ ও বিরাট বানরের দাঁতের আকৃতি পরিদৃষ্ট হয়। একে বলা হয়েছে 'ড্রাইও পিথেকাস' (Dryopithecus)। তা আফ্রিকা ও ইউরেশিয়ায় দেখা গিয়েছিল। কাজেই

www.nagorikpathagar.org

'প্রপলিও পিথেকাস থেকে প্রায় ৩০,০০০,০০০ (খৃস্টপূর্ব) ড্রাই পিথেকাস পর্যন্ত, প্রায় ১৯,০০০,০০০, (খৃস্টপূর্ব)। এখানে ১১,০০০,০০০ বছরের একটা বিরাট ফাঁক রয়ে গেছে। এর মাঝখানের অবস্থা সম্পর্কে কোন সাক্ষ্য-প্রমাণই পাওয়া যায় না। Times পত্রিকা আরও বলেছে, ধারাবাহিক রেকর্ড থেকে বোঝা যায়, ড্রাইওপিথেকাস বিলুপ্ত হওয়ার পর (প্রায় ৯ মিলিয়ন বছর পূর্বে যা সংঘটিত হয়েছিল) থেকে সাত মিলিয়ন বছরের একটা বিরাট শূন্যতা বিরাজ করছে। (New york Times April-11, 1965, P- E-7

তাহলে এসব কিছু থেকে শেষ পর্যন্ত কি প্রমাণিত হয় প্রথম কথা 'মানুষ ও বানরের একই পূর্ববংশ ছিল' সংক্রান্ত দাবির সমর্থনে কোন সাক্ষ্য-প্রমাণই পাওয়া যাচ্ছে না। তাছাড়া মানুষের ধারার পরিকল্পিত ও অকথিত মিলিয়ন বছরগুলির কাহিনী একেবারেই শূন্য অন্ধকারাচ্ছন্ন। মোট কথা, প্রথম সাক্ষ্য পাওয়া গিয়েছিল বলে যে দাবি করা হয়েছে তা হল এখন থেকে ৩০,০০০,০০০ বছর পূর্বে। এখানে ফাঁক রয়ে গেছে প্রায় ১৮,০০০,০০০ বছরের। অনুমিত একই পূর্ববংশ থেকে আধুনিক মানুষ পর্যন্ত ধারার প্রায় সমস্ত অংশই শূন্য, অজ্ঞাত। এর মধ্যবর্তী অবস্থা সম্পর্কে কোন তথ্যই পাওয়া যায় না। এটা কম আশ্চর্যের কথা নয় যে, Scientific American ১৯৬৪ সনের জুলাই মাসে বলেছেন

> Pending additional discoveries it may be wiser not to insist that the transition from ape to man is now being documented from the fossil record.

> অতিরিক্ত আবিষ্কারগুলি সম্পর্কে কিছু না বলে লেজবিহীন বানর থেকে মানুষ পর্যন্ত বিবর্তন হওয়ার ব্যাপারটি এখন প্রমাণিত ফসিল তত্ত্বের ভিত্তিতে, একথা নিয়ে বাড়াবাড়ি না করাই বরং ভালো।

তা ছাড়া যে ফসিল-এর সাক্ষ্য পেশ করা হয়েছে, তা আরো অধিক দুর্বল। কেননা কতিপয় ক্রমবিকাশবাদী প্রপলিও পিথেকাসকে মানুষের ধারায় ধরছেন না, ধরছেন এমন এক ধারায় যা গিবন পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। আর ড্রাইওপিথেকাসকে অপর একটা ধারায় রাখেন যা বানর পর্যন্ত পৌঁছায়। তাঁদের বিশ্বাস, মানুষের ধারায় প্রাচীনতম সৃষ্টি হল এমন একটা জীব, যাকে বলা হয় 'রামা পিথেকাস' (Rama pithecus)। Times এ সম্পর্কে বলেছেঃ

> Midway through the lifetime of (Dryo pithecus), about 12 million years ago, ape-like creature with almost humanfaces appeard. This was the genus Ramapithecus, ...found in the Siwalik Hills of north-west india. (New York Times. April 11, 1965, P-e7)

www.nagorikpathagar.org

১২ মিলিয়ন বছর পূর্বে ড্রাইও পিথেকাসের জীবদ্দশায় মধ্যপথে বানর সদৃশ সৃষ্টি প্রায় মানুষের মুখাবয়ব নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। তারা ছিল রামাপিথেকাসের পূর্ণাবয়ব মহাজাতিভুক্ত...উত্তর পশ্চিম ভারতের সিওয়ালিক পর্বতে তা দেখা গেছে।

এ অর্থ হল, মানুষ ও বানরের মনে করা ও ধরে নেয়া সেই একই পূর্ব বংশেরও পিছনে আরো অধিক বড় ফাঁক বিরাজ করছে।

রামাপিথেকাস ও পরবর্তী পূর্ববংশ—যা এ ধারার উপরভাগে মনে করা হয়েছে এবং যাকে বলা হয় "অস্ট্রা লোপিথেকাস—এ দুয়ের মাঝে আরো বড় একটা ফাঁক বিদ্যমান। ১৯৬৭-এর ২৮শে জানুয়ারী প্রকাশিত Science News পত্রিকা বলেছেঃ

Unfortunately, there is a 10 million year gap in the fossil record between the latest Ramapithecus and the earliest of the Australopithecus. (Januarey 28, 1967 P-83)

দুর্ভাগ্যবশত ফসিল তথ্যে সর্বশেষ রামাপিথেকাস ও প্রাথমিক কালের অস্ট্রালোপিথেকাস-এর মধ্যে ১০ মিলিয়ন বছরের ফাঁক রয়ে গেছে।

এই সূত্রের তারিখসমূহ ব্যবহার করে দেখা যায়, প্রায় ১২,০০০,০০০ খৃস্টপূর্ব থেকে ২,০০০,০০০ খৃস্টপূর্ব পর্যন্তকালের রেকর্ড একেবারে শূন্য। তাহলে তথাকথিত রামাপিথেকাস সম্পর্কে কি বলা যায়?

The Saturday Evening Post পত্রিকা বলছেঃ

সম্ভবত ওটা দেখতে একটা ক্ষুদ্রকায় শিম্পাঞ্জীর মত। ওর চট্‌পটে দুটি হাত আছে এবং একটি বানরের সাধারণ 'এজিলিটি' (Agility) রয়েছে।... ....

'শক্ত অনুমান হল মানব পরিবারের প্রথম ব্যক্তি সর্ব প্রথম জানা 'রামাপিথেকাস' (সর্বপ্রথম নয়)-ছিল কমপক্ষে সমসাময়িককালে শিম্পাঞ্জীর মত একজন দক্ষ আবিষ্কারক। 'রামাপিথেকাস' সম্পর্কে আমাদের আছে একটা অস্থির ক্ষীণ দৃষ্টি মাত্র। আর তা বিষয় পরিমাণ দীর্ঘ চলচ্চিত্র থেকে এঁটে ধরা খানিকটা ফ্রেম-এর সমান।'

ক্রমবিকাশবাদীদের নিজেদেরই দেয়া রামাপিথেকাস' সংক্রান্ত বিবরণ থেকেই নিঃসন্দেহে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এটা বানর পরিবারের প্রাণীর একটা প্রজাতি ছাড়া আর কিছুই নয়। ওটাকে মানব-বংশধারার মধ্যেকার একটি জীব মনে করা নিতান্তই আন্দাজ-অনুমান মাত্র। কতক ক্রমবিকাশবাদী এটাকে মানব-বংশধারায় মেনে নিতে আদৌ রাযী হতে পারে নি। The Fossil Evidence for Human Evolution নামক বইতে ক্রমবিকাশবাদী গ্রন্থকার লিখেছেনঃ

আমরা অন্তর্বর্তীকালের স্তরসমূহের একটা পরিকল্পিত ছবি মনে মনে কল্পনা করতে পারি। যা সাধারণ (বানর) পূর্ববংশ এবং এ্যান্‌সোলোপিথেকাস

www.nagorikpathagar.org

পর্যায়ের মাঝখানে সংঘটিত হয়ে থাকবে বলে ধরে নিতে পারি। কিন্তু প্রান্তফসিলের অকাট্য সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে এটা খুব নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি হতে পারে।

বস্তুত কল্পিত ও ধরে নেয়া একই পূর্ববংশ থেকে অস্ট্রালোপিথেকাস পর্যন্ত কথিত বংশধারার এ অবস্থা দেখে কিছুমাত্র সান্ত্বনা পাওয়া যেতে পারে না। কেননা নিছক আন্দাজ-অনুমান ছাড়া এ কল্পনার সমর্থনে আর কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু বাস্তব তথ্যের অসমর্থন বর্তমান থাকা সত্ত্বেও এধরনের মতাদর্শ রচনার বিলাসকে মেনে নেয়ার কী যৌক্তিকতা থাকতে পারে?

অস্ট্রালোপিথেকাস স্তর

এর পরবর্তী স্তর হল অস্ট্রালোপিথেকাসদের যুগ। খৃস্টপূর্ব ২,০০০,০০০ বছর পূর্বে এ যুগটি ছিল বলে দাবি করা হয়েছে। বলা হয়েছে, ওরা ছিল Toolmakers—'হস্তদ্বারা যন্ত্রপাতি নির্মাণকারী'। কিন্তু বর্তমান মানুষের তুলনায় ওদের মগজশক্তি যে মাত্র এক তৃতীয়াংশ ছিল, সে কথা সর্বজন স্বীকৃত।

বেশ কিছু বছর পূর্বে ডঃ এল. লীকে (Dr. L. Leakey) আফ্রিকায় অনুরূপ একটি ফসিল দেখতে পেয়েছিলেন। এ সম্পর্কে ১৯৬৫ সনের ১১ই এপ্রিল প্রকাশিত New York Times বলেছেঃ

An apparent tool-user described by Dr. Leakey as Homo Hadilis, is classed by Dr. Robinson and others as a form of Australopithecus.

একজন দৃশ্যমান হাতে-গড়া-যন্ত্র-ব্যবহারকারী ব্যক্তিকে ডঃ লীকে 'হোমো হাডিলীস' বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর ডঃ রবিনসন্ ও অন্যান্যরা তাকেই অস্ট্রালোপিথেকাস শ্রেণীর আকৃতির মানুষ মনে করেছেন।

The primates বই ঘোষণা করেছেঃ

These finds provided the Basis for the first coherent and satisfactory explanation of how man came to evolve out of his apelike ancestors. (P-178)

মানুষ কী করে তার লেজবিহীন বানর সদৃশ পূর্বপুরুষ থেকে বিবর্তিত হয়ে এল, তার প্রথম সন্তোষজনক ও সুসংগত ব্যাখ্যার জন্য এগুলো ভিত্তি রচনা করে।

কয়েকটি অস্থি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে একটা শতাব্দী ব্যাপী ব্যাপক অনুসন্ধান অভিযান চালাতে হয়েছে। আর একেই বানর পূর্ববংশ থেকে মানুষের ক্রমবিকাশের 'প্রথম সুসংগত ও বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা বলে অভিহিত করা হচ্ছে।

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু প্রশ্ন হল, 'অস্ট্রালোপিথেকাস'রা যে বাস্তবিক-ই বানরসদৃশ মানুষ ছিল, তা কি নিশ্চিত করে বলা যায়? ক্রমবিকাশবাদী Le Crosclark সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছেনঃ

> The terms 'man' and 'human' can only be applied to them with some reserve, for there is no certain evidence that they possessed any of the special attributes which are commonly associated with the human beings of to-day.
>
> (The Fossil Evidence for Human Evolution, P-172)

'মানুষ' ও 'মানবিক' পরিভাষা কতকটা ব্যতিক্রম সহকারে কেবলমাত্র এদের জন্যই ব্যবহৃত হতে পারে। কেননা তারা বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য পেয়েছে যা আজকের মানবীয় সত্তাসমূহের সাথে সাধারণভাবে যুক্ত হয়েছে, তার কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই।

ওদের অস্ত্র নির্মাণের যোগ্যতা ছিল বলে দাবি করা হয়েছে। কিন্তু সে যোগ্যতাটা কি? ১৯৫৭ সনের ১৩ই ডিসেম্বর Science পত্রিকায় 'অস্ট্রালোপিথেকাস'রা কি মানুষের সমকালীন?' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছেঃ

> 'জে. টি. রবিনসন ৫৮জন প্রস্তর বিশারদের বিবরণ আবিষ্কার করেছেন—দক্ষিণ আফ্রিকার স্টারক্‌ফনটেইন নামক স্থানে। এ আবিষ্কারটা বিরাট কৌতূহল উদ্দীপক। কেননা এ নির্দিষ্ট ব্রেসিয়া (breceia) ও অস্ট্রালোপিথেসিয়ানদের অবশিষ্টদের ধারণ করে আছে। এরাই প্রাথমিক কালের দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী প্লেইস্টোসিন (Pleistocene) মানুষ বানর।.....
>
> রবিনসন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, এই প্রস্তর শিল্পের অগ্রসর চারিত্রকে অস্ট্রালোপিথেসিয়ানদের প্রতি আরোপ করা সন্দেহপূর্ণ। তিনি বিশ্বাস করেন, বর্তমান সময়ে অত্যধিক যুক্তিপূর্ণ প্রকল্প (hypothesis) হল এ শিল্পকে enhominid প্রকৃত মানুষের উপর আরোপ করা।
>
> ম্যাসন চিন্তা করছেন, স্টারক্‌ফন্‌টেইন শিল্পে যন্ত্র নির্মাণের জটিলতা দেখাচ্ছে যে, তা সম্ভবত অস্ট্রালোপিথেসিয়ানদের যোগ্যতার ঊর্ধ্বের ব্যাপার এবং তাকে অধিক উন্নত হমিনিড-এর প্রতিই আরোপ করতে হবে।

১৯৫৭ সনের ২৯শে নভেম্বর প্রকাশিত Science পত্রিকায় Hunters or Hunted শীর্ষক প্রবন্ধটিতে বলা হয়েছেঃ

অস্ট্রালোপিথেসিয়ানদের প্রথম আবিষ্কারের গৌরবের অধিকারী Raymod A Dart সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এসব কৌতূহলপূর্ণ ও বিতর্কমূলক 'মানুষ-বানর'দের

www.nagorikpathagar.org

সামাজিক জীবন সম্পর্কে যথেষ্ট ব্যাপক আলোচনা করেছেন। তাঁর অবরোহী প্রথায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ যে পরিসংখ্যানের উপর ভিত্তিশীল, তা এবং স্বয়ং তাঁর সিদ্ধান্তসমূহ মানবীয় ক্রমবিকাশ বিষয়ের ছাত্রদের আশ্বস্ত করতে খুব কমই সক্ষম হয়েছে।

এসব জীব কর্তৃক আগুনের সুচিন্তিত ব্যবহার সম্পর্কে Dart কর্তৃক উপস্থাপিত প্রমাণাদি সমালোচনামূলক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের আঘাত প্রতিরোধ করতে পারে না। উপরন্তু Oakey-র মত যোগ্য ছাত্র অস্ট্রালোপিথেসিয়ানদের সংগ্রহের মধ্যে অ-অস্ট্রালোপিথেসিয়ানদের অস্থিসমূহের একত্র সমাবেশকে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে মাংসাশীবর্গের কর্মতৎপরতা বলে মনে করেছেন।

ওয়াশবার্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এটা সম্ভব যে, অস্ট্রালোপিথেসিয়ানরা নিজেরাই এ খেলা খেলেছে...শিকারী হওয়ার পরিবর্তে...

এইসব এবং অন্যান্য কারণে কোন কোন ক্রমবিকাশবাদী মনে করেছেন, এই ফসিলগুলো এক অন্তর্বর্তীকালীন বানর গ্রুপের হবে। এগুলো মানুষের পূর্বপুরুষের ফসিল কখনই নয়।

ক্রমবিকাশবাদী R. L. Lehrman ১৯৬১ সনে প্রকাশিত তাঁর The Long Road to Man বইতে বলেছেনঃ

> Australopithecus was merely an upright, intelligent ape, not a man. The small brain case bearing heavy ridge over the eyes, across the back, and down the center was like that of any ape.

Ashley Montagu ১৯৫৭ সনে প্রকাশিত তাঁর Man : His First Million years গ্রন্থে লিখেছেনঃ

> The skull form of all australopithecines is extremely apelike....Such creatures could not have been directly ancestral to man...the australopithecines show too many specialized and apelike characters to be either the direct ancestors of man or of the line that led to man. (P-51)

সমস্ত অস্ট্রালোপিথেকাসের মাথার খুলির আকৃতি চূড়ান্তভাবে বানর সদৃশ। এইরূপ সৃষ্টি কখনই প্রত্যক্ষভাবে মানুষের পূর্ববংশ ছিল বলে ধরাই যেতে পারে না।..... অস্ট্রালোপিথেসীনরা এতবেশী বিশেষজ্ঞ ধরনের ও বানর চরিত্রের যে, হয় তারা মানুষের প্রত্যক্ষ পূর্ববংশ হবে কিংবা সেই ধারার হবে, যা মানুষ পর্যন্ত পৌঁছেছে।

www.nagorikpathagar.org

অতি আধুনিক যুগের ফসিল

ক্রমবিকাশবাদীরা এর পরের পদক্ষেপে মানুষ পর্যন্ত পৌঁছার ধারা রক্ষার্থে পরবর্তী ফসিল ছাড়াও আরো অনেকগুলো স্বতন্ত্র ফসিল তালিকাভুক্ত করেছেন এবং সেগুলোর নানা নামকরণ করেছেন। সেগুলো আধুনিক মানুষের মতই একই বর্গে বর্তমানে পিণ্ডবৎ একত্র জড়িভূত হয়ে রয়েছে। সমান পার্থক্য অবধারণ শক্তির অধিকারী। বুদ্ধিমান মানুষ (Wise man); কিন্তু ভিন্ন ভিন্নতর প্রজাতিতে সমমানের সোজা খাড়া (erect) লোক (Wise man)। World Book Encyclopeadia বলছেঃ

সমান পার্থক্য অবধারণ শক্তিসম্পন্ন কিংবা সিধা খাড়া মানুষ' নাম অনেক বিজ্ঞানী-ই দিয়েছেন এমন ফসিল race কে, যা মানবীয় দেহ এবং ৭০০ ও ১,১০০ c. c. এর মধ্যে সারিবদ্ধ মগজসহ রয়েছে। হোমো এরাক্টাস্ অস্ট্রালোপিথেকাস-এর-ও উপরের পর্যায়ের এবং হোমো সাপিয়েনস্ কিংবা আধুনিক মানুষের নিম্নে একটা পর্যায় রচনা করে। তিনটি বিচিত্র কিংবা উপপ্রজাতি সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রথম, জাভামানুষ, এরা প্রায় ৫০০,০০০ বছর পূর্বেকার। দ্বিতীয়, পিকিং মানুষ, প্রায় ৩৬০,০০০ বছর পূর্ব থেকে এদের সময়ের শুরু। আর তৃতীয় চেল্লীন মানুষ (Chellean man)। টাংগানিকায় এদের দেখা গেছে প্রায় ৪০০,০০০ বছর পূর্বে।

এসব ফসিল আসলে কি, এ বিষয়ে কোন পূর্ণ ঐকমত্য স্থাপিত হয়েছে কি?.....না। Encyclopaedia Americana তার কারণ প্রসঙ্গে বলেছেনঃ

> Some authorities held that they belonged to an ape, but a more manlike ape than any hitherto known; others considered them the remains of a lower type of man. (1456. vol 18,, P-185)

ফসিলের কোন কোন কর্তৃপক্ষ বলেছে যে, তারা বানরের মালিকানাধীন। তবে সাম্প্রতিককালে জানা যে কোন'র তুলনায় খুব বেশী মানুষ সদৃশ বানর।

কোন কোন অধিকর্তা বিবেচনা করেন, তাঁরা বানর বংশোদ্ভূত; কিন্তু তাবৎ জানতে পারা অন্য যে কোন বানর অপেক্ষা অধিক মানুষ সদৃশ। অন্যরা ওদের নিম্নশ্রেণীর মানুষের অবশিষ্ট বলে মনে করেছেন।

কিন্তু যা-ই ঘটুক না কেন, ১৯৫৬ সনের মে মাসে Scientific American যেমন বলেছে, 'প্রাচীন মানুষ সম্পর্কে অধ্যয়নরতরা একমত হয়েছে যে, তারা বর্তমান Homo-Sapien বা Homo Erectus থেকে সরাসরি ক্রমবিকাশ লাভ করেছে।

www.nagorikpathagar.org

মানুষ Homo-erectus থেকে ক্রমবিকাশ লাভ করেছে এ বিষয়ে একমত হওয়ায় এ ব্যাপারে খুব বেশী সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া গেছে বলে মনে করা উচিত হবে না। কি সে সাক্ষ্য প্রমাণ? Scientific American এর সাথে যোগ করছেঃ There is no direct evidence for the transition 'মধ্যবর্তীকালের জন্যে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ'ই বর্তমানে নেই।

আদপেই কোন প্রমাণ নেই, একথা যখন সর্ববাদীসম্মত, তখন Homo-erectus ক্রমবিকাশিত হয়ে Homo sapien হয়েছে বলে কোন মতৈক্য হতে পারে কি ভাবে? এ ধরনের মতৈক্য কেবলমাত্র গোঁড়ামী, অন্ধ বিশ্বাস, অল্পে বিশ্বাস, সহজ সরল বিশ্বাসের ফলেই গড়ে উঠতে পারে। একজন যা সত্য বলে একবার বিশ্বাস করে নেয়, সে যখন চায় যে তাকে অবশ্যই সত্য হতে হবে, কেবল তখনি এ ধরনের মতৈক্য রূপ লাভ করতে পারে। কিন্তু সত্য নির্ধারণের জন্যে তা নিশ্চয়ই কোন বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি নয়।

সেই সঙ্গে স্মরণীয়, Scientific American (November 1966) বলেছে, 'একটি সাম্প্রতিক ফসিল হাংগেরীতে দেখা গেছে। তা অধিক প্রগতিসম্পন্ন sapien মানবতা ও Homo erectus জনগণের সমসাময়িক একটা জনতার অস্তিত্ব নির্দেশ করছে। ১৯৬৪ সনে Biology and its Relation to Mankind গ্রন্থে জীব বিজ্ঞানী অধ্যাপক A. M. Winchester বলেছেনঃ

> The remains of a Swanscombe man in Europe. The kanjera man in Africa, and others suggest that true man may have existed as long as 300,000 years ago, which would have made him a contemporary of Homoerectus. 1964. P-604)

> ইউরোপে অবশিষ্ট সোয়ান্সকম্ব মানুষ, আফ্রিকার কাঞ্জেরা মানুষ ও অন্যান্যরা বলে দিচ্ছে যে, সত্যিকার মানুষ প্রায় দীর্ঘ ৩০০,০০০ বছর পূর্ব থেকেই অবস্থান করছিল, যাকে সমসাময়িক হোমো এরাকটাসরা বানিয়েছিল।

অতএব হোমো এরাকটাস্‌রা যদি মানুষই হয়, তাহলে তা বড় জোর মানব জাতিরই একটা শাখা হবে, তার অতিরিক্ত কিছু নয়। সম্ভবত ওরা নিম্ন বংশীয় ও অধঃপতিতি অন্যান্য জাতির লোকদের মতই আত্মপ্রকাশ করেছিল।

এছাড়া আরো অনেক ফসিল রয়েছে, যাদের মনে করা হত আধুনিক মানুষের তুলনায়ও অনেক নিম্নস্তরের। কিন্তু এক্ষণে তাদের বর্তমানের মানুষের সমানস্তরের মনে করা হচ্ছে। অবশ্য হোমো সেপিয়েন্স বলে ওদের শ্রেণী নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এ সম্পর্কে World Book Encyclopaedia বলছেঃ

> 'হোমোসেপিয়ানস' কিংবা বুদ্ধিমান মানুষ এমন একটা নাম যা সাধারণত দেয়া হয়েছে এমন সমস্ত বংশোদ্ভুত মানুষকে যাদের মানুষের ন্যায় দেহ এবং

www.nagorikpathagar.org

১,১০০ সি, সির উর্ধ্ব মাপের মগজ রয়েছে। এবং তার গড় হয় ১৩৫০ ও ১৫০০ c. c. এর মধ্যে। বর্তমান কালের সব মানুষই এই দলভুক্ত। প্রাগ নিয়েন্ডারথালস'রা হোমোসেপিয়েন্সদের প্রাথমিক কালের দৃষ্টান্ত। ওদের সময়কাল শুরু হয় খৃস্টপূর্ব প্রায় ৩০০,০০ বছর পূর্ব থেকে। প্রত্নতত্ত্ববিদরা ইংলন্ডের সোয়ানসকম্ব-এর নিকট এবং জার্মানীর স্টেইনে হেইমে মাথার খুলির খণ্ড ও টুকরা দেখতে পেয়েছেন।'

এককালে নিয়েন্ডারথ্যাল মানুষকে বানর মানুষ এবং আধুনিক মানুষের প্রত্যক্ষ পূর্বপুরুষ পর্যন্ত সময়কার একটা যোগসূত্র বলে মনে করা হত। কিন্তু ১৯৬২ সনের Harper-এর ম্যাগাজিন বিবরণ পেশ করেছেঃ

The Neander thals were not stunted, bent over not brutal as commonly claimed. many of them did, however, suffer from arthritis, (December-P-73)

নিয়েন্ডার থ্যাল মানুষ আকারে বড় ছিল না, ছিল বাঁকা, কুঁজো, অতটা নৃশংস নয় যতটা সাধারণত দাবি করা হয়। ওদের অনেকেই গেটে বাতের রোগে ভুগেছে।

১৯৬১ সনের ১৯শে মার্চ প্রকাশিত Times magazine-এ নিয়েন্ডার থ্যাল মানুষের মগজের যোগ্যতা বলা হয়েছে ১৬২৫ সি, সি,—আধুনিক মানুষের গড় মগজের চাইতে বড়। ১৯৬৬ সনের World Book Encyclopaedia-য় প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত বিবরণ অধিক চটকদার। বলা হয়েছেঃ

প্রথমদিকে বিজ্ঞানীরা মনে করেছিলেন যে, নিয়েন্ডার থ্যাল মানুষ বুঝি হোঁতকা ও বেঁটে—সামনের দিকে ঝোঁকা পশুবৎ কতকটা বানর সদৃশ জীব হবে। কিন্তু পরবর্তীকালে অনুসন্ধিৎসায় দেখা যায়, নিয়েন্ডার থ্যাল পুরুষ ও মেয়েমানুষদের দেহ পুরো মাত্রায় মানবোচিত। পূর্ণ খাড়া ও ঋজু এবং অত্যন্ত মাংস সমৃদ্ধ। তাদের মাথার মগজ ঠিক আধুনিক মানুষেরই সমপরিমাণ।

১৯৬৬ সনে World Book Encyclopaedia একটি নিয়েন্ডার থ্যাল পরিবারের ছবি ভিন্ন শিরোনামায় প্রকাশ করেছে। তাতে ওদের বেঁটে হোঁত্কা, সামনের দিকে ঝোঁকা, পাশব এবং কতকটা বানরসদৃশ করে সযত্নে অংকন করা হয়েছে। কেবল এটাই কোন ব্যতিক্রম নয়। প্রায় বইতেই এ ধরনের ছবি আঁকা হয়েছে এবং বর্তমান নিয়েন্ডার থ্যাল মানুষকে সামনের দিকে ঝোঁকা moronic দেখতে—দুনিয়ার যাদুঘরগুলোতে দেখানো হচ্ছে। আর ধারণা দেয়া হচ্ছে যে, মানুষের বানর সদৃশ পূর্বপুরুষ এদের মধ্যেই রয়েছে।

এ ছাড়া আরো অনেক ফসিল রয়েছে, যা এককালে ভিন্ন শ্রেণীতে রাখা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে তাদের আধুনিক মানুষের স্তরেই শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। ওরা ক্রো-ম্যাগ্নন্স বলে পরিচিত ও সর্বদিক দিয়েই আধুনিক মানুষ সদৃশ।

www.nagorikpathagar.org

Science Digest বলেছে, ক্রো-ম্যাগনন্স মানুষ থেকেই মানবীয় মগজ আকারে ক্ষুদ্রতর হতে শুরু করেছে। কিন্তু এটা তো বংশধারা থেকে বিচ্যুতি (degeneration) প্রমাণ করছে, ক্রমবিকাশ নয়। Chicago Tribune পত্রিকা অনুরূপভাবে মানুষের মগজ সম্পর্কে Dr. Ernst Meyr-এর উক্তির সমালোচনা করে বলেছেঃ 'বর্তমানে প্রবণতা নিম্নগামী'। হার্ভার্ড বিজ্ঞানীরা বলেছেন, 'মানবীয় মগজের আকারে ক্রমবৃদ্ধি প্রায় ১০০,০০০ বছর পূর্বেই থেমে গেছে।

অনেকগুলো ফসিলকে 'প্রাগৈতিহাসিক যুগের তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে প্রমাণিত হয়েছে যে, আদৌ সে রকম নয়। কেননা এ পরম সত্যটি উদঘাটিত হয়েছে যে, আধুনিক আকার-আকৃতির মানুষের ফসিলও সেই একই স্তরের দেখা গেছে। 'প্রাগৈতিহাসিক' যুগের পূর্বের মানুষের ফসিলেরও সেই একই অবস্থা। অনেক ক্রমবিকাশবাদীই এ ব্যাপারটি উপেক্ষা করে চলতে চান। কেননা, মানুষের পশু থেকে রূপান্তরিত হওয়া সম্পর্কিত পূর্ব বদ্ধমূল ধারণার সাথে এগুলো মেশে না।

Biology and its Relation to Mankin বইতে এর সমালোচনা করে বলা হয়েছেঃ

'এক সময় ধারণা করা হতো যে, আধুনিক মানুষ বুঝি প্রত্যক্ষভাবে জাভা-মানুষের, রোডেশিয়ান মানুষের এবং নিয়েন্ডারথ্যাল মানুষের অধঃস্তন বংশধর। সাক্ষ্য প্রমাণও এর সপক্ষে সংগৃহীত হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রতিভাত হল যে, তা হতে পারে না। কেননা সত্যিকার মানুষের কতক অতি-প্রাচীন অবশিষ্ট দেখা গেছে, যারা এসব অন্যান্য আকার-আকৃতির অবশিষ্টের সমসাময়িক

১৯৬৩ সনে জীববিজ্ঞানী অধ্যাপক এফ, মার্শ Evolution or Special Creation গ্রন্থেও এ কথা বলেছেন। তাঁর কথা হল ঃ

Another example of tampering with the evidence was furnished by Dubois, who admitted, many years after his sensational report of finding the remains of Java man.....That he had found at the same time in the same deposits bones that were unquestionably those of modern humans, (P-26)

প্রমাণের উপর হস্তক্ষেপের অপর একটি দৃষ্টান্ত ডুবইস কর্তৃক তৈরী হয়েছে। সে জাভা মানুষ সম্পর্কে তার চাঞ্চল্যকর প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার বহু বছর পর স্বীকার করেছে যে, সেই সময় সেই অস্থি সঞ্চয়ের যা সে দেখেছে তা প্রশ্নাতীতভাবে আধুনিক মানুষেরই ছিল।

The Bible and Modern Science গ্রন্থে এই একই প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ

এটা বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ যে, আধুনিক মানুষের ফসিলকৃত বিপুল সংখ্যক কংকাল বিভিন্নস্থানে দেখা গেছে। তাতে স্পষ্ট লক্ষণ পাওয়া গেছে যে, সেগুলো অনেক প্রাচীন।

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু তাতে অনেক যুক্তিপূর্ণ মতাদর্শের বিরুদ্ধে কোন প্রকৃত সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই, যা কোন কোন লোক কর্তৃক পেশ করা হয়েছে। তা এই যে, নিয়েন্ডারথ্যালস, পিকিং মানুষ প্রভৃতি বংশবিচ্যুত জাতিসমূহের প্রতিনিধিত্ব করছে। যা মিউটেশন ও বিচ্ছিন্নকরণের ফলে হোমোসেপিয়েনস থেকে বংশানুক্রমিত হয়েছে। সত্যি কথা এই যে,এমন কতগুলি সাক্ষ্য প্রমাণ আছে, যা দেখাচ্ছে যে, আধুনিক কালের মানুষই পূর্ববংশ থেকে কতকটা অধঃপতিত অধঃস্তন বংশধর। মানুষের ক্রো-ম্যাগনন বংশ—যারা ইউরোপে বাস করে—একই সময় নিয়েন্ডারথ্যাল মানুষের মত আধুনিক মানুষের তুলনায় অনেকটা উন্নত বলে সুপরিচিত—শারীরিক আকার ও মগজ-যোগ্যতা এই উভয় দিক দিয়ে।

লজ্জাকর প্রতারণা

অনেক ফসিল-ই যখন শুধুমাত্র, হেমোসাপিয়েনসদেরই বিচিত্র ও বিভিন্নরূপ এবং অবস্থা, তখন ওগুলোর পশুবৎ আবির্ভাব আমরা কী করে মনে করতে পারি, অথচ অনেক অংকনে ও যাদুঘর প্রদর্শনীতে ওদের বানরের মতই দেখানো হয়েছে!

প্রশ্ন হল, এসব বানরসদৃশ মানুষের ঐসব অংকন ও আকার-আকৃতি কি নিঃসন্দেহে বিজ্ঞানসম্মত? কোন্ ফসিল কিভাবে দেখতে, কোন্‌টির চেহারার আকৃতি কিরূপ ছিল, চামড়া, চুল এবং গায়ের রং ইত্যাদি কি রকম ছিল তা কি ফসিল দেখে আন্দাজ করা চলে?

এ সম্পর্কে ক্রমবিকাশবাদী লী-গ্রস ক্লার্ক তাঁর বই The Fossil Evidence for Human Evolution-এ বলেছেন ঃ

> এখন সম্ভবত এমন কোন বংশীয়-গোত্রীয় আকার-আকৃতি নেই, যাতে মাথার খুলি-চরিত্র নিগ্রো ও এস্কিমোদের তুলনায় ভিন্ন ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। আর এ আকার-আকৃতির মাথার খুলি বলে যে দাবি করা হয়েছে সে সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা একথা মেনে নেবার ব্যাপারে একমত হতে ব্যর্থ হয়েছেন। এ ধরনের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ যখন এতই কষ্টসাধ্য প্রমাণিত হয়, তখন সীমাবদ্ধ কংকাল-অবশেষ ও ক্ষুদ্র বংশীয় গ্রুপ কম-বেশী পার্থক্য সূচক চরিত্র সহকারে সঠিকভাবে চিনতে পারা যে কত কঠিন—বরং অসম্ভব, তা সহজেই অনুমান করা যায়।'

Man,God and Magic গ্রন্থে এর-ই প্রতিধ্বনি করে—সত্য বলে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে বলা হয়েছে ঃ

> আমরা যেমন ধীরে ধীরে শিখতে শুরু করেছি যে, প্রাচীনকালের মানুষ অবশ্যম্ভাবীরূপে অশিষ্ট ও অসভ্য নয়, তেমনি একথাও আমাদের বুঝতে ও শিখতে হবে যে, বরফ যুগের প্রাথমিককালের মানুষ না প্রায়-বানর, না হাবা-গোবা ও স্থূল বুদ্ধির লোক। নিয়েন্ডারথ্যাল কিংবা পিকিং মানুষের

www.nagorikpathagar.org

পুনর্গঠন পর্যায়ের যাবতীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টা অবর্ণনীয়ভাবে নির্বুদ্ধিতাব্যঞ্জক। ওদের অতিশয় বেশী বেশী লোমশ আকৃতি ও অসভ্যের ন্যায় একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকা পাশবিক চেহারাসমূহ সারা দুনিয়ার যাদুঘরসমূহে রক্ষিত রয়েছে। ওদের মুখাবয়ব রঙ ও বর্ণের দিক দিয়ে সাধারণত গাঢ় পিংগল, ওদের চুল আদিম স্বাভাবিক অবস্থায় স্থিত, অমসৃণ, না-আঁচড়ানো, চোয়াল আদিম প্রকৃতির, ললাট পশ্চাদাপসৃয়মাণ। এতদসত্ত্বেও প্রত্ন-প্রস্তর যুগীয় মানুষের গাত্রবর্ণ বাস্তবিকই কি ছিল এবং ওদের চুল কিভাবে গজাল, তা আমাদের নিঃসন্দেহে জানা নেই এবং বলতে গেলে মুখাকৃতি বিচারপূর্বক চরিত্র-নির্ণয় বিদ্যা সম্পর্কে আমাদের স্পষ্ট কোন ধারণাও অনুপস্থিত। চুল, চক্ষু, নাক, ওষ্ঠ কিংবা মুখাবয়বের প্রকাশ-পুনর্গঠন অসম্ভবতা সম্পর্কে আমেরিকান গ্রন্থকার টি. ডি. স্টুয়ার্ট যথার্থ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বলেছেন, 'সম্ভাব্যতা এই যে, প্রাচীনকালের মানুষের প্রকাশভংগী আমাদের নিজেদের প্রকাশভংগীর তুলনায় কিছুমাত্র কম প্রসন্ন ছিল না।

অতএব প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত সত্য যা সমর্থন করে তার বিপরীত ক্রমবিকাশবাদীরা ফসিলকে এমন একটা পজিশন দিয়েছেন, যা তাদের পূর্ববদ্ধমূল মতাদর্শের সাথেই সাযুজ্যপূর্ণ। তা এজন্যে যে, ১৯৫৯ সনে New York Time পত্রিকা এরূপ তথ্য প্রাপ্তির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে। বলেছে ঃ

The peking man, a 500,000 years old fossil, has had his face redone for a starring role in a chinese documentary film about his life. A new and supposedly more lifelike reconstruction of the head of the prehistoric human was reported. (September-7)

পিকিং মানুষের ফসিল ৫০০,০০০ বছর পুরাতন। তার জীবনের উপর নির্মিত একটি চীনা ডকুমেন্টারী ফিল্মে উজ্জ্বল নক্ষত্র খচিত ভূমিকার জন্য তার মুখমণ্ডল প্রস্তুত করা হয়েছিল। একটি নতুন এবং ধরে নেয়া অধিক জীবন্ত সত্তা পুনর্গঠন করা হয়েছিল, ইতিহাসপূর্ব কালের মানুষের মাথা বলে প্রচার করা হয়েছিল।

সাক্ষ্য প্রমাণের এ ধরনের প্রতারণামূলক অদল-বদল কিছুমাত্র নতুন নয়। এ ধরনের কাজের আরো অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। ওলন্দাজ চিকিৎসাবিদ অধ্যাপক ডিউবয়েস ১৮৯১-৯২ সনে যখন জাভা মানুষ আবিষ্কার করেন, সেখানে কি তিনি ফসিল অবশেষ দেখতে পেয়েছিলেন?

Encyclopaedia Britanica আমাদের বলেছেঃ

ফসিলের যে সব টুকরা ও অসম্পূর্ণ অংশ দেখা গিয়েছিল, তা ছিল মাথার খুলির উপরিভাগ, যার বাহ্যিক ও শারীরিক দিক দিয়ে এমন একটা আকৃতি ছিল, যা একটা বিরাটকায় গিবনেরও থাকতে পারে বলে মনে করা সম্ভব। এগুলো ছিল বাম উরুর হাড় এবং তিনটি দাঁত। অংশগুলোর প্রাপ্তিস্থানের পরস্পর দূরত্ব

www.nagorikpathagar.org

ছিল কুড়ি পা। পরে তিনি আরো ছয়টি টুকরো এর সাথে যোগ করেন। নিচের চোয়ালের একটি অংশ সেই দ্বীপের অপর এক স্থানে পাওয়া যায়, কিন্তু তা সেই ভূতাত্ত্বিক যুগেরই এক স্তরের ব্যাপার।

বিশ গজ কিংবা তার কাছাকাছি দূরত্ব হতে হাড়ের ক্ষুদ্র অংশ সংগ্রহ করা, বহু মাইলের দূরত্ব থেকে আর একটি অংশ এনে তার সাথে যোগ করা এবং এগুলো একই দেহে একত্র গ্রথিত ছিল বলে দাবি করা কতটা বিজ্ঞানসম্মত হতে পারে?

ক্রমবিকাশবাদী Le Gross Clark আর একটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। বলেছেনঃ

এত কম মাত্রায় প্রমাণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করার একটা ভয় আছে। 'হেস্‌পারো পিথেকাস-এর প্রখ্যাত ঘটনা এ অসুবিধার একটা দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছে। জন্ম পর্যায়ের এ নামটি দেয়া হয়েছে এমন একটা ফসিল দাঁতকে যা ১৯২২ সনে নেব্‌রাস্কায় দেখা গেছে। তখন ধারণা ছিল যে, এটা নরাকার বানরের একটি অধুনালুপ্ত আকারের নমুনা পেশ করছে। কিন্তু যেমন সবার জানা—উত্তরকালে প্রমাণিত হল যে, এ দাঁত একটা শুকর সদৃশ প্রাণী বা জীবের ফসিল থেকে গৃহীত। এভাবে কখনো-সখনো পাপ করেন নি এমন প্রত্নতত্ত্ববিদ খুব কমই আছেন।

Encyclopaedia of Britannica-র ১৯৪৬ সনের সংস্করণে আর একটি আবিষ্কার সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

The discovery which ranks next in importance ...was made by Mr. Charles Dawson at piltdown, sussex, between the years 1911 and 1915. He found the greater part of the left half of a deeply mineralized human skull, also part of the right half; the right half of the lower jaw, damaged at certain parts but carrying the first and second molar teeth and the socket of the third moral or wisdom tooth....

Amongst British aurhorities there is now agreement that the skull and the jaw are part of the same individual.

গুরুত্বের দিক দিয়ে পরবর্তী স্তরের আবিষ্কার চার্লস ডা'সন কর্তৃক পিল্ট ডাউন নামক স্থানে তৈরী করা হয়েছিল। তা ১৯১১ থেকে ১৯১৫ সনের মধ্যে হয়েছিল। গভীরভাবে আকরিক বানানো মানবীয় কংকালের বামপার্শ্বের বড় অংশ সে দেখতে পেল। ডান অর্ধাংশও। নিম্ন মাড়ির ডান অর্ধেকের শেষ অংশ বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল কিন্তু প্রথম দ্বিতীয় পাটির দাঁত বহন করছিল এবং আক্কেল দাঁত বসানোর গর্তও ছিল।

ক্রমবিকাশ সংক্রান্ত বিষয়বস্তুর সঙ্গে পরিচিত পাঠকরা উপরিউক্ত 'পিল্ট ডাউন মানুষ'কে স্বীকার করবেন এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু বৃটিশ 'বিশেষজ্ঞদের এই 'মতৈক্য' কতটা 'বিজ্ঞানসম্মত'?

www.nagorikpathagar.org

১৯৬১ সনের ২৪শে ফেব্রুয়ারী প্রকাশিত Science News Letter পত্রিকা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেঃ

One of the most famous fakes exposed by scientific proof was pilt down man, found in Sussex, England and thought by some to be 500,000 years old. After much controversy, it turned out to be not a primitive man at all but a composite of a skull of modern man and the jaw-bone of an ape...The jaw bone had been 'doctored' with bichromate of potash and iron to make it look mineralized.

সর্বাধিক খ্যাতি অর্জনকারী যে ধোঁকা বৈজ্ঞানিক প্রমাণের ভিত্তিতে ধরা পড়েছে, তা হচ্ছে পিল্টডাউন মানুষের। ইংল্যান্ডের সাসেক্সে দেখা গেছে, কেউ কেউ তো সেটিকে ৫০০,০০০ বছর পুরাতন বলে ধরে নিয়েছিল। বহু তর্ক-বিতর্কের পর প্রমাণিত হল যে, তা কোন প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ হতে পারে না। বরং তা বর্তমান মানুষের কংকাল দিয়েই বানানো হয়েছিল। অবশ্য মাড়ির হাড়টি একটি বানরের জুড়ে দেয়া হয়েছিল মাড়ির হাড়ের উপর ডাক্তারী চালানো হয়েছিল পটাশ এবং লোহাযোগে, যেন সেটি প্রস্তরায়িত দেখা যায়।

১৯৫৬ সনের অক্টোবর মাসে Reader's Digest লিখেছে ঃ

Every important piece proved a forgery. Piltdown man was a fraud from start to finish !...all the circumstantial evidence points to Dawson as the author of the hoax (P-182)

প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ খণ্ডই একটি প্রতারণা বলে প্রমাণিত হয়েছিল। পিল্টডাউন মানুষ ছিল শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটা ধোঁকা। অবস্থাগত সব প্রমাণাদিই ডা'সনকে একটা ছল রূপে দেখিয়ে দিচ্ছিল।

কতক ক্রমবিকাশবাদী তাদের মতাদর্শের পক্ষে জ্বলন্তভাবে হারিয়ে যাওয়া তথ্য ও সত্যসমূহ মনগড়াভাবে রচনা করার দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। ১৯৬৫ সালের জানুয়ারী সংখ্যা Scientific American পত্রিকায় তা উদঘাটিত হয়েছে। জৈব বস্তু সম্পন্ন একটি উল্কাপিণ্ড (যা ক্রমবিকাশ প্রমাণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে) সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

A fragment of a meteorite that fell in south-west France more than a century ago has proved on recent inspection to be ingeniously doctored with terrestrial organic material.

The hoaxer had apparently moistened the meteorite fragment until it was soft inserted the various foreign bodies and then, using glue as a binder, faked a surface crust of the kind

www.nagorikpathagar.org

produced by atmospheric heating to replace the one destroyed by his manipulations... The orgucil fall had occurred only five weeks after pasteur had delivered his stormy and widely reported defense of divine creation as the only possible initiator of life. (P-52)

উপরন্তু ক্রমবিকাশমূলক বস্তুসমূহ খুব-ই অসতর্কভাবে পেশ করা হয়েছে। এই উপায়টিও ভ্রমাত্মক ও প্রতারণামূলক। সময় এবং ফসিল এমন সারিবদ্ধভাবে সাজানো হয়েছে যে, দর্শক যেন মনে করতে পারে যে, এগুলো পরস্পর উদ্ভূত। কিন্তু আরও তল্লাশী চালানর পর দেখা গেছে যে, এগুলো সাধারণত ক্রমবিকাশ বিশ্বাসীরাও গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। এর আর একটা দৃষ্টান্ত হলো একথা বলা যে, মানুষ বানর থেকে ক্রমবিকাশ লাভ করেছে। যদিও ক্রমবিকাশ মতাদর্শ এ দাবি আদৌ করছে না বরং তা এটাকে প্রত্যাখ্যান করছে। ১৯৬৫ সালের The Primates বইতে একথা বড় বড় শিরোনামায় লেখা আমরা দেখতে পাচ্ছি। তাতে লেখা হয়েছে ঃ From Ape toward Man—'বানর থেকে মানুষের দিকে—'।

সত্যি কথা, ফসিল এবং মানুষের ক্রমবিকাশ পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে পেশ করা আনুষাংগিক প্রমাণাদি বিজ্ঞানের একটা মিথ্যা ছলনা মাত্র। নিছক আন্দাজ-অনুমান ও আজগুবি ধরনের জোর প্রয়োগের ভিত্তিতে এটাকে গড়ে তোলা হয়েছে। ক্রমবিকাশের এ ধারা সময়ের, স্থানের ও আকার-আকৃতির বিরাট বিরাট ফাঁক দ্বারা কর্তিত ও ছিন্নভিন্ন হয়ে আছে।

বস্তুত প্রকৃত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য পশু থেকে মানুষে ক্রমবিকশিত হয়ে আসা প্রমাণ করে না। বরং মানুষ সম্পূর্ণ ভিন্ন ও স্বতন্ত্রভাবে অন্যান্য জীব ও প্রাণিকূল থেকে ভিন্নতর অস্তিত্ব ও উদ্দেশ্য নিয়ে সৃষ্ট হওয়ার কথা-ই অকাট্যভাবে প্রমাণ করে। সে যেমন ছিল শুরুতে—প্রথম দিন, আজও ঠিক তেমনি রয়েছে অপরিবর্তিত। কোন জন্তু বা প্রাণী-জীবন সোজাসুজি অতিক্রম করে আসে নি কোনদিন-ই। কেননা তার D.N.A. এটা কখনো হতে দিতে পারে না। মানুষ তার সৃষ্টিগত প্রজাতীয় পরিমন্ডলেই রয়ে গেছে, চিরকাল তা-ই ছিল এবং ভবিষ্যতেও চিরদিনই তা-ই থাকবে। এর ব্যতিক্রম কখন-ই ঘটবে না, ঘটতে পারে না।

অদৃশ্যপ্রায় প্রাণীর চিহ্নসূচক দেহসংস্থা

ক্রমবিকাশবাদীরা মানুষের ক্রমবিকাশ প্রমাণের উদ্দেশ্যে দাবি করেছেন যে, মানবদেহ অদৃশ্যপ্রায় প্রাণীর চিহ্নসূচক। তাঁদের ভাষায় 'Vestigial organ'। তাঁরা বলেন যে, দেহের এককালে একটা ব্যবহার ছিল; কিন্তু বর্তমানে ক্রমবিকাশ প্রক্রিয়ার অগ্রবর্তিতার কারণে তার কোন প্রয়োজন নেই; তার-ই শেষ পদচিহ্ন হল এই মানব দেহ। কিন্তু ১৯৬৬ সনের নভেম্বর সংখ্যা Reader's Digest পত্রিকা

www.nagorikpathagar.org

'The Useless Gland that Guards our Health' শিরোনামায় প্রকাশিত প্রবন্ধে কি বলছে, এই প্রেক্ষিতে তা আমাদের স্মরণ করা উচিত। প্রবন্ধটিতে বলা হয়েছে ঃ

'ঘাড়ের একেবারে নীচে, পাঁজর-হাড়ের পিছনে অবস্থিত ফ্যাকাশে লাল-রূপালী বর্ণের সূক্ষ্ম বস্ত্রবৎ গ্রথিত কোষসমূহের প্রকৃত কাজ যে কি, তা নিয়ে চিকিৎসাবিদরা অন্তত দুহাজার বছর ধরে রীতিমত দিশেহারা হয়ে আছেন। এটার নাম থাইমাস গ্লান্ড।—আধুনিক দেহতত্ত্ববিদরা এটাকে একটা অতিরিক্ত জিনিস মনে করেছেন, যেন ওটার কোন কাজ বা ব্যবহারই নেই। ওটা বুঝি অপ্রয়োজনীয়—অদৃশ্যপ্রায় প্রাণীর চিহ্ন-অঙ্গ, সূচনা পূর্বে তার মূল উদ্দেশ্য বলে বাস্তবিক-ই কিছু থেকে থাকলেও বর্তমানে তা হারিয়ে ফেলেছে।

সে যা-ই হোক, বিগত কয়েক বছরে আমেরিকান, বৃটিশ, অস্ট্রেলিয়ান এবং সুইডেনের এক ক্ষুদ্র দলের কুকুরের ন্যায় না-ছোড় গোয়েন্দা কার্যকলাপের ফলে থাইমাস-প্রহেলিকা উদঘাটন করা সম্ভব হয়েছে। এঁরা প্রমাণ করেছেন যে, অপ্রয়োজনীয় হওয়া তো দূরের কথা, 'থাইমাস' প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লালাগ্রন্থি। তা জটিল অনাক্রম্য ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করে, সংক্রামক ব্যাধি থেকে আমাদের রক্ষা করে।

থাইমাস কি এমন একমাত্র অঙ্গ, যা আমাদের দেহের অনাক্রম্য ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে? সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা অনুসন্ধানীদের একথা বিশ্বাস করতে বাধ্য করেছে যে, এ আনুষংগিক, জিহ্বামূল এবং গল-রসগ্রন্থি দেহ-বিরোধী প্রতিক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

এ বিষয়ে Encyclopaedia Britannica-ও বলেছে ঃ

Many of the so-called vestigial organs are now known to fulfill important functions.

তথাকথিত অদৃশ্যপ্রায় প্রাণীর চিহ্নরূপ দেহাঙ্গগুলিও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে বলে এখন জানা গেছে।

বস্তুত কোন একটি নির্দিষ্ট দেহাঙ্গের কার্যকারিতা সম্পর্কে অজ্ঞতা থাকলেই তাকে অদৃশ্য প্রাণীর চিহ্ন বলতে হবে, তা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নয়। ওটার খারাপ কার্যকারিতাও প্রমাণ করে না যে, ওটা অদৃশ্যপ্রায় প্রাণীর চিহ্নবিশেষ। প্রতিটি বছর এপিডিসাইটিস রোগ ছাড়াও সম্ভবত অনেক বেশী কণ্ঠ-রোগের ঘটনা সংঘটিত হয়। কিন্তু তাই বলে কণ্ঠনালীকে কেউ 'ভেস্টিজিয়াল অঙ্গ' বলবে না। এ ছাড়াও, ক্রমবিকাশ তো নবতর অঙ্গ সংযোজন দেখাবে, যা হবে অধিক প্রয়োজনীয়। যে কোন দেহাঙ্গ বাস্তবিকই অধোগতি লাভ করলে তা কখনো ক্রমবিকাশ প্রমাণ করে না। বরং তা মানুষের বংশ-বিচ্যুতি-ই সপ্রমাণিত করে। ঊর্ধ্বগতির পরিবর্তে তা নিম্নগতি দেখায় মাত্র।

www.nagorikpathagar.org

স্রষ্টার অস্তিত্বের জীবন্ত সাক্ষ্য

মানুষের বর্তমান দেহাবয়ব ও তার দৈহিক গঠন এক জীবন্ত ও অতি উচ্চমানের পরিকল্পনাকারী স্রষ্টার অকাট্য ও অনস্বীকার্য সাক্ষী।

মানুষের অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও মানবদেহ কিভাবে পরিকল্পিত ও সৃষ্ট হয়েছিল, সে সম্পর্কে মানুষ অনেক জানছে, অধিক বিজ্ঞজনেরাও তাদের মনে বিস্ময় উদ্রেকের কারণ বিশ্লেষণ করছেন। Dr. W. W. Akers নামের জনৈক বিশ্ববিদ্যালয় ইঞ্জিনিয়ার ১৯৬৬ সনে একজন শল্য চিকিৎসকের সঙ্গে মিলে একটা কৃত্রিম হৃৎপিন্ড তৈরী করার কাজে ব্যস্ত হয়েছিলেন। এই সময় তিনি বিস্ময়বেদনা সহকারে হঠাৎ চিৎকার করে বলে উঠলেন ঃ

> The body is the ultimate in technological perfection. Almost any machine you can dream up—no matter how sophisticated—you can look into the body and find one better. (Sanfrancisco Examiner and Chronicle —September 11. 1966. P-30)
>
> দেহটি প্রযুক্তির পূর্ণত্বের শেষ পর্যায়ের ছিল। মোটামুটি প্রায় ধারণাযোগ্য কোন যন্ত্রের মত। তা কত অ-সরল বা জটিল, সেটা কোন ব্যাপার নয়। তুমি দেহটি দেখতে পার এবং ভালোই দেখা যাবে।

এক সময় তুমি নিজে একটা একক গর্ভস্থ ডিম্বমাত্র ছিলে—ছিল অতি ক্ষুদ্রতর একটি কোষ। সেই সহজ সূচনা মুহূর্ত থেকে চরম জটিল উন্নয়নের মাধ্যমে তোমার দেহ গড়ে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত চিন্তাক্ষমতাসম্পন্ন মগজ, দৃষ্টিমান চোখ, শুনবার কান—এমনিভাবে অন্যান্য বহু গুরুত্বপূর্ণ ও একান্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গড়ে উঠেছে। মানবদেহ-সৃষ্টি ও উন্নয়নের এই জটিলতর পদ্ধতি একজন অতিশয় বুদ্ধিমান বিচক্ষণ সৃষ্টিকর্তার এবং একজন একক সংগঠকের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

The First Nine Months গ্রন্থে মানব-দেহ সৃষ্টির সূচনা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

> When the sperm nucleus reaches the egg nucleus these two lie side by side as their content is combined. In this half hour

www.nagorikpathagar.org

an immeasurable number of traits of the new baby are decided within the pin-point egg. (1962, P-25)

শুক্র অণু যখন ডিম্বাণুতে পৌছায়, তখন এ দুটি পাশাপাশি শয়ন করে, কেননা তাদের সন্তুষ্টি সংযুক্ত। এই অর্ধ-ঘন্টা সময়ের মধ্যে নব্য শিশুর অসংখ্য বৈশিষ্ট্য-বিশেষত্ব আলপিনের অগ্রভাগের মত সূক্ষ্ম ডিম্বের মধ্যে স্থিরীকৃত হয়ে যায়।

এ দুটো কোষ যখন একত্রিত হয় তখন সম্পূর্ণ নতুন একটা মানুষ সৃষ্টির জন্যে জন্মগত DNA এর মধ্যে পরিকল্পনা তৈরী করে নেয়া হয়। আর এটা মাত্র কয়েক মিনিট সময়ের ব্যাপার।

একটা মানবদেহ কিংবা দেহ-ব্যবস্থা নিজেকে যে পন্থা ও পদ্ধতিতে বিচ্ছিন্ন করে নিচ্ছে ও একটা জটিল দেহ-ব্যবস্থা গড়ে তুলছে, ক্রমবিকাশবাদীরা এ বিস্ময়কর ও উদ্দেশ্যমূলক প্রক্রিয়ার কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম নন। Science Today গ্রন্থে ক্রমবিকাশবাদী Sir James Gray এ কথাটি অকপটে স্বীকার করেছেন। Predetermined plan এবং a directive principle পর্যায়ে তিনি বলেছেন ঃ

The whole process seems much more like the development of organized structure from a relatively simpler system. The molecules of protain and fat in the yoke appear to be marshaled into position to form an orderly and highly complex system some what analogous to the process by which a house is built of bricks, wood and glass in accordance with a predetermined plan...The machine seems to operate, in other words, in a highly purposive way and the term 'organizer' has been applied to it...There seems to be some directive principle at work. (pp-25.26)

গোটা প্রক্রিয়াই মনে হয় এক আপেক্ষিক সরল পদ্ধতি থেকে গড়ে ওঠা এক সুসংবদ্ধ কাঠামোর উন্নয়ন। আমিষ উপাদান ও চর্বি জোয়ালের মধ্যে একটি অবস্থানে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে একটি শৃংখলাবদ্ধ উচ্চতর জটিল ব্যবস্থা যা কিছুটা ইটের বাড়ি নির্মাণের প্রক্রিয়া সদৃশ। যেখানে কাঠ ও কাচ পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী সাজানো হয়। .....যন্ত্র চালানো হচ্ছে মনে হয়। অন্য কথায় একটি উচ্চতর উদ্দেশ্যমূলক পথে এবং সংগঠক যে নিয়ম তাতে কার্যকর করেছে।...মনে হবে, সেখানে কতক চালিকানীতি কাজ করছে।

www.nagorikpathagar.org

কেননা জীবন্ত দেহব্যবস্থার ভ্রূণ পরিকল্পনা (design) অনুযায়ী ক্রমবৃদ্ধি লাভ করে থাকে। কিন্তু এ বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ পথনির্দেশ ও সংগঠনের সাথে ক্রমবিকাশ মতাদর্শ কিছুমাত্র খাপ খায় না। ক্রমবিকাশবাদী C. H. Waddington স্বীকার করেছেন যে, তা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার তুলনায়ও অনেক বেশী সম্পর্কশীল। ১৯৬২ সনে তাঁর লিখিত The Nature of Life বইতে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, কোষসমূহ 'দেহাঙ্গে সুনির্দিষ্ট আকৃতি ও ধরনে' সাজিয়ে দেয়া হয়েছে। তারপরে মেনে নিয়েছেন ঃ

I am afraid biologists have to confess that they still have hardly any notion of how this is done. It certainly must involve something more than purely chemical process....

It is, of course, only a beginning of understanding to say that the process we are investigating force us to think in terms of theories which involve organization. Where does this organization come from? (P-67)

এটা কিভাবে করা হয়েছে তা স্বীকার করে নিতে জীববিজ্ঞানীরা এখন পর্যন্ত ইচ্ছুক হচ্ছেন না বলে আমি বিস্মিত। এ ব্যাপারটি নিছক রাসায়নিক প্রক্রিয়ার তুলনায় অনেক বেশী কিছু নিশ্চিতভাবেই।.....

এটা অবশ্য উপলব্ধির একটি সূচনা হিসেবে এ কথা বলার জন্য যে, যে প্রক্রিয়ার আমরা সন্ধান করছি তা আমাদেরকে বাধ্য করছে সেই মতাদর্শের পরিভাষায় চিন্তা করতে যা সুসংবদ্ধতা সংশ্লিষ্ট—এ সুসংবদ্ধতা কোত্থেকে আসছে?

মাতৃগর্ভে জীব-শিশুর অবস্থানের জন্যে যে ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা হয়েছে তা অবশ্যই লক্ষণীয়। তাতেও খুব দক্ষতা ও বিচক্ষণতাপূর্ণ পরিকল্পনা দেখতে পাওয়া যায়। প্রথম কোষ সংক্রান্ত লিখিত তথ্যের নির্দেশনায় কিভাবে এ ব্যবস্থাপনা কার্যকর করা হল, সে বিষয়ে ১৯৫৬ সনের ৩০শে এপ্রিলের Life পত্রিকা বলছে ঃ

The fertilized egg cell contains in its tiny nucleus not only all the genetic instructions for building a human body, but also a complete manual on how to construct the complex protective armamentariun-amnion, umbilical cord, placenta and all—that makes possible the embryo's existence in the womb.

(P-76-72A)

উর্বর ডিম্বকোষ নিজের ক্ষুদ্রপরিসর অণুর মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ মানব দেহ তৈরীর সমস্ত জন্ম সংক্রান্ত নির্দেশাবলী ধারণ করে। শুধু তা-ই নয়, গর্ভের ফুল

www.nagorikpathagar.org

সংরক্ষণে দুর্ভেদ্য জটিল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কি করে গড়ে তোলা হবে তার নির্দেশনাও ধারণ করে, তার ফলেই ডিম্বের মধ্যে ভ্রূণটির অবস্থান নিশ্চিত হয়ে থাকে।

মায়ের গর্ভে প্রতিরক্ষাসম্পন্ন একটা অবস্থিতির ব্যবস্থা ভ্রূণের জন্যে অপরিহার্য। অপরিহার্য সেদিন থেকেই যেদিন ডিম্ব উর্বর হয়ে ওঠে। এটা হচ্ছে বাইরের উপাদান। এবং সাধারণভাবে ব্যক্তির অনতিক্রম্য প্রতিরোধ শক্তি এ ধরনের একটা বাইরের বৃদ্ধিকে প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু উর্বর ডিম্ব এ ধরনের প্রতিরোধকে সহজেই ফাঁদে ফেলতে সক্ষম। এরূপ প্রতিরোধমূলক গৃহব্যবস্থার সমস্ত কৃতিত্ব সৃষ্টিকর্তাকে দিয়ে। ডেভিড কি সুন্দর করে বলেছেনঃ You kept me screened off in the belly of my mother, (psalm 139; 13) আমার মায়ের গর্ভে তুমি-ই আমাকে পর্দার অন্তরালে সুরক্ষিত করে রেখেছো, হে স্রষ্টা!

পর্দার অন্তরালে রাখার এ প্রাথমিক পদক্ষেপে DNA কর্তৃক প্রথম নির্দেশনা আসে Trophoblast কোষ রচনার জন্যে। জরায়ু কিংবা ডিম্বের মধ্যস্থিত ডিম্বের জন্যে ছোট্ট একটা বাসা রচনার প্রাথমিক উদ্দেশ্যে এগুলো উৎপাদিত হয়ে থাকে। Life এর উক্ত প্রবন্ধেই এর ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে এ ভাষায় ঃ

> The wall of the uterus is a thick, spongy material. The trophoblast cells dig right into it, destroying the uterine cells, taking nourishment from the blood and passing it along to sustain the first embryonic cells. Then they use the scar tissue from the healing wound they have inflicted as a temporary protective capsule for the still microscopic parasite.

জরায়ুর প্রাচীর অত্যন্ত পাতলা, ছিদ্রবহুল উপকরণে তৈরী স্ফুটনোন্মুখ কোষসমূহ এর মধ্যে খনন কার্য করে প্রবেশ করে। এক মাতার গর্ভে ভিন্ন পিতৃজাত কোষসমূহকে ধ্বংস করে। রক্ত থেকে পরিচর্যা গ্রহণ করে প্রথম প্রাণকোষ হিসেবে অবস্থান করার ব্যবস্থা করে দেয়। অতঃপর ক্ষত চিহ্ন সমন্বিত পেশী ব্যবহার করে আরোগ্যকারী ক্ষত থেকে—যা তারা আরোপ করেছে অস্থায়ী সংরক্ষক বীজ হিসেবে তখনো অণুবীক্ষণী পরজীবীর জন্য।

জরায়ু আক্রমণাত্মক ও ক্ষতিকর ট্রফোব্লাস্ট কোষসমূহের পরবর্তী আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজেকে অবশ্যই রক্ষা করে। কিন্তু তা বাস্তবিকই কিভাবে হয়ে থাকে তা একটা রহস্য; কেননা দেহের অপর অংশ এরূপ করতে পারে না।.....

ভ্রূণ একবার দৃঢ়ভাবে টিকে থাকতে পারলে 'হরমন' নিষ্কাষণ করতে শুরু করে দেয়। তা ভ্রূণের পরবর্তী অবস্থানকালের জন্যে জরায়ুকে যথাস্থানে স্থাপন করে রাখতে সাহায্য করে। এ 'হরমন' নিষ্কাষিত না হলে ঋতুস্রাব সংঘটিত হবে এবং ভ্রূণ বাঁচতে পারবে না।

www.nagorikpathagar.org

ভ্রূণের জন্যে এরূপ নিখুঁত ব্যবস্থাপনার অপরিহার্য প্রয়োজনের কথা একমাত্র, বিচক্ষণ বুদ্ধিমান সৃষ্টিকর্তা ছাড়া আর কে বুঝতে পারে? বুদ্ধিমত্তাহীন কোষসমূহ অন্ধ আকস্মিকতার উপর চালিত হয়ে এ প্রয়োজনটা নিশ্চয়ই দেখতে পায় না। কিন্তু ভ্রূণ যখন মাতৃ ডিম্বাশয়ে অন্তরালবর্তী সুরক্ষণায় থাকে, তখন তা কিভাবে পুষ্টিলাভ করতে পারে? শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে কি উপায়ে? অপ্রয়োজনীয় আবর্জনা মল-মূত্র কি করে ত্যাগ করে, কেমন করে সম্পাদন করে অন্যান্য জরুরী কার্যাদি?..... বস্তুত বিস্ময়কর গর্ভ-ফুলের কারণেই এসব কাজ যথাযথ রূপে সম্পাদিত হয়ে থাকে।

'কতিপয় দিন-সপ্তাহ ও মাস-কালের মধ্যেই ভ্রূণ জরায়ু প্রাচীরের মধ্যে খুব দৃঢ়ভাবে স্থির হয়ে দাঁড়ায় এবং ট্রফোব্লাস্ট কোষ গর্ভফুলের মধ্যে দানা বেঁধে ওঠে। একটি গতিময় দেহাঙ্গ-গর্ভফুল, ভ্রূণের পরিবর্তনশীল অবস্থায় প্রয়োজনের সাথে তাল রেখে রেখে ক্রমাগত অব্যাহতভাবে পরিবর্তিত হতে থাকে। সাধারণ অবস্থায় হৃৎপিন্ড, পিত্তকোষ, মূত্রাশয়, অন্ত্র এবং endocrine মাংসগ্রন্থিসমূহ যে কার্য সম্পাদন করে, অন্যান্য বিচিত্র বিচিত্র কার্যাদি ছাড়াও এ জিনিসটি সে সবই করতে পারে।...

একটা প্রতিভু হৃৎপিণ্ড হিসেবে গর্ভফুল মাতৃরক্ত থেকে অক্সিজেন নিষ্কাষণ করে এবং ভ্রূণের রক্তে তা সঞ্চিত করতে থাকে। গর্ভফুল মাতৃ-রক্ত থেকে সর্ব প্রকার পুষ্টিকর উপাদান চূর্ণকৃত ও দ্রবীভূত খাদ্য হজম পূর্বকালে ভ্রূণের পথে টেনে নেয়। গর্ভফুলটি এতই কর্মদক্ষতাপূর্ণ যে, মা'র পুষ্টি গ্রহণের পর এক বা দু'ঘন্টার মধ্যে ভ্রূণ কিছু না কিছু পেয়ে যায়, এ ছাড়া গর্ভফুল জীবনরক্ষক জীবন-রসও (hormone) উৎপাদন করে এবং তদ্বারা মাতৃদেহের ক্ষতি পূরণ করে দেয়।

এভাবে কতগুলি বিস্ময়কর কার্যসম্পাদন করার পরই গর্ভফুলটি মৃত্যুবরণ করে এবং শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রসব পরবর্তী নিষ্কাষণরূপে তা মাতৃগর্ভ থেকে বের হয়ে যায়। এই সমস্ত কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এভাবে করা যায় ঃ

In the 266 days from conception to birth, the single fertilized egg cell becomes a staggeringly complex origanization of some 200 million cells, having increased the orginal weight a billion fold. (Life-P-45)

গর্ভসঞ্চার হওয়া থেকে ভূমিস্যাত হওয়া পর্যন্ত ২৬৬ দিনে (৮মাস ১৮ দিনে) একটিমাত্র উর্বর ডিম্বকোষ প্রায় ২০০ মিলিয়ন কোষের টল্‌টলায়মান জটিল সংগঠনে রূপান্তরিত হয়। তার মৌলিক ওজন বিলিয়ন পর্যায়ে বৃদ্ধি পেয়ে যায়।

www.nagorikpathagar.org

বস্তুত এরূপ নিখুঁত সুন্দর বিস্ময়কর ও উদ্দেশ্যমূলক পদ্ধতি প্রক্রিয়া 'ক্রমবিকাশে'র অধীন হতে পারে না। এ থেকেই উচ্চতর বিচক্ষণতা সম্পন্ন এক মহা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব অকাট্য ও অনস্বীকার্য হয়ে ওঠে। এ জন্যে অপরিহার্য এক অনন্য সাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন সংগঠক ও সৃষ্টিকর্তার। আর এ কথাটি Where there is design there must be a designer—'যেখানে নকশা আছে সেখানে অবশ্যই একজন শিল্পী রয়েছে' কথাটির সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যশীল।— আমরা যতটা বিচক্ষণ স্রষ্টা কল্পনা করতে পারি, মানবজাতির সৃষ্টিকর্তা তার চাইতেও অধিক মাত্রায় দক্ষতা ও বিচক্ষণতা সম্পন্ন স্রষ্টা। ডেভিড এ সৃষ্টিপদ্ধতি দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে অকুণ্ঠিত ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বীকার করেছেন যে, এটা মহান স্রষ্টা কর্তৃকই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বলেছেন ঃ

Your eyes saw even the embryo of me and in your book all its parts were down in writing. (Psalm 139:16)

সমস্ত অংশ 'লিখিত' ছিল কিংবা তালাবদ্ধ ছিল DNA-র মধ্যে একেবারে শুরু থেকেই এবং তা সম্পাদিত হয়েছে মহান স্রষ্টা কর্তৃক।

কিন্তু মানুষ হচ্ছে স্রষ্টার সংখ্যা বহির্ভূত সৃষ্টিকুলের মধ্যে মাত্র একটি সৃষ্টি, মানুষ ছাড়া আরও বহু বহু সৃষ্টি রয়েছে, যা এক মহাশক্তিমান স্রষ্টার অস্তিত্ব অকাট্য-অনস্বীকার্যভাবে প্রমাণ করছে।

প্রাণিজগতে স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ

মানুষের আবিষ্কার-উদ্ভাবনীর সাথে প্রাণিকুল ও কীট-পতঙ্গ মেরুদণ্ডহীন ক্ষুদ্র জীবের লক্ষণীয় প্রতিভার তুলনা করে কম্পিউটার বিজ্ঞানী Dr. W. S. McCul och অনুপ্রাণিত হন এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে ওঠেন ঃ

Actually, computers are clumsy, stupid beasts....They haven't the brains of a retarded ant. (Reader's Digest, May 1962 P-154)

আসলে কম্পিউটার কদাকার দুষ্ট প্রকৃতিক জন্তু.....বিন্দু আকারের পিপীলিকার বুদ্ধিও ওদের নেই।

১৯৬১ সনের নভেম্বর মাসের Natural History বলেছে ঃ

The nervous system of a single starfish, with all its various nerve ganglia and fibers is more complex than London's telephone exchange. (P-17)

একটি মাত্র তারা মাছের স্নায়ু ব্যবস্থা তার বিচিত্র ধরনের স্নায়ু কেন্দ্রসহ আরও জটিল—লন্ডনের টেলিফোন বিনিময় কেন্দ্রের তুলনায়।

www.nagorikpathagar.org

এসব জটিল সংস্থা-সংগঠন একজন সংগঠনকর্তার অপরিহার্যতা প্রমাণ করে এবং তাঁর অস্তিত্বের অবস্থিতি অপরিহার্য করে তোলে। শুধু তা-ই নয়; পশু প্রাণীগুলোকে প্রকৃতি-বিধান কার্যকর করার যোগ্যতায় চিরকালের জন্যে অভিষিক্ত করা হয়েছে—এই তত্ত্বও সেই সত্যকেই অকাট্য-অনস্বীকার্য করে দেয়। ওদের অর্জিত গুণাবলী সে গুলিকে দ্বৈত রচনা করার মানবীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে বার বার বাধাগ্রস্ত করেছে। Bionics the Science of Living Machinc নামক সম্প্রতি প্রকাশিত বইয়ের শেষ পাতায় বলা হয়েছে ঃ

প্রকৌশলীরা জীবন্ত জন্তু-প্রাণীদের কার্যকলাপ থেকে ইংগিতের পর ইংগিত গ্রহণ করেছেন।.... এ মোহনী শক্তির নাম 'Copycat science is bionics'। এ এমন একটা নতুন শব্দ, যা 'অভিধানের শব্দসম্ভারে এখনও শামিল হতে পারে নি।

উড়োজাহাজের ডানা পাখির ডানার অনুকরণে তৈরী করা হয়েছে—গুবরে পোকার উড়োন থেকে গতি-দর্শন গৃহীত। স্নায়ুকোষ গবেষণার ফলে কম্পিউটার উদ্ভাবন করা হয়েছে। প্রাণিদেহের বৈদ্যুতিকতা অধ্যয়ন করে অন্তর্নিহিত উত্তেজক বের করা হয়েছে। আর টেলিভিশন নালি কাঁকড়ার চক্ষুর হুবহু অনুকৃতি। আমরা দেখতে পাচ্ছি, মানুষ খুব বেশী বেশী করে প্রকৃতির নিয়মগুলো প্রয়োগ করছে তার নিজের প্রয়োজন পূরণের কাজে ঃ

বস্তুত মানুষ অনেক কিছুই জানতে চায়। জানতে চায়, তিমি ও শুশুক পানির মধ্যে এত ধারাণাতীত দ্রুতগতিতে চলতে পারছে কী ভাবে। উল্লিখিত বইটিতে বলা হয়েছে ঃ

To swim at the speeds they were obviously achieving the dolphin and the whale were either superpowerfull or they had achieved what the aerodynamic and hydrodynamic engineers call 'laminar flow'. In other words, the water they swim in must follow the contours of the creatures so closely that there are no disturbances at all.....

For decades aeronautical engineers have sought for laminar flow, but with only partial success, despite complicated additional equipment coupled to airoplane wings. (P-55)

দ্রুততর গতিতে সাঁতার কাটার ব্যাপারে ডলফিন ও তিমি হয় অত্যধিক শক্তিমত্তা লাভ করেছে নতুবা ওরা সেই গতি পেয়ে গেছে যাকে বায়ু গতিময়তা ও পানির গতিময়তার প্রকৌশলীরা বলে Laminar Flow; অন্য কথায়, ওরা যে পানিতে সাঁতার কাটে তা অবশ্যই অনুসরণ করে সৃষ্টকুলের

www.nagorikpathagar.org

সীমারেখাকে এত ঘনিষ্ঠভাবে যে, সেখানে আদৌ কোনরূপ বিঘ্নের অবকাশ নেই।

যুগ যুগ ধরে বৈমানিক প্রকৌশলীরা laminar প্রবাহের পিছনে ছুটে আসছে। কিন্তু তারা আংশিক সফলতা পেয়েছে মাত্র বিমানের পাখায় অতিরিক্ত জটিল যন্ত্রপাতি সংযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও।

এ সৃষ্টিগুলো অন্ধ ক্রমবিকাশমূলক দুর্ঘটনার ফলে এ ক্ষমতা ও যোগ্যতা লাভ করেছে—এ কথা তোমরা কী করে বিশ্বাস করতে পার?—একজন অতিশয় বিচক্ষণতাসম্পন্ন স্রষ্টা প্রাকৃতিক নিয়ম বিধানের পূর্ণ মাত্রার জ্ঞান ও উপলব্ধি নিয়ে এ সবের দেহের পরিকল্পনা ও সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন করেছেন, উপরে উদ্ধৃত তত্ত্ব ও তথ্যের আলোকে এটা কি স্পষ্ট ও অনস্বীকার্য হয়ে ওঠে না? মানুষ এ প্রকৃতি থেকেই যখন সব কিছু শিখছে,তখন এ শিক্ষাদানের জন্যে একজন 'শিক্ষকে'র অস্তিত্ব ও অবস্থিতি কি অনস্বীকার্য নয়?

সৃষ্টিকর্তা বহু বিচিত্র ধরনের পশু-পাখির মধ্যে নৌচালনা সংক্রান্ত সহজাত প্রকৃতি (enstinet) সংস্থাপন করে দিয়েছেন, স্রষ্টার অনন্য সাধারণ সৃজনী প্রতিভার এটা একটা অকাট্য প্রমাণ। ১৯৬৪ সনের Marvels and Mysteries of our Animal World বইটিতে পাখির এ বিস্ময়কর ক্ষমতার কথা আলোচিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে ঃ

সীমারেখাহীন মহাসমুদ্রের হাজার হাজার মাইলের উপর পাখিগুলো তাদের পথ নির্ভুল ও নিশ্চিতভাবে দেখতে পায় কি করে—কিরূপে, এটাই বোধ হয় সর্বাধিক জটিল রহস্য। বছরের বেশীর ভাগ সময়ে জলচরদের একটা প্রজাতি প্রশান্ত মহাসাগরের উপরে পথ ভুলে যায়—জাপান থেকে ক্যালিফোর্নিয়া এবং উত্তর দিক থেকে আলেউটিয়ান দ্বীপপুঞ্জের দিকে। তা সত্ত্বেও অস্ট্রেলিয়া উপকূল দূরে রেখে ওদের নীড় রচনাস্থলে এসে পৌছে যায় লক্ষ লক্ষ পাখি—আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন করে—বছরের ঠিক সেই দিনটিতেই।

ওরা কিভাবে এটা করে?—এ পাখিগুলো কিন্তু অধিক বয়স্ক পাখিগুলোর অনুসরণ করে না। অবশ্য প্রাচীনতম কালের একটা পথ-প্রদর্শন-ব্যবস্থা—একটা সহজাত প্রবৃত্তিই ওদের পথ দেখায়, যা ডিমের মধ্যেই ওদের অর্জিত হয়েছিল।

বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন যে, জন্তু ও প্রাণিকুল নৌচালনা সংক্রান্ত জটিল সমস্যা-সম্পর্কিত জ্ঞান অন্য কারুর নিকট থেকে শিখতে পারে না। কেননা মানুষের ন্যায় কার্যকারণ নির্ধারণ ও যুক্তি বিন্যাসের কোন ক্ষমতা ওদের নেই। তা সত্ত্বেও তারকাসমূহের সাহায্যেই ওরা নাবিকের দায়িত্ব পালন করতে পারে। এ জ্ঞান, এ শক্তি ও যোগ্যতা ডিম্বের অভ্যন্তরস্থ জন্ম-সংক্রান্ত উপাদানের মধ্যেই শামিল করে দেয়া হয়েছে। এসব বাস্তব অভিজ্ঞতার ফলাফল ১৯৬৫ সনে The

www.nagorikpathagar.org

Mysterious Senses of Animals বইতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। লেখকগণ তাতে লিখেছেন ঃ

এসব অভিজ্ঞতা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, কালোটুপী পাখিরা সহজাত প্রবৃত্তির বলে তারকাপুঞ্জের এক-একটিকে চিনতে পারে। তারা জানতে পারে যে, তারা রাত্রিকালে আকাশমার্গ অতিক্রম করেছে এবং জানে যে, মৌসুমের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তারকাপুঞ্জেও পরিবর্তন ঘটে।

(পাখিরূপ) এ ক্ষুদ্র উল্লসিত জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মেঘাবরণের মধ্য দিয়ে একটা বা দুটো তারকা দৃশ্যমান হলেও নৌচালনা করতে পারে। কিন্তু আকাশ যদি সম্পূর্ণরূপে মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে তাদের স্থানান্তরে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়।

ওরা ওদের এ গ্রহান্তরে পরিভ্রমণের অসামান্য ও অস্বাভাবিক যোগ্যতা কোত্থেকে অর্জন করে?—কালোটুপী পাখিরা নক্ষত্রপুঞ্জ সংক্রান্ত ভূগোল ও তারকা সংক্রান্ত জ্ঞান বংশানুক্রমে লাভ করেছে। কিন্তু নক্ষত্রপুঞ্জের এক জটিলতম ও জড়ানো পেঁচানো বিষয়ে সহজাত প্রবৃত্তিমূলক জ্ঞান এক ধরনের প্রাণীর জন্ম-জীবাণুতে কী করে এল, বিজ্ঞানীরা এখন পর্যন্ত তার কোন ব্যাখ্যা দিতে পারেননি।

নৌচালনার কাজে যে জটিল পেঁচানো অংকশাস্ত্রীয় জ্ঞান অপরিহার্য, তা পাখিকুলের মধ্যে একটা দুর্ঘটনার ফলে অর্জিত হওয়া সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। এ ধরনের তথ্য ও তত্ত্ব ক্রমবিকাশ মতাদর্শের সাথেও আদৌ খাপ খায় না।

প্রাণিকুলের ও জীব-জন্তুর সহজাত প্রবৃত্তিমূলক বুদ্ধিমত্তার কোন বিশ্লেষণ দান ও কারণ নির্ধারণ করা ক্রমবিকাশ মতাদর্শের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু আসমানী গ্রন্থাবলী তা সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় অতিশয় মর্মস্পর্শী করেই বলে দিয়েছে। জীবন্ত জিনিসের যেখানে যতটা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়, নিঃসন্দেহে বুঝতে হবে যে, তা এক মহা বিচক্ষণ বুদ্ধিমান স্রষ্টা—মহান আল্লাহ্ তা'আলা-ই দান করেছেন।

www.nagorikpathagar.org

মানুষ বিবর্তনবাদ বিশ্বাস করে কেন?

বাস্তব তথ্য ও তত্ত্বসমূহ যখন ক্রমবিকাশবাদের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়, তখন এত মানুষ ক্রমবিকাশবাদকে চূড়ান্ত সত্যরূপে মেনে নিয়েছে কেন? এ প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এর যথার্থ ব্যাখ্যাদান অপরিহার্য।

আমাদের মতে এর বহুবিধ কারণ রয়েছে। তার একটি কারণ হল, সমাজের বালক ও যুবকদের সেই স্কুল জীবনের সূচনা থেকেই ক্রমবিকাশবাদের অবৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহ এক বিজ্ঞানসম্মত চূড়ান্ত সত্যরূপে শেখানো হয় এবং তাদের মন-মগজে তা বদ্ধমূল করে দেয়া হয়। ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন—এমনকি ধর্মীয় (?) দৃষ্টিকোণ থেকেও এ কথাই বোঝানো হয় ছাত্রদেরকে। স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শ্রেণী পর্যন্তকার পাঠ্যপুস্তকসমূহে এ মতাদর্শের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। এটা ক্রমবিকাশবাদী ও ক্রমবিকাশবাদের বিশ্বাসী শিক্ষকদেরই কীর্তি। ক্রমবিকাশবাদী Rostand একথা স্বীকার করেছেন। বলেছেন ঃ

> We are Permeated, saturated, with the transformist idea...we learned it in our school-rooms, we keep repeating mechanically that life evolves, that living things are changed from one into another. (The Orion Book of Evolution. P-95)
>
> আমাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়েছে, ভরপুর করে দেয়া হয়েছে পরিবর্তনকারী ধারণা দ্বারা—আমরা তো তা শিখেছি আমাদের শ্রেণীকক্ষে। আমরা যান্ত্রিকভাবে জীবন বিবর্তিত হওয়ার ধারণা সংরক্ষণ করছি। বিশ্বাস করছি যে, জীবন্ত জিনিসগুলি এক আকৃতি থেকে ভিন্নতর আকৃতিতে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে।

যুগের পর যুগ বংশের পর বংশ ধরে এভাবে শিক্ষাদানের একটা প্রভাব অবশ্যই অবধারিত। বিশেষ করে এ জন্যেও যে, ওসব যুক্তিকে মিথ্যা প্রমাণকারী যুক্তি-প্রমাণাদি আদৌ তাদের সামনে পেশ করা হয় না। ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রমবিকাশবাদী অধ্যাপক বহু ছাত্রদের মধ্যে এ শিক্ষার প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করে বলেছেন ঃ

> It is not that they are aware of the difficulties—and esteem them of little weight or importance; they never heard of them

www.nagorikpathagar.org

and are amazed at the bare possibility of the accepted theory being criticized. (American Scientist. Jan. 1953 P-105)

জটিলতা সম্পর্কে তারা সচেতন, তা নয়। —সেগুলির প্রতি তারা খুব একটা গুরুত্ব বা শ্রদ্ধা পোষণ করে না। তারা এ বিষয়ে কখনই শোনে নি এবং গৃহীত মতাদর্শ খুব একটা সমালোচিত হওয়ার সম্ভাবনা মুক্ত বলে তারা বিস্ময়াভিভূত।

আধুনিক শিক্ষাবর্গীদের মনে ক্রমবিকাশবাদ এ কারণেও বদ্ধমূল হয়ে বসেছে যে, তারা অকারণে মনে করে নিয়েছে, ধর্ম বিশ্ব সৃষ্টি রহস্যের কোন বিজ্ঞানসম্মত বা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দিতে পারে না। কিম্বা ধর্ম যে তত্ত্ব পেশ করে, তার প্রতি তাদের মনে রয়েছে একটা তীব্র অবজ্ঞা ও ঘৃণা। তারা মনে করে, সৃষ্টিপর্যায়ে ধর্মীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বা দৃষ্টিভঙ্গি মেনে নিলে ধর্ম মানতে হয়, মেনে নিতে হয় ধর্মের বিধি-বিধান ও আদেশ-নিষেধ। কিন্তু সে জন্যে তাদের মন-মানসিকতা আদৌ প্রস্তুত নয়। জনৈক বিজ্ঞানীই একথা অকপটে স্বীকার করে বলেছেন ঃ

If man is created, then this implies he was created for a purpose. Which in turn is suggestive of man's responsibility to his maker, (Biblical Flood and Ice Epoch, by Donald W. Patten-1966, P-267)

মানুষ যদি সৃষ্ট হয়ে থাকে, তাহলে তার অর্থ হয় যে, সে নিশ্চয়ই উদ্দেশ্যমূলকভাবে সৃষ্ট হয়েছে। যার অর্থ, তার স্রষ্টার অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে সে বাধ্য।

আর স্রষ্টার নিকট মানুষের দায়িত্বশীল হওয়ার কথা মেনে নিতে তারা কোনক্রমেই প্রস্তুত হতে পারছে না। এই না পারার অবশ্য বৈজ্ঞানিক কারণ কিছুই নেই। কেননা বিজ্ঞানী হয়েও স্যার আর্থার কীথ অকুণ্ঠভাবে বলে দিতে পেরেছেনঃ

Evolution is unproved and unprovable. We believe it only because the only alternative, is special creation and that unthinkable.

বিবর্তন অপ্রমাণিত এবং অপ্রমাণ যোগ্য। তবু আমরা তা বিশ্বাস করি শুধু এজন্য যে, তা বিশ্বাস না করলে তার বিকল্প হিসেবে বিশেষ সৃষ্টি কর্মকে মেনে নিতে হয়। কিন্তু তা আমাদের পক্ষে অচিন্ত্যনীয়।

জিজ্ঞাস্য, এটা কি প্রকৃত বৈজ্ঞানিক আচরণ?

এ কারণে তারা মানুষকেই সৃষ্ট মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। অস্বীকৃতি জানিয়ে তাদের অনেকেই ক্রমবিকাশবাদ ও নাস্তিক্যবাদ মেনে নিয়েছে। ১৯৬৬ সনের এক রিপোর্টে Confession of a Professed Atheist শীর্ষক প্রবন্ধে Aldous Huxley নিজেই স্বীকার করেছেনঃ

www.nagorikpathagar.org

I had motives for not wanting the world to have meaning, consequently assumed that it had none, and was able without any difficulty to find satisfying reasons for this assumption..... For myself, as no doubt for most of my contemporaries, the philosophy of meaninglessness was essentially an instrument of liberation, the liberation we desired was simultaneously liberation from a certain political and economic system and liberation from a certain system of morality. We objected to the morality because it interfered with our sexual freedom. (P-19)

পৃথিবীকে না বুঝাবারই ইচ্ছা আমার ছিল। পরিণতি হিসেবে আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে, এ ধারণা কারুর নেই এবং এ ধারণার যথেষ্ট কারণ বুঝতে কারো অসুবিধা হবে না।—আমার নিজের কথাই বলি, আমার অধিকাংশ সমসাময়িক লোকের কোনই সন্দেহ নেই যে, অর্থহীনতাই ছিল মুক্তি লাভের একটা অপরিহার্য হাতিয়ার। আমরা যুগপৎভাবে নিষ্কৃতি চেয়েছিলাম বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে এবং এক বিশেষ ধরনের নৈতিকতা থেকে। আমরা নৈতিকতার ব্যাপারে আপত্তি জানিয়েছি। কেননা তা আমাদের যৌন স্বাধীনতার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করছিল।

বস্তুত নৈতিক বাধা-বন্ধন ও বিধি-নিষেধ থেকে মুক্তি লাভের ইচ্ছা ও প্রবণতাই হলো ক্রমবিকাশবাদ বিশ্বাস করার মৌল কারণ। আর ক্রমবিকাশ দর্শনে বিশ্বাসীদের-যারা নিজেদের ইতর প্রাণী ও হীন জীবজন্তুর বংশধর বলে মনে করে-কোন নৈতিকতাই থাকতে পারে না। বর্তমান দুনিয়ার ক্রমবিকাশবাদে বিশ্বাসীদের নৈতিক অবস্থা দেখলেই তা অনস্বীকার্য হয়ে ওঠে।

বস্তুত এত মানুষ ক্রমবিকাশবাদের মত একটি সম্পূর্ণ ভুল মতবাদ বিশ্বাস করে কেন, বর্তমান মানুষের দুর্মতি ও নষ্টামী দেখলেই তার কারণটা স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। শত শত বছর ধরে পাপাচারের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর উপর দিয়ে। পাপকার্য ও অপরাধ অনুষ্ঠান ক্রমবর্ধমান। যুদ্ধ, রোগ ও মৃত্যু মানব-বংশকে ধ্বংস করার উপক্রম করেছে। এসব দেখে মানুষ হতবাক, দিশাহীন। মানব জাতির উপর আল্লাহ্ তা'আলা এসব অব্যাহতভাবে কেন চলতে দিচ্ছেন, তা অনেক মানুষেরই বোধগম্য নয়। এ সবের জন্যে কে বা কি দায়ী? একজন মহান ন্যায়বাদী আল্লাহ্ দুনিয়ায় এ অন্যায় ও অশান্তিকে টিকে থাকতে দিচ্ছেন কেন, কেমন করে চলতে দিতে পারেন?—তিনি এসব বন্ধ করেন না কেন? এসব প্রশ্নের নির্ভুল জবাব জানতে না পেরে অনেকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বলে যে, হয় আল্লাহ্ বলতে কেউ নেই, যদি থাকেও, তবু তাঁর কোন প্রত্যক্ষ ক্ষমতা বোধ হয় পৃথিবীতে চলে না বা চলছে না, সে হয়ত মৃতবৎ। এ মুহূর্তে ক্রমবিকাশ সংক্রান্ত ডারউইনী মতাদর্শ আত্মপ্রকাশ করে এবং বলে, আল্লাহ্ বলতে কারুর অস্তিত্ব

www.nagorikpathagar.org

নিষ্প্রয়োজন। তখনি সব মানুষ অনতিবিলম্বে সে মতটি গ্রহণ করে নেয়। এটা নয় যে, তারা এর সমস্যা ও অসুবিধাসমূহ সম্পর্কে খুব সজাগ। সামান্য গুরুত্ব ও মর্যাদা দিয়ে এর প্রতি তারা কোন শ্রদ্ধা বোধ করে তা-ও নয়। তারা ওগুলোর কথা কখনও শোনে নি, তাদের গৃহীত মতাদর্শের যে কোন ত্রুটি থাকতে পারে, তা যে মূলতঃই ভুল হতে পারে, তার সমালোচনাও হতে পারে, ওকথা তারা কল্পনাও করতে পারে না।

ক্রমবিকাশবাদ এতটা জনপ্রিয় হওয়ার মূলে এরই কাছাকাছি আর একটি কারণ রয়েছে। তাহল, প্রায় দেশের শাসনকর্তৃপক্ষ ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ সব সময় এরই উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ ও একশ্রেণীর ধর্মপ্রচারক পাদ্রীরা ক্রমবিকাশবাদকে একটা চূড়ান্ত সত্য রূপে প্রবল শক্তিতে প্রচার করেছেন। তাদের মতে এ-মত অমান্য বা অবিশ্বাস করা বা এ-মতকে ভুল মনে করা মুর্খতারই নামান্তর। এমতাবস্থায় সাধারণ মানুষের পক্ষে তা প্রতিরোধ করা বা তার বিপরীত মত পোষণ করা কতক্ষণ সম্ভব হতে পারে? বিশেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে কৃতিত্ব অর্জন যখন এই মত গ্রহণের উপরই নির্ভর করে, তখন? Evolution, Creation and Science গ্রন্থে জীববিজ্ঞানের জনৈক অধ্যাপক ছাত্র সমাজের উপর এই মতের প্রভাবের কথা স্বীকার করেছেন। বলেছেনঃ

> The thing which repeatedly won them over to acceptance of the theory was sheer weight of authority on the part of scientists though it is not always highly refined method of browbeating. All too frequently if the young aspirant was to keep pace with more seasoned scientists, he was obliged to accept the evolution theory.

কেননা বহু কর্তৃপক্ষীয় মর্যাদার ব্যক্তিরা ক্রমবিকাশবাদের পক্ষে এত বেশী লেখনী চালিয়েছেন যে, সাধারণ মানুষ সহজেই ধরে নিয়েছে যে, এটা অবশ্যই প্রমাণিত সত্য হবে।

ক্রমবিকাশবাদের সপক্ষে লিখিত বিরাট আয়তন গ্রন্থাবলী দেখলে স্বতঃই ধারণা জন্মে যে, এই মতটি প্রমাণিত সত্য না হয়ে যায় না। নতুবা এর সপক্ষে ও সমর্থনে দুনিয়ার উচ্চ জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ এত কিছু লিখবেন কেন? কিন্তু এ সব বই পাঠ করলে, মানব-জন্ম সংক্রান্ত অভিজ্ঞার পরিসংখ্যান দেখলে, নিকট ও দূর থেকে পাওয়া ফসিল পর্যবেক্ষণ করলে, কংকালসমূহের তুলনামূলক আলোচনা করলে কতিপয় প্রজাতিতে সামান্য পরিবর্তন এবং অন্যান্যদের মধ্যে বিরাট স্থিতি ও অপরিবর্তনশীলতা দেখলে এ মতের সত্যতার প্রতি কোন সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন 'মানুষে'র একবিন্দু আস্থা বা শ্রদ্ধা অবশিষ্ট থাকতে পারে না। কেননা, এ মতের সপক্ষে অকাট্য কোন প্রমাণ আদপেই নেই। আর আসলেও এতে সত্য নেই একবিন্দু।

www.nagorikpathagar.org

বিজ্ঞানীদের দায়িত্ব

ক্রমবিকাশবাদ মানুষ কেন বিশ্বাস করে, এ প্রশ্নের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে যা কিছু বলা হল, তা সাধারণ শ্রেণীর শিক্ষিত লোকদের সম্পর্কেই প্রযোজ্য। কিন্তু প্রশ্নটি জটিল হচ্ছে বিজ্ঞানীদের ব্যাপারে। তাদের ক্ষেত্রে ও কথাটি একটা অপবাদ বলে উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা হতে পারে। তাদের বক্তব্য এটা হতে পারে যে, মানুষ স্রষ্টা কর্তৃক উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে সৃষ্ট; একথাটি বিজ্ঞানসম্মত হলে আমরা অবশ্যই তা মেনে নিতাম। কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে তাদের এই কথা সত্য নয়। বিজ্ঞানসম্মত যে কোন তত্ত্বই যে তারা অকপটে মেনে নেয়, এমন কথা সব ক্ষেত্রে সত্য বলে মনে করা যায় না। বিশেষ করে এই ক্ষেত্রে। আমরা বরং স্পষ্ট লক্ষ্য করছি, সৃষ্টি তত্ত্ব পর্যায়ে প্রকৃত সত্য উদঘাটিত হওয়া সত্ত্বেও এবং বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নামে চালিয়ে দেয়া কল্পিত মতের চরম অবৈজ্ঞানিকতা অকাট্য বৈজ্ঞানিক যুক্তির ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়ে যাওয়ার পরও তারা এখন পর্যন্ত সেই প্রত্যাহৃত মতটিকে বুকে জড়িয়ে রেখেছে, যেমন করে স্ত্রী-বানর তার মরে যাওয়া বাচ্চাটিকে জীবন্ত মনে করেই বুকে জড়িয়ে ধরে দৌড়াতে ও লাফাতে থাকে গাছের ডালে ডালে। এই শ্রেণীর বিজ্ঞানীরা এই মরা পচা লাশটি যথাযথভাবে কবরস্থ করার পরিবর্তে নিজেদের কাঁধে বয়ে বেড়াচ্ছে এই আশা বুকে নিয়ে যে, মহাজাগতিক তেজস্ক্রিয়া বিক্ষেপণে তার মৃত দেহে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়ত বা হয়ে যাবে। কিন্তু যা একবার মরে গেছে, তা এ জগতে পুনরুজ্জীবিত হতে পারে না। যে মতটি মিথ্যা ও প্রতারণা বলে প্রমাণিত হয়ে প্রত্যাহৃত হয়েছে, তা আবার মানুষ সত্য বলে বিশ্বাস করবে, তা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। এই কথাটি বিজ্ঞানীদের কোন অবস্থায়ই ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

বিজ্ঞানীদের সম্পর্কে সাধারণত এরূপ ধারণা পোষণ করা হয় যে, তাঁরা খুবই উদারপন্থী, উন্মুক্ত মন এবং বিদ্বেষহীন; তাঁদের আচরণ সব সময়ই ভারসাম্যপূর্ণ। কোন বিশেষ মতাদর্শের প্রতি তাঁদের কোন আবেগপূর্ণ আকর্ষণ বা বিদ্বেষপূর্ণ ঘৃণা সাধারণত থাকে না। তাঁরা হন সত্যানুসন্ধানী এবং এটাই তাঁদের একমাত্র বৈশিষ্ট্য। যা সত্য তার রূপ ও পরিণতি যা-ই হোক না কেন—তাকেই তারা হাসিমুখে বরণ করে নেন। এ কারণেই বিজ্ঞান জগতে প্রাচীন মতাদর্শ প্রত্যাহৃত হওয়া এবং তদস্থলে নবতর মতাদর্শের প্রতিষ্ঠিত হওয়া একটি অতি-সাধারণ ও নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিজ্ঞানীরা খুব-ই নিরাসক্তভাবে প্রত্যাহৃত

www.nagorikpathagar.org

মতাদর্শের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং নবপ্রতিষ্ঠিত মতকে অকুণ্ঠ চিত্তে গ্রহণ করে। তাদের ক্ষেত্রে এটাই তো স্বাভাবিক এবং এটাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার, ক্রমবিকাশ মতাদর্শে (Theory of Evolution) ক্ষেত্রে আমরা বিজ্ঞানীদের আচরণ ও ভূমিকা সম্পূর্ণ ভিন্নতর দেখতে পাচ্ছি। আমরা লক্ষ্য করছি, ক্রমবিকাশ মতাদর্শের চরম পরাজয় বরণ এবং বাতিল ও অন্তঃসারশূন্য প্রমাণিত হওয়ার পরও বহু সংখ্যক বিজ্ঞানী এই মতের মৃত লাশকে নিজেদের বুকে জড়িয়ে রেখেছেন। কিন্তু তার কারণ কি?

তার কারণ একটাই হতে পারে। আর তা হচ্ছে, নিরাসক্তি ও উদারতা প্রদর্শিত হয় কেবল সেসব মতবাদের ক্ষেত্রে, যা নিতান্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব পর্যন্তই সীমিত, ব্যক্তির নিজের সাথে যার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু মানবজীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট মতবাদ মতাদর্শের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্নতর অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। মানবজীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট মতবাদ ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ার দ্বারা যথেষ্টভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকে। বিজ্ঞানীরাও মানুষ, আর প্রত্যেকটি মানুষই নিজেদের ব্যাপারে কোন না কোন নিজস্ব মতাদর্শ খুব গুরুত্বের সঙ্গেই পোষণ করে থাকে। মতবাদের ব্যাপারে মানুষের একটা স্বাভাবিক আসক্তি ও আকর্ষণ রয়েছে। জীবন ও বিশ্বলোক সম্পর্কে কোন-না কোন ব্যক্তিগত মতাদর্শ পোষণ করতে প্রত্যেকটি মানুষই বাধ্য। সে মতবাদ আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসমূলক হতে পারে, হতে পারে আত্মপূজা সংক্রান্ত, হতে পারে বস্তুবাদী কিংবা মূর্তি পূজাভিত্তিক। মানুষের যে ধরনেরই হোক, প্রত্যেকটি মানুষ একটা না একটা সহজাত মতবাদ অবশ্যই পোষণ করে। মতবাদ ছাড়া মানুষের জীবন অচল, ধারণাতীত। চিন্তাশীল মনের স্বাভাবিক পিপাসা নিবৃত্তকরণ এবং জীবনের অনিবার্য তাকীদ পরিপূরণের জন্যেই তা অপরিহার্য। মানুষ স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বলোকের রহস্য উদঘাটনে চির সচেষ্ট। এ ছাড়া মানব মন কিছুমাত্র সান্ত্বনা পেতে পারে না। কাজেই মানুষের জন্যে প্রয়োজন জীবন ও বিশ্বলোক সম্পর্কে এমন একটা মতাদর্শ, যা তার মন ও মানসের পিপাসা নিবৃত্ত ও চরিতার্থ করবে এবং যা তার রহস্য উদঘাটন স্পৃহাকে পরিতৃপ্ত করবে। সে যখন তেমন কোন মতাদর্শ লাভ করে বসে, তখন সে সেটিকে একটা নিছক চিন্তামূলক মতবাদ হিসেবেই গ্রহণ করে না, তার সাথে তার মনের আবেগ উচ্ছ্বাস ও সংবেদনও গভীরভাবে জড়িত হয়ে যায়। মনের কল্পনার মাধুরী দিয়ে তাকে সে সুন্দর ও শোভনীয় লোভনীয় করে তোলে। এ ব্যাপারে শিক্ষিত অশিক্ষিত সব মানুষই সমান। বুদ্ধিজীবী ও বিজ্ঞানীরাও এ থেকে ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু মনের সুষমা দিয়ে গৃহীত মতাদর্শ যখন বিজ্ঞান ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার কষ্টিপাথরে অনুত্তীর্ণ ও পরাজিত হয়ে যায়, তখন সে কঠিন মর্মাঘাত অনুভব করে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল বাস্তবভাবে গ্রহণ করার জন্যে তার মন কিছুমাত্র উৎসাহ বোধ করে না। তখনো সেই বাতিল মতবাদটিকে নিজের বুকের সংগে জড়িয়ে রাখতেই সে ভালোবাসে। বিশেষত বিকল্প ও তৃপ্তিদায়ক কোন মতাদর্শ যখন অনুপস্থিত, তখন

www.nagorikpathagar.org

এরূপ অবস্থার অভিনয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। ক্রমবিকাশ মতাদর্শ বাতিল প্রমাণ হওয়ার পরও এক শ্রেণীর বিজ্ঞানীদের এই অবস্থা হাস্যোদ্দীপক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কুরআনের পথনির্দেশ

ধর্মবিশ্বাস মানুষকে একটা জীবন দর্শন দিয়েছিল। কিন্তু কালস্রোতের ঘাত-প্রতিঘাতে এবং জাতীয় উত্থান ও পতনের ফলে কোন কোন ধর্মমতে অনেকটা বিকৃতি ঘটে যায়। ফলে তা পাশ্চাত্যে বুদ্ধিজীবিদের মনকে সান্ত্বনা দিতে পারে নি। অতঃপর তারা নতুন মতাদর্শের জন্যে পাগলপারা হয়ে ওঠে। ক্রমবিকাশ মতাদর্শে তাদের এই অনুসন্ধান স্পৃহা পরিতৃপ্তি ও চরিতার্থতা লাভ করে আর তাই অমনি তারা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। উত্তরকালে বিজ্ঞানের নব আবিষ্কারে বংশানুক্রমিক সংক্রমণ বিধান উদঘাটিত হল, আর তা-ই বিবর্তনমূলক মতাদর্শকে মূলোৎপাটিত করে দিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তা ত্যাগ করতে প্রস্তুত হচ্ছে না। তার কারণ, তা ত্যাগ করতে তাদের মনে বড় ব্যথা অনুভূত হয়। এক মহাশূন্যতা যেন চারদিক থেকে এসে তাদের গ্রাস করে ফেলে। কেননা তার পরিবর্তে বিকল্প কোন মতাদর্শ লাভ করা তাদের পক্ষে এখনও পর্যন্ত সম্ভব হয় নি, যাকে এ শূন্যস্থানে বসিয়ে তারা নিজেদের মন ও মানসকে সান্ত্বনা দিতে পারেন। বিজ্ঞানীরা তাই নিরুপায় হয়ে এই মতাদর্শের লাশ বহন করে চলেছেন এই আশা নিয়ে যে, হয়ত কোনক্রমে তাতে নতুন প্রাণের সঞ্চার হবে।

কোন-না কোন জীবন-দর্শনের সন্ধান মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা। এ বিশ্বলোক কি করে অস্তিত্ব লাভ করল এবং কেন করল, কি তার লক্ষ্য ও মূল্য? এসব প্রশ্নের সুস্পষ্ট জবাব মানুষ পেতে চায়। আর এ প্রশ্নের যা জবাব তার স্বরূপই তার সমগ্র জীবনের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত করে। তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভূমিকা তারই পরিবেশের মধ্যে লালিত-পালিত হয়। এভাবে বিজ্ঞানের এ মৌলিক প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। আর এ গুরুত্বের প্রেক্ষিতেই প্রকৃতি মানুষের স্বভাবের মধ্যে অনুসন্ধিৎসার আগুন প্রোজ্জ্বলিত করেছে। অন্যথায় জন্তু-জানোয়ারের মত পেট ভরে খেয়ে ও পা বিছিয়ে শুয়ে থেকে দিন গুজরান করতে কোন অসুবিধা ছিল না মানুষের পক্ষে। ইসলাম এমন এক আদর্শ যা জ্ঞান-বিজ্ঞান সংক্রান্ত ও মৌলিক প্রশ্নের অনিবার্যতার প্রতি মানুষকে কৌতূহলী হতে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিমানুষকে বিশ্ব-সৃষ্টির গভীর সূক্ষ্ম রহস্যের দ্বার উদঘাটনে অনুসন্ধান-তৎপর হতে অনুপ্রাণিত করেছে। কুরআন মজীদই মানুষকে সম্বোধন করে আকুল আহবান জানিয়েছে ঃ

قُلْ سِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ-

হে মুহাম্মাদ, এই লোকদের বলে দাও, তারা যেন দুনিয়ার দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে, পৃথিবীর পরতে পরতে অনুসন্ধান চালায় যে, বিশ্বলোকের সৃষ্টির সূচনা কেমন করে হল—সৃষ্টির শুরুটা কি রকমের ছিল।'

www.nagorikpathagar.org

এরূপ নির্দেশ দেয়ার মূলে এ লক্ষ্য নিহিত ছিল যে, অনুসন্ধান, খোঁজ-খবর নেয়া ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর ফলে যে মহাসত্য উদঘাটিত হবে, তা থেকেই সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। আর এ উদ্দেশ্য নির্ধারণেই গড়ে উঠবে আমাদের জীবন-দর্শন। তা-ই হবে আমাদের জীবন-ব্যবস্থা এবং সব ক্ষেত্রে ও কাজের ব্যাপারে পথ প্রদর্শক ও সংরক্ষক।

স্বভাবগত অনুসন্ধিৎসার রহস্য হচ্ছে পর্যবেক্ষণ ও বুদ্ধিবিচার এবং হৃদয়াবেগের পথনির্দেশে বিবেক ও দিলের ভারসাম্যপূর্ণ সংমিশ্রণের সাহায্যে বিশ্ব সৃষ্টির আসল কার্যকারণ নির্ধারণ করা। এ জন্যে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ

এই লোকেরা কি লক্ষ্য করে নি আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টির সূচনা কেমন করে করেন এবং পরে সৃষ্টি পুনরাবৃত্তিই বা করেন কিরূপে।

এ আয়াতদ্বয়ের বর্ণনাভঙ্গী থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সৃষ্টিরহস্য উদঘাটন মানবীয় যোগ্যতা ও ক্ষমতার পক্ষে কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। বস্তুত সৃষ্টির সূচনা ও সৃষ্টির পুনরাবৃত্তির গভীর রহস্য মানুষের বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা-গবেষণা শক্তির আওতা-বহির্ভূত নয়। তার উদঘাটন মানুষের পক্ষেই সম্ভব।

এ কারণেই মানুষ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে ছড়িয়ে পড়ে বন্দরে বন্দরে আতি-পাঁতি করে খুঁজে বেড়িয়েছে। আর সে অনুসন্ধান-অভিযানের ফলে যা কিছু লাভ করা গেছে, তা হল এই যে, বিশ্বলোকের বিন্দু-বিন্দু সৃষ্টি-সংক্রান্ত বিস্ময়কর জ্ঞান-তথ্য প্রতি পদে পদে কোন মহাজ্ঞানী ও মহাশক্তিমান সৃষ্টিকর্তারই সন্ধান দেয়। বস্তুর বিশেষত্ব নির্ধারণ আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত করে বিশ্বপ্রকৃতিতে নিহিত সর্বাত্মক ও বিস্ময়কর নিয়ম ও শৃংখলা। বস্তু ও শক্তির কার্যক্রম এবং প্রতিক্রিয়া থেকে একটা সুসংগঠিত ও শৃংখলাবদ্ধ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সন্ধান পাওয়া যায় অতি সহজেই। জীবনের নানাবিধ প্রকাশ ও অভিব্যক্তি, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও ইচ্ছাশক্তির অবস্থিতির কথা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়। আর মানুষের বুদ্ধি ও অন্তঃকরণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যের সূক্ষ্ম ও জটিল রহস্য আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট করে তোলে। এ রহস্যময় বিশ্বচরাচরের আবরণ উন্মোচন হয়ে রয়েছে।

বিজ্ঞানীরা বলেন, প্রতিটি ধূলি-কণার এক-একটি স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বিশ্বলোক বিরাজ করছে। 'বস্তু'র ক্ষুদ্রতম 'একক' (unit) হল Atom বা পরমাণু। তা অনণুবীক্ষণ যন্ত্রেও ধরা পড়ে না। তার অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে, তার কেন্দ্রমূলে ধনাত্মক (Positive) বিদ্যুৎশক্তির বিরাট সমারোহ প্রোটন (Proton) নামে সৌরলোকে অবস্থিত সূর্যের মতই বিরাজমান। আর তার চারিপার্শ্বে ঋণাত্মক (Negative) বিদ্যুৎ শক্তির অধিকারী বিন্দু ইলেকট্রন (Electron) নামে

www.nagorikpathagar.org

উপগ্রহের ন্যায় চির আবর্তনশীল হয়ে রয়েছে। এ ছাড়া তারকার ন্যায় সহস্র বিদ্যুৎবিন্দু Neutron রাজদরবারে মুসাহিবদের ন্যায় হাতজোড় করে দণ্ডায়মান। এ সীমা-সংখ্যাহীন অণু-পরমাণু এত বিপুল মাত্রায় বিদ্যুৎ শক্তির অধিকারী, যাকে চূর্ণ করেই আণবিক ও হাইড্রোজেন বোমা আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। কোন দুর্ঘটনা বা আকস্মিকভাবে সংঘটিত ব্যাপার হিসেবে অস্তিত্ব লাভকারী বিশ্বলোকের অবস্থা এরকম তো হতেই পারে না। প্রত্যেকটি পরমাণুর অভ্যন্তরে এক বিশাল সৌরলোকের অবস্থিতি কোন উদ্দেশ্যপরায়ণ স্রষ্টার অস্তিত্বের সন্ধান দেয় না কি?

বিজ্ঞানীদের স্বীকৃতি

প্রাণিজগতের বিস্ময়কর কার্যক্রম ভাষায় অবর্ণনীয়। জীবনে স্থিতির জন্যে কত না জটিল ও সূক্ষ্মতম ব্যবস্থাপনা গৃহীত হয়েছে। জীববিদ্যার (Biology গ্রন্থাদিতে এসব বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। বংশানুক্রমিকতা ও প্রজননশীলতার কার্যক্রম কি রকম অব্যাহত ও নিরবচ্ছিন্নভাবে চালু হয়ে আছে, তা চিন্তা করলেও স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। উদ্ভিদ জগতে নিত্য অনুষ্ঠিত যৌন সংযোগ ও সঙ্গম সংক্রান্ত বিদ্যা সম্পর্কে পাশ্চাত্যজগত অতিসম্প্রতি অবহিত হতে পেরেছে। অথচ কুরআন মজীদ চৌদ্দশ বছর পূর্বেই ঘোষণা করেছে ঃ

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الْاَرْضِ كَمْ اَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ-

এই লোকেরা কি ভূপৃষ্ঠের প্রতি লক্ষ্য করে দেখে না, আমরা কিভাবে সেখানে প্রত্যেক জীবনীসত্তার জন্যে জুড়ি বানিয়ে দিয়েছি, যা পুরুষ ও স্ত্রী রূপে পরস্পরের প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে মিলিত হচ্ছে।

উদ্ভিদ জগতে এ কাজটি দু'ভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। একদিকে একই গাছে পুরুষ ও স্ত্রী অংশ স্বতন্ত্রভাবে রক্ষিত হয়েছে; কিন্তু তার বিভিন্ন অংশ এত কাছাকাছি অবস্থিত ও তাদের মধ্যে এমন আকর্ষণ রয়েছে যে, তা যথাযথ সময়ে স্বতঃই যৌনমিলনে প্রবৃত্ত হয়। আর একটি রূপ হচ্ছে, অংকুর ও গাছে পুংশক্তি ও স্ত্রীশক্তি স্বতন্ত্র এককের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও পুংবৃক্ষ ও স্ত্রীবৃক্ষ উভয়ের প্রজনন শুক্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাখি ও কীট-পতঙ্গের আকর্ষণীয় রং গন্ধ ও স্বাদ প্রভৃতি সামগ্রী বিপুলভাবে জমিয়ে রাখা হয়েছে। যার ফলে কীট-পতঙ্গ ও পাখি সেসব আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে সেখানে উপস্থিত হয় এবং তার সাথে সম্পর্ক স্থাপনকালে পুংবৃক্ষের প্রজনন শুক্র নিয়ে স্ত্রী-বৃক্ষের প্রজনন শুক্রের সাথে সংমিশ্রিত করে দেয়। বংশরক্ষা ও বংশবৃদ্ধির এই যে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা সমগ্র জগত জুড়ে চিরন্তনভাবে কার্যকর, এ তো আর একটা নিছক দুর্ঘটনাজনিত ব্যাপার হতে পারে না। বরং এ থেকে গোটা সৃষ্টিকর্মের উদ্দেশ্যমূলক হওয়ার এবং এর পশ্চাতে কোন প্রবল ইচ্ছাশক্তির অন্তর্হিত থাকার কথাই অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়।

www.nagorikpathagar.org

উদ্ভিদ জগত যেহেতু স্বভাবতঃই ইচ্ছাশক্তি ও গতিশীলতা-বঞ্চিত, সেকারণে এখানে বংশরক্ষা ও বংশবৃদ্ধির কাজ অব্যাহত রাখার জন্যে এই স্বভাবকেন্দ্রিক ব্যবস্থাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু জীব জগতের বিভিন্ন পর্যায়ে গতিশীলতা ও ইচ্ছাশক্তি অবস্থিতি অবশ্যই কাম্য ছিল। জীব জগতে যৌনমিলন তাদের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল করে দেয়া হলে পাশবিক পরিকল্পনা, খোদায়ী পরিকল্পনার ব্যর্থতার কারণ ঘটাতে পারত। এ কারণে আল্লাহ্ তা'আলা যৌনমিলন-কার্যক্রমকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় বানিয়ে দিয়েছেন, প্রতিটি জীব—পুরুষ-স্ত্রী—নিতান্ত স্বভাবের তাড়না ও স্বতঃপ্রবৃত্ত যৌন আকর্ষণের তীব্রতায় সে কাজে প্রবৃত্ত হয়ে পড়ে। এ কাজটিকে জৈবিক কার্যাবলীর মধ্যে সবচেয়ে অধিক সুস্বাদুপূর্ণ ও আনন্দদায়ক বানিয়ে দেয়া হয়েছে। এক মহাশক্তির ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যপরায়ণতা প্রমাণের জন্যে এর চেয়েও বড় কোন সাক্ষ্যের প্রয়োজন আছে কি? তাহলে সৃষ্টিরহস্য উদঘাটনকারী বিজ্ঞানীরা আল্লাহ্র অপরিহার্য অস্তিত্বকে অস্বীকার করবেন কি করে? কোন্ যুক্তিতে?

উদ্ভিদ জগতে 'সন্তান' পিতা-মাতার দেহের অংশ হয়ে থেকে নিজে নিজেই লালিত-পালিত হচ্ছে। সেজন্যে স্বতন্ত্রভাবে ও বিশেষ ধরনে কোন লালন-পালন ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন হয় নি। কিন্তু জীবজগতে জীবের ইচ্ছা এখ্তিয়ার ও কর্মের স্বাধীনতার কারণে সন্তান পালন একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াতে পারত। এখানে যৌনক্রিয়া নিরতিশয় স্বাদপূর্ণ ও তৃপ্তিদায়ক হওয়ার কারণে প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির কাজ তো অব্যাহতভাবে চলার ব্যবস্থা হয়েছে; কিন্তু সন্তানের জন্যে পিতা-মাতার অন্তরে গভীর অপত্যস্নেহ মমতা-বাৎসল্য—বিশেষ করে মা'র হৃদয়ে অবস্থিত না থাকলে প্রসূতিদের চরমভাবে অবহেলিত ও উপেক্ষিত হওয়া এবং পরিণতিতে ধ্বংস হয়ে যাওয়া ছিল অবধারিত। আর তার ফলে বংশরক্ষা ও বংশবৃদ্ধির কাজটি সম্পূর্ণ অচল হয়ে যেত। এ কারণেই মা-বাবার অন্তরে এই গভীর স্নেহ-বাৎসল্যের উদ্রেক করা হয়েছে। যা সন্তানের লালন-পালন ও বড় হয়ে নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার উপযোগী হওয়া পর্যন্ত তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পিতা-মাতাকে বাধ্য করেছে। জীব-বংশ রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্যে স্বভাবগত এই ব্যবস্থা কি আপনা-আপনিই কার্যকর হয়েছে? এই বিরাট ব্যবস্থাও কি একটা দুর্ঘটনা মাত্র? একটা পূর্ব পরিকল্পনাহীন ব্যাপার?

জীব-জন্তুর জন্মের দুটি পদ্ধতিই সম্ভব ছিল। গর্ভ সঞ্চার হওয়ার পর ভ্রূণ হয়ে মার গর্ভে থেকে লালিত-পালিত হয়ে পূর্ণাঙ্গ শিশু হয়ে ভূমিষ্ঠ হবে; কিংবা তার পূর্বেই ডিম্বের আকারে মা'র গর্ভ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। প্রাণিজগতে এ দুটো পন্থাই অনুসৃত হয়েছে। প্রথমটিতে গর্ভকালীন ভ্রূণের লালন-পালনের জন্যে মা'র নিজের রক্ত কাজ করে। কিন্তু দ্বিতীয় পন্থায় ডিম্ব মা'র গর্ভ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর তার মধ্যে পূর্ণাঙ্গ শাবকের লালিত পালিত হওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে বলে ডিম্বের মধ্যেই এতখানি খাদ্যপ্রাণ সংরক্ষিত হওয়া জরুরী ছিল, যা শাবকের পূর্ণাঙ্গ দেহ গঠনের জন্যে অপরিহার্য। সেই সঙ্গে ভ্রূণের জীবাণু সত্তা ও তার

www.nagorikpathagar.org

খাদ্যসম্ভার একটি দৃঢ় প্রাচীরের মধ্যে সুরক্ষিত হয়ে থাকে। শুধু তা-ই নয়, অত্যন্ত দুর্বোধ্যভাবে তাতে খাদ্যপ্রাণের স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ধীরে ধীরে রক্তে পরিবর্তিত হওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

মুরগীর যে ডিম আমরা খাওয়ার জন্যে সিদ্ধ করি, তাতে প্রচুর পরিমাণ খাদ্যপ্রাণ মওজুদ থাকে। কিন্তু সেই ডিমকেই যদি প্রয়োজন পরিমাণ তাপে সিদ্ধ করার ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে জীবাণু কোষ ভ্রূণের খাদ্যপ্রাণ যন্ত্রের সাহায্যে ধীরে ধীরে রক্তে পরিণত হতে পারে। এই রক্তই ভ্রূণের লালিত পালিত হয়ে বড় ও পূর্ণাঙ্গ হওয়ার ব্যবস্থা করে দেয়। তাতে অস্থি, মাংস, চামড়া এবং অন্যান্য অংশ ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। শেষকালে তা লোম ও পালকে 'সশস্ত্র' হয়ে এতখানি শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে, চঞ্চুর উপর সদ্য গজিয়ে ওঠা শিং-এর সাহায্যে বহিপ্রাচীর ভেদ করে আপনিই বাইরে বের হয়ে আসা ওর পক্ষে সম্ভবপর হয়। মায়ের গর্ভে লালন পালন গ্রহণকারী ভ্রূণে তো খাদ্যপ্রাণকে রক্তে পরিণত করার সামর্থ্য থাকে না। কিন্তু ডিমের অভ্যন্তরে লালন পালন গ্রহণকারী ভ্রূণের এ যোগ্যতা বর্তমান। জৈব শুক্রে অবস্থিত কোন অন্ধ-নির্বোধ ক্রমবিকাশমুখী আবেগ দ্বারা তো এটা সম্ভব হতে পারে না। এটা নিরংকুশ শক্তির অধিকারী ও সর্বজ্ঞ-সর্বদ্রষ্টা মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছার ফলেই সম্ভব হচ্ছে, তা অস্বীকার করার উপায় আছে কি?

একক ভ্রূণ-কোষ থেকেই অস্থি, মাংস, রক্ত, স্নায়ু ও বিভিন্ন প্রধান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিচ্ছিন্নতাবাদী কোষ সৃষ্টি এবং প্রত্যেকটির এক একটি বিশেষ কাজে নিযুক্ত হয়ে দৈহিক আকার-আকৃতির পূর্ণত্ব দান বাস্তবিকই এক বিস্ময়কর ব্যাপার। তা থেকে কি এক মহাশক্তিমান স্রষ্টার অসীম কুদরতের পরিচয় পাওয়া যায় না?[১]

প্রকৃতির বিচিত্র সৃজনী কর্মকুশলতায় পানি হচ্ছে এক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। বস্তুর বিভিন্ন রূপের মধ্যে পারস্পরিক রসায়ন ক্রিয়ার সবচেয়ে বড় উপাদান হল এই পানি। জীবনবৃক্ষের উর্বরতা এই পানিতেই নিহিত। অথচ বলতে গেলে তা হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন-এর দু'টি গ্যাসের সংমিশ্রণ মাত্র। এর একটি জ্বলে, আর অপরটি জ্বালায়। কিন্তু পানিতে এই বিশেষত্ব নেই। রাসায়নিক যৌগিক পদার্থের বিশেষত্ব ও গুণাগুণ তার মৌল উপাদানসমূহের বিশেষত্ব থেকে এত ভিন্নতর হয় কেন? তার একটা ব্যাখ্যাই সম্ভব। তা হল এই যে, বিভিন্ন বিশেষত্বের উপর বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য এক বিশেষ পরিকল্পনাধীন চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। পানিকে যেহেতু সৃজনশীল কর্মকুশলতায় বিরাট ভূমিকা পালন করতে হয়,

১. জনৈক বিজ্ঞানীর স্বতঃস্ফূর্ত জিজ্ঞাসাঃ

মানবদেহ একটা 'বিউটিফুল স্ট্রাকচার'। মায়ের গর্ভের ভেতর থেকে কে এই ড্রইং আর ডিজাইন, রক্ত মাংসের এমন নিখুঁত ব্যালেন্স স্থির করে দিয়েছে?....ইজ্ দেয়ার এনি আর্কিটেক্ট?

www.nagorikpathagar.org

এজন্যে তাতে এক বিশেষ ধরনের বিশেষত্ব ভরে দেয়া হয়েছে, যা তার যৌগিক উপাদান—অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের মধ্যে বিন্দুমাত্র নেই।

পর্বতের উচ্চমার্গে, স্থলভাগের পরতে পরতে এবং সমুদ্রের গভীরতায়-সর্বত্র উদ্ভিজ্জ ও জৈবিক জীবনের উৎস সৃষ্টির জন্যে পানিকে পৌঁছতে হয়, এ জন্য তাকে তরল ও সহজ প্রবহমান বানিয়ে দেয়া হয়েছে। আর সামান্য উত্তাপে বাষ্প হয়ে ঊর্ধ্বগমন, হালকা হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়া, শূন্যলোকে শত সহস্র মাইল উড়ে যাওয়া এবং পুনরায় উচ্চমার্গের তীব্র শৈত্যে সংকুচিত-ঘনীভূত ও ভারী হয়ে বৃষ্টি রূপে বর্ষিত হওয়া পানির পক্ষে খুবই সহজ কাজ করে দেয়া হয়েছে। পাহাড় পর্বত মরু উপত্যকা ও সমতল ভূমিতে বন্যা প্রবাহিত করে আবার সমুদ্রে ফিরে আসাই হল পানির নিত্যকার কাজ।

সমুদ্র হচ্ছে অসংখ্য জৈবজীবনের লীলা-কেন্দ্র। শীতকালে পানি বরফ হয়ে যায়। আর গ্রীষ্মে তা গলে চারদিকে প্রবাহিত হতে থাকে। উত্তাপে গলে যাওয়া ও শীতে জমে যাওয়ার গুণ সর্বপ্রকার ও সর্বরূপের বস্তুতে বর্তমান। পানিতেও এই গুণ রয়েছে। কিন্তু পানির এই গুণ যদি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হত এবং এতে কোনরূপ ব্যতিক্রম সূচিত হতে না পারত, তাহলে শীতের তীব্রতায় সমুদ্রের পানি জমে ভারী হয়ে যেত। শেষ পর্যন্ত গোটা সমুদ্র প্রস্তরে পরিণত হত ও সমুদ্রের সব প্রাণী ধ্বংসপ্রাপ্ত হত। এ বিপদ থেকে প্রাণীকুলকে রক্ষা করার জন্যে এ ব্যবস্থা করা হয়েছে, পানি বরফ ও ভারী হয়ে গিয়ে গভীরে বসে যাওয়ার পরিবর্তে তা হালকা হয়ে সমুদ্রের উপরিভাগে ভাসতে থাকে। তার ফলে নিচের দিকে ঈষদুষ্ণ গরম পানিতে সামুদ্রিক জীব জন্তু বাইরের শৈত্য থেকে সুরক্ষিত থাকতে ও নির্বিঘ্নে সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে পারছে। এ কাজের সুষ্ঠুতা ও পূর্ণত্বের জন্যে শৈত্যে সংকুচিত হওয়া ও গ্রীষ্মে সম্প্রসারিত হওয়ার সাধারণ নিয়মে কেবলমাত্র পানির ব্যাপারে তার জমে যাওয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে বিশেষ সংশোধনী রক্ষিত হয়েছে। এরই ফলে সেই চূড়ান্ত পর্যায়ে ভিন্নতর অবস্থার সৃষ্টি হওয়া সম্ভবপর হচ্ছে।

প্রকৃতি নির্ধারিত স্থায়ী নিয়ম-বিধানের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম করার কোন সাধ্য 'বস্তু'র নেই। কোন মহাশক্তিমান সত্তার অস্তিত্ব না থাকলে এরূপ সংশোধনী বা ব্যতিক্রম কখনো কার্যকর হতে পারত না। বিশ্ব লোকের একচ্ছত্র অধিপতি স্বীয় বিশেষ ক্ষমতাবলে এরূপ বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। পানিকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা যেন স্থায়ী প্রাকৃতিক নিয়মের সম্পূর্ণ পরিপন্থী ৪ সেন্টিগ্রেড-এর পর অধিক শৈত্যের কারণে সংকুচিত হওয়ার পরিবর্তে সম্প্রসারিত হতে শুরু করে এবং ক্রমশ তা ছড়িয়ে পড়তেই থাকে। শেষ পর্যন্ত তা শূন্য সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত পৌঁছে জমে যাবে, বরফ হয়ে যাবে ও হালকা হওয়ার কারণে সমুদ্রের উপরিভাগে সাঁতার কাটতে থাকবে। পানি নিজে না কোন দার্শনিক, না বিজ্ঞানী। প্রাকৃতিক নিয়মও তার কিছুই জানা নেই। কেবলমাত্র একটা জিনিসই তার আয়ত্ত, আর তা

www.nagorikpathagar.org

হল, বিশ্বনিয়ন্তা আল্লাহ্‌র নির্দেশিত নিয়ম তাকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে। কেবল পানির বেলায় প্রাকৃতিক নিয়মে এ বিশেষ সংশোধনী ব্যবস্থা রয়েছে এবং এর ফলে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, তাঁর ইচ্ছা ও সৃষ্টি-উদ্দেশ্য দিনের আলোর মতই ভাস্বর হয়ে ওঠে, তা কেউ-ই অস্বীকার করতে পারে না। বিজ্ঞানের সব পাঠ্য-পুস্তকে প্রাকৃতিক নিয়মে এই বিশেষ সংশোধনী ও ব্যতিক্রমকে 'প্রাকৃতিক দুর্বোধ্য অনুকম্পা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্তর্দৃষ্টিবঞ্চিত বুদ্ধিজীবীরা 'অনুকম্পা' তো দেখতে পাচ্ছে; কিন্তু না বুঝতে পেরে তাকে 'দুর্বোধ্য' বলেই দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চাইছে। তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের জন্যে এটা কি লজ্জার বিষয় নয়?

জীবন পথের প্রতি পদে পদে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের সুস্পষ্ট নিদর্শন চোখের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কুরআন মজীদের বিরাট অংশ এসব নিদর্শনের পর্যবেক্ষণ ও সে বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করার আকুল আহ্বানে ভরপুর হয়ে রয়েছে। কুরআন মজীদ এ ধরনের নিদর্শনের বার বার উল্লেখ করে এবং যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে তা মানুষের মনে দৃঢ়মূল করার চেষ্টা চালিয়েছে। জ্ঞান ও বিবেক বুদ্ধি বিশ্বলোকের অস্তিত্ব পর্যায়ে তিনটি কথাই চিন্তা করতে পারে-এ তিনটি কথা ছাড়া এ পর্যায়ে অন্য কোন সম্ভাবনা-ই থাকতে পারে না। সে তিনটি কথা হল ঃ

১. এই বিশ্বলোক এবং এখানে জীবনের উদগম কোন সৃষ্টিকর্তা ব্যতীতই সম্ভবপর হয়েছে, অস্তিত্ব লাভের কোন নিজস্ব ক্ষমতা তার মধ্যে নেই। তা সত্ত্বেও এক দুর্বোধ্য—বরং অবোধগম্য দুর্ঘটনার কারণে তা এমনি-ই অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

২. জীবন ও জগতের মধ্যে স্বয়ং সৃজনক্ষমতা বিদ্যমান, এ কারণে তা নিজস্ব শক্তির বলে অস্তিত্ব লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।

৩. বিশ্বলোক ও এখানকার জীবন কোন মহাশক্তিমান স্রষ্টা নিজের কুদরতেই সৃষ্টি করেছেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এ তিনটি সম্ভাবনার মধ্যে কোনটি মানুষের বিবেক-বুদ্ধির বিচারে সত্য ও বোধগম্য বলে মনে হয়? গোটা সৃষ্টিলোকে এ বিষয়ে চিন্তা করার যোগ্যতা কেবল মানুষেরই রয়েছে, অপর কোন বস্তু বা জীবেরই এই ক্ষমতা বা যোগ্যতা নেই। এ কারণে আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বোক্ত তিনটি সম্ভাবনাকে সামনে রেখে স্বয়ং মানুষকেই জিজ্ঞাসা করেছেন, তোমরা নিজেরাই এ বিষয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা করে নাও, মানুষ কি এমনিই অস্তিত্ব লাভ করেছে? না মানুষ নিজেই নিজের স্রষ্টা?—এ দুটো প্রশ্নেরই জবাব যদি 'না' হয়, তাহলে তৃতীয় কথাটি—কোন সৃষ্টিকর্তাই নিজ ক্ষমতায় বিশ্বলোক জীবন ও মানুষকে সৃষ্টি

www.nagorikpathagar.org

করেছেন—স্বীকার করে নিতে অসুবিধা কোথায়? আল্লাহ্ তা'আলা এ প্রশ্নটিই করেছেন এ ভাষায় ঃ

اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخَالِقُوْنَ اَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بَلْ لاَّ يُوْقِنُوْنَ- (الطور-٣٥-٣٦)

হে নবী; এ লোকদের নিকট জিজ্ঞেস কর, তারা কোন সৃষ্টিকর্তা ছাড়াই এবং কোন নিজস্ব যোগ্যতা-ক্ষমতা ছাড়াই এমনিতেই অস্তিত্ব লাভ করেছে? কিংবা তারা নিজেরাই নিজেদের স্রষ্টা (নিজেদের সম্পর্কে তারা যদি খুব উঁচু ধারণায় লিপ্ত হয়ে থাকে তা হলে) প্রসঙ্গতঃ জিজ্ঞেস কর যে, এই পৃথিবী ও আকাশমণ্ডল কি তারাই সৃষ্টি করেছে?.....না, তা নয়; আসল কথা হল, এই লোকেরা আসল ও শাশ্বত কথার প্রতি প্রত্যয় স্থাপন করতেই প্রস্তুত নয়।

এমনিতেই—কোনরূপ অভ্যন্তরীণ কিংবা বাহ্যিক সৃষ্টিকারণ ব্যতীতই সৃষ্টিলোক অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে চলে এসেছে—বিনা কারণে এবং কোন কার্যকারণ ব্যতীতই?....এ এমনই এক প্রশ্ন, যা প্রত্যেকটি চিন্তাশীল মানুষের মনে স্বতঃই জেগে ওঠে। কিন্তু চারদিক থেকে কার্যকারণ পরম্পরা শৃংখলে বন্দী মানুষ এ প্রশ্নের জবাবে 'হাঁ' বলবে কেমন করে?.... কেমন করে সে মেনে নেবে কোনরূপ কার্যকারণ ছাড়াই তার অস্তিত্ব লাভ সম্ভবপর হয়েছে?—তার বিবেক বুদ্ধি একথা কিছুতেই সত্য বলে মেনে নিতে পারে না। অস্তিত্বের পশ্চাতে অস্তিত্বদানকারীর অবস্থিতি অপরিহার্য; তা তার নিজের মধ্যেই হোক, কিংবা তার বাইরে হোক, কোথাও না কোথাও তার অবস্থিতি অবশ্যই স্বীকৃতব্য।

.....মানুষ আবার চিন্তা করে দেখুক, সে কি নিজেই নিজের স্রষ্টা? অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আত্মপ্রকাশ করার কোন ক্ষমতা, কোন যোগ্যতাই কি মানুষের নিজের মধ্যে আছে?...অবশ্য মানুষের যোগ্যতা ক্ষমতা অন্তহীন; ক্রমশঃ বড় হয়ে ওঠা এবং স্থিতিলাভের অনেক শক্তিই মানুষের মাঝে বর্তমান। কিন্তু তা সবই পিতা-মাতার মাধ্যমে তার মধ্যে সংক্রমিত হয়েছে। তার কোনটিই তো একান্তভাবে তার নিজস্ব নয়। কথা এখানেই শেষ নয়, সে তার অস্তিত্বকে প্রতি মুহূর্তে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে বাতাস, পানি, খাদ্য, আলো বা তাপ প্রভৃতি নৈসর্গিক ও বাহ্যিক উপাদান উপকরণের মুখাপেক্ষী। এর কোন একটি ছাড়া একবিন্দু সময়ের জন্যেও বেঁচে থাকা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। নিজেই নিজের স্রষ্টা হওয়া তো দূরের কথা, সৃষ্টি বা অস্তিত্বলাভের পর অবস্থিতি ও বেঁচে থাকার জন্যে তার অসহায়ত্ব তার নিজের যোগ্যতা-ক্ষমতার স্বল্পতা ও সীমাবদ্ধতাকেই প্রকট করে তোলে।—মানুষের যদি 'স্বয়ম্ভূ' হওয়ার যোগ্যতাই থাকত, তাহলে তার সর্ব প্রকারের অসহায়ত্ব, অক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতাকে সে নিজেই ঘোচাতে পারত। নিজের সব রোগের প্রতিকার সে নিজেই করে নিত নিজের ক্ষমতার বলে। আর

www.nagorikpathagar.org

সে এমন অনেক কাজ-ই সমাধা করে ফেলত, যা করার কোন ক্ষমতা তার নেই বলেই সে করে না। কাজেই মানুষ যে 'স্বয়ম্ভূ' নয়, নিজের ব্যাপারেও চূড়ান্ত ক্ষমতা তার নেই—একথা মানতে সে একান্তভাবেই বাধ্য।

মানুষ যদি এমনিই অস্তিত্ব লাভ না করে থাকে, আর না হয়ে থাকে 'স্বয়ম্ভূ'—নিজেই নিজের স্রষ্টা, তাহলে একথা মেনে না নিয়ে কোনই উপায় থাকে না যে, তার স্রষ্টা অন্য কেউ, যার এই সৃষ্টিক্ষমতা নিজস্ব ও পুরোমাত্রায়-ই বর্তমান।

মানুষ যখন এই কথাটি অতি সহজেই মানতে বাধ্য হয় যে, সে নিজের ক্ষমতা ও যোগ্যতার বলেই অস্তিত্ব লাভ করে নি, আর শুধু এমনিতেই তার অস্তিত্ব লাভ সম্ভবপর হয় নি, তখন মানুষকে জিজ্ঞাসা করা হল যে, এভাবে সমগ্র বিশ্বলোকেরও কোন না কোন সৃষ্টিকর্তা তো অবশ্যই হবেন। বিশ্বলোকে বাহ্যতঃ শক্তিমান সত্তা কেবল মানুষই। কাজেই এ বিশ্বলোক সে-ই সৃষ্টি করেছে কিনা—সে-ই এর স্রষ্টা কিনা, এর জবাব তাকেই দিতে হবে। কেননা এই জবাবের সাথেই নিবিড়ভাবে জড়িয়ে রয়েছে তার জীবনের সাফল্য ও সার্থকতা। এর জবাব যদি নেতিবাচক হয়—নেতিবাচক হওয়া ছাড়া আর কী-ই বা হতে পারে—তাহলে সৃষ্টিলোকের কোন না কোন সৃষ্টিকর্তা অবশ্যই হবেন। আর সেই সৃষ্টিকর্তাই বিশ্বলোক ও এই মানুষ—সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন, একথাও স্বীকার করে নিতে হবে।

কথাটি যেভাবে বলা হয়েছে, এর চাইতে যুক্তিপূর্ণ, বিবেকসম্পন্ন, প্রমাণ ভিত্তিক, অকাট্য কার্যকারণ সমন্বিত এবং সহজবোধ্য কথা আর কী হতে পারে! বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলা অতি অল্প কথার মাধ্যমে কেবল নিজের অস্তিত্ব-ই প্রমাণ করেন নি, এ কথাটুকু দ্বারা স্রষ্টাহীন ধর্মহীন বুদ্ধিজীবীদের অবুদ্ধিজনিত আচরণের অন্তঃসারশূন্যতাও স্পষ্ট করে তুলেছেন। স্রষ্টার ব্যাপারে যারা নির্লিপ্ত, তাদেরও হতচকিত করে দিয়েছেন এ সংক্ষিপ্ত বাণী দ্বারা। বলেছেন, এসব বিবেক-বুদ্ধিহীন বুদ্ধিজীবীরা আসলে কোনরূপ সংশয়মুক্ত প্রত্যয়ের কাছ দিয়েও ঘেঁষতে প্রস্তুত নয়, সে পথই তারা নিজেদের হাতে বন্ধ করে দিয়েছে। এ জন্যই স্রষ্টাকে মেনে নিতে তাদের এতখানি দ্বিধা ও সংকোচ।

বিশ্ব সৃষ্টির অসংখ্য নিদর্শন যখন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের নিরংকুশ ক্ষমতাশীল স্রষ্টাকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য করে, তখন তারা সত্যকে অকপটে স্বীকার করে নেয়ার পরিবর্তে যতসব অর্থহীন কথাবার্তা উদগীরণ করতে শুরু করে। মনে হয়, সহজ ও স্পষ্ট কথা অনুধাবন করার যোগ্যতাও যেন তারা হারিয়ে ফেলেছে। উইলিয়াম বেক তাঁর 'আধুনিক বিজ্ঞান ও জীবনের প্রকৃতি' নামক গ্রন্থের শেষ ভাগে লিখেছেনঃ

www.nagorikpathagar.org

'প্রাণিবিদ্যায় পারদর্শীরা বর্তমানে মানবদেহে বিভিন্ন প্রকারের নিয়ন্ত্রণের যান্ত্রিক রূপ সম্পর্কে গভীর অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করে আছেন। কিন্তু মজার কথা হচ্ছে, এ গবেষণার দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে—তাদের অসাধারণ গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও—কোন তত্ত্ব লাভ আদৌ সম্ভবপর হয় নি। তার প্রথম বিষয়টি হল ভ্রূণের একক কোষ থেকে অধিক উৎপন্ন কোষে বণ্টন কার্যক্রম কেমন করে সাধিত হয়? ভ্রূণের একক কোষ থেকে উৎপন্ন নতুন কোষসমূহ নিজেদের সাধারণ প্রজাতিক বিশিষ্টতা রক্ষা করে কিভাবে নিজের নিজের বিশেষ কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে স্বয়ংক্রিয় ভাবে নিরত হয়ে যায়?—কোনটি হৃৎপিণ্ডের কোষ, কোনটি স্নায়বিক এবং কোনটি রক্ত কোষের কর্তব্য পালন করতে শুরু করে, এভাবেই ভ্রূণটি একটি পূর্ণাঙ্গ শিশু হয়ে গড়ে ওঠে। কোষের কর্ম বণ্টনের ব্যাপারটি প্রাণিবিদ্যা পারদর্শীদের নিকট এতই জটিল যে, তা বহু সংখ্যক তর্কশাস্ত্রসংগত (Logic) ভ্রম ও বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যর্থতায় নিমজ্জিত করে রেখেছে। একটি একক নগণ্য কোষ এমন অসংখ্য কোষ কী করে জন্ম দেয়, যা শিশু সৃষ্টিকর্মের নির্দিষ্ট কার্যসূচী অনুযায়ী যথোপযুক্ত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ও বিশিষ্ট কর্তব্যই পালন করতে শুরু করে দেয়?

মানবদেহের দ্বিতীয় যে ব্যাপারটি এখনো অনুদঘাটিত, তা হল—দেহ-ব্যবস্থার অভিন্নতা। তা অনুধাবনে অক্ষম হওয়ার কারণে প্রাণিবিদ্যাপারদর্শীরা মনে করেন, জীবন সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করার কোন যোগ্যতাই তাঁদের নেই। জীবনের উদ্দেশ্যমূলকতা দীর্ঘদিন ধরে দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয় বস্তু হয়ে রয়েছে। এখন বিজ্ঞানীদের এ বিষয়ে একটা কিছু করার সময় উপস্থিত। আধুনিক গবেষণা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, মানব দেহের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিগত ও রাসায়নিক ব্যবস্থার কথা বাদ দিয়ে মানুষের সামগ্রিক দেহ সংস্থার অধ্যয়ন ও কোনরূপ জটিলতা, অনিশ্চয়তা, অস্পষ্ট অনুধাবন এবং কোন প্রাণের কথা ধরে নেয়া ছাড়াই অংকের নিশ্চয়তা সহ সম্ভবপর। মানুষের উদ্দেশ্যমূলক কার্যক্রমে কোন জটিল রহস্য নেই। উদ্দেশ্যমূলক কার্যক্রম বস্তুগত ব্যবস্থারই বিশেষত্ব। আমরা যদি এ কাজটি বিশ্লেষণযোগ্য পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার অধীন শুরু করে দেই, তাহলে প্রাণিবিদ্যা তার আসল রূপে সমুদ্ভাসিত হতে পারবে। (Modern Science and the Nature of Life. P-261-64)

ধর্মবিশ্বাসীরা তো হঠকারিতা ও হিংসাবিদ্বেষদোষে দোষী আছেনই। একালের বুদ্ধিজীবীরাও যে সেদিক দিয়ে কিছুমাত্র কম যান না, সে কথা পূর্বে উদ্ধৃত ভাষ্য থেকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গ্রন্থকার একই সঙ্গে দুরকমের কথা বলেছেন। এক দিকে বলেছেন কোষসমূহের বণ্টন এবং দেহ-সংগঠনের একত্ব প্রাণিবিজ্ঞানীদের বুঝিয়ে দিয়েছে যে, জীবন সম্পর্কে কথা বলার তারা যোগ্যই নয়। অপর দিকে তিনি বলেছেন, এ দুটো ব্যাপার কিছুমাত্র জটিল ও রহস্যজনক নয় এবং কোন

www.nagorikpathagar.org

'পরমাত্মার অস্তিত্ব ধরে নেয়া এবং আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনরূপ অনিশ্চিত ধারণা ছাড়াই এসব জটিলতার রহস্য ভেদ করা সম্ভবপর। যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে, তা কিভাবে সম্ভব? তাহলে বলতে শুরু করবেন, আমরা যখন বিশ্লেষণযোগ্য পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার অধীন এ কাজ শুরু করব তখনই তা সম্ভবপর হবে। অন্য কথায় বর্তমানে যেসব পর্যবেক্ষণের অস্তিত্বই নেই এবং সে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পর্কে ধারণা করাও এখন সম্ভব নয়—কোন অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতে সে রহস্য উদঘাটন অবশ্যই সম্ভবপর হবে এটাই তাদের ধারণা। বস্তুত এটা হল গায়েবের প্রতি ঈমানের এক বিরল দৃষ্টান্ত। ধর্মবাদীরা যখন জনগণের নিকট গায়েবের প্রতি ঈমান আনার আহ্বান জানান, তখন তাঁরা গায়েবের নিদর্শন ও সাক্ষাৎ-প্রমাণের অকাট্য দলীল ও অকাট্য পর্যবেক্ষণাদি পেশ করেন; কিন্তু বিজ্ঞানীদের 'ঈমান-বিলগায়ব' এরূপ ভিত্তিহীন বিদ্বেষ ও নিছক হঠকারিতার উপর প্রতিষ্ঠিত যে, যা কিছুই হয়ে যাক-না-কেন, 'পরমাত্মা' বা স্রষ্টার সম্ভাব্য ধারণাকে কিছুতেই প্রশ্রয় দেয়া চলবে না। 'রূহ'কে কোন রকমে সম্ভাব্য মনে করা এবং কোন মহাজ্ঞানী সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব সম্ভব বলে স্বীকার করা বা তার চিন্তা করাও তাদের সহ্য হচ্ছে না। চিন্তা-গবেষণার এই পথ তারা নিজেরাই জেনে-শুনে নিজেদের হাত দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু কেন, তার কোন জবাবই তাদের নিকট নেই।

পাশ্চাত্যের এ বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টিসংকীর্ণতা দেখে সত্যই করুণার উদ্রেক হয়। দৃষ্টি তাদের স্থূল, তাদের সত্যঅনুসন্ধিৎসা নিছক কার্যকারণের স্থূল জ্ঞান লাভ করেই পরিতৃপ্ত। অথচ পরিপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি লাভেচ্ছুরা এতটুকু পেয়েই কখনো ক্ষান্ত হতে পারে না। তার মনে কার্যকারণ পরম্পরায় অন্তরালবর্তী গভীর সত্যের সন্ধান লাভের জন্যে থাকে আকুল পিপাসা। পর্যবেক্ষণের উপস্থিত কার্যকারণ ব্যতীত চরম ও পরম কারণের (ultimate cause) সন্ধানও তার প্রকৃতিনিহিত প্রবণতা। কেবল কারণই নয়, কারণের উদ্দেশ্যও জানতে হবে তাকে। কারণ এবং তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের সুস্পষ্ট সন্ধান লাভ না করা পর্যন্ত তার মনের এ উদগ্র পিপাসা কখনো পরিতৃপ্তি ও নিবৃত্তি লাভ করতে পারে না। কিন্তু একালের বুদ্ধিজীবীদের অবস্থা সেই সব পিপাসার্তদের ন্যায়, যারা পিপাসার তীব্রতায় পাগলের মত হয়ে নদীর বেলাভূমে উপস্থিত হয়, কিন্তু সেখানে পৌঁছে তারা পানি পান করে পিপাসানিবৃত্ত করার পরিবর্তে বসে বসে ঢেউ গুণতে শুরু করে দেয়। আর নদীর ঢেউ গণনা শেষ হবার নয়। আল্লাহ্‌র নিগূঢ় তত্ত্ব ক্রমশ উদঘাটিত হতে থাকবে। নদীর ঢেউ গুণে গুণে সময় অতিবাহিত করা যেতে পারে, কিন্তু তাতে পিপাসা নিবৃত্ত হওয়া সম্ভব নয়।

বস্তুত মনের পিপাসা অনন্ত এবং এক স্বাভাবিক প্রবণতা। এ কারণে প্রকৃতিতে তার চরিতার্থতার সুষ্ঠু ব্যবস্থা বিদ্যমান। প্রত্যেক দর্শকের চোখের সম্মুখেই তা প্রতিনিয়ত ভাস্বর হয়ে আছে। উইলিয়াম বেক তার পূর্বে উদ্ধৃত কথায় যে দুটো

www.nagorikpathagar.org

রহস্যের উল্লেখ করেছেন, তা এই ব্যবস্থাপনার অভিব্যক্তি। তা হল একক কোষ থেকে ভ্রূণের ক্রমশ বড় হয়ে পূর্ণাঙ্গ ও সুস্থ শক্তিতে পরিণত হওয়া এবং দেহ সংস্থার এক সুসংবদ্ধ ও সুশৃংখলিত উদ্দেশ্যপূর্ণ 'একক' হিসেবে কাজ করা। জীবন-সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং জীবনের প্রাণ-শক্তির (Vital Force) মূলতত্ত্ব বিজ্ঞানীদের জানিয়ে দেয়ার জন্যেই এ দুটোর উদ্ভব হয়েছে, একথা বলা অত্যুক্তি হবে না।

কুরআন মজীদ থেকে স্পষ্ট জানা যায়, প্রথমে আল্লাহ্ তা'আলা মানব জীবনের একক কোষ (Single Cell) সৃষ্টি করেছেন।—বিজ্ঞানীরা এ কোষ সম্পর্কেই মনে করেন, 'তা কোন আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলেই অস্তিত্ব লাভ করেছে'।—পরে এ একক কোষকে তেমনি বণ্টন করেছেন যেমন বিজ্ঞানীরা কোষ বণ্টন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেছেন। অতঃপর এ দুটো স্বতন্ত্র কোষকে মুরগীর দুটি ডিমের মত প্রকৃতির উত্তাপে ন'মাস পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে রেখে এ একক কোষসমূহ থেকে ঠিক তেমনিভাবে ভ্রূণের সমস্ত স্তর অতিক্রম করিয়েছেন, যেমন আমরা মুরগীর ডিমে এবং মানুষের মাতৃজরায়ুতে লক্ষ্য করে থাকি। আর শেষ পর্যন্ত দুটি শিশু যখন পূর্ণাঙ্গ হয়ে আত্মপ্রকাশ করে ও ভূমিষ্ঠ হয়, তখন তার একজনকে বলা হয় 'আদম' এবং অপরজনের নাম দেয়া হয় 'হাওয়া'। এ দু'জন যৌবনে উত্তীর্ণ হওয়ার পর দাম্পত্য জীবন যাপন ও দৈহিক মিলনে প্রবৃত্ত হলেন। আর এ থেকেই মানব বংশের ধারা শুরু হল অব্যাহত গতিতে। কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ

وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِيْنٍ-

(السجده ٧-٨)

মানুষ সৃষ্টির সূচনা হয়েছে মাটি দিয়ে। পরে তার বংশ সৃষ্টি ও ধারা পরিচালনা করা হয়েছে শুক্র কীট দিয়ে।

প্রকৃতি কীট পতঙ্গের জগতে এক কোষ সমন্বিত ডিম থেকে বংশ সৃষ্টির ধারা শুরু করিয়েছে মানুষকে একথা বোঝাবার জন্যে যে, এক কোষ সম্পন্ন জীবন থেকে কোনরূপ উত্তাপ ছাড়াই পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা-কাচ্চা সৃষ্টি কি করে সম্ভব হতে পারছে। আর জীব-জন্তু ও পশু জগতে একক কোষ থেকে প্রজনন ও বংশ সৃষ্টিধারা শুরু করিয়ে পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা-সৃষ্টির শেষ স্তর পর্যন্ত পৌছাবার ব্যবস্থা করে নির্বোধ মানুষকে বোঝাতে চাওয়া হয়েছে যে, প্রথম মানুষ সৃষ্টির ব্যাপারটিকে আমরা যতই বিস্ময়োদ্দীপক এবং দুর্বোধ্য ভাবিনা কেন, তা আমাদের চোখের উপর দিন-রাত ঘটেছে—ঘটছে প্রতিটি শহরে নগরে, প্রতিটি গ্রামে, ঘরে ও পরিবারে। দিন-রাতের এ সব ঘটনা পরম্পরা পর্যবেক্ষণের পর-ও মানব সৃষ্টি ও পশু সৃষ্টির সূচনা কেমন করে হল তা বুঝতে কি একটু-ও অসুবিধা থাকতে পারে? এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ

www.nagorikpathagar.org

اَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ اِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ۔

(العنكبوت- ١٩)

আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টির সূচনা কিভাবে করেন এবং কি ভাবে সৃষ্টি কর্মের পুনরাবৃত্তি করেন, তা কি লোকেরা দেখতে পায় না?.....একাজ তো আল্লাহ্র পক্ষে খুবই সহজ সাধ্য।

অর্থাৎ সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি থেকেই সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করা যায়। প্রথমটি হল দ্বিতীয়টির সম্ভাব্যতার অকাট্য প্রমাণ। তবে প্রাথমিক কোষ সৃষ্টির ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা নিজেরাই তা স্বীকার করেন যে, তা নিছক আকস্মিক দুর্ঘটনাস্বরূপও সম্ভবপর, তাহলে সে কাজ করা আল্লাহ্র পক্ষে অসম্ভব হবে তা কেমন করে বলা যেতে পারে?

জীবনী-সম্পন্ন সত্তার সন্তানকে একক কোষ থেকে শুরু করে পূর্ণাঙ্গ ও সুসংবদ্ধ সত্তার দেহ-ব্যবস্থা পর্যন্ত পৌছানোর কার্যক্রম কিভাবে সম্ভবপর হচ্ছে, সে বিষয়ে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করতে থাকবেন। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হল, কার্যক্রমের এই ধারা জারী হল কেন?.....তার জবাবে বলা যায় যে, সৃষ্টি পুনরাবৃত্তিই সৃষ্টিসূচনার অকাট্য সাক্ষী। ইসলামী সৃষ্টিদর্শনের এ সহজ-সরল ও বোধগম্য বিশ্লেষণের পর ধর্মবাদী ও বিজ্ঞানীদের মাঝে শুধু একটি প্রশ্ন নিয়েই মতপার্থক্য থেকে যায়। প্রশ্নটি হল ঃ জীবনের সমস্ত প্রজাতি ও জাতির জন্য একই প্রাথমিক জীবনী-কোষের দ্বারা জীবন সম্ভব হয়েছে, না প্রত্যেক প্রজাতির জন্যে প্রাথমিক জীবন-কোষসমূহ স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে?—কিন্তু আসলে এ কোন গুরুত্বপূর্ণ মতপার্থক্য নয়। ডারউইনের মতাদর্শ যখন মিথ্যা ও বাতিল প্রমাণিত হয়ে গেছে, প্রত্যেক প্রজাতির ক্রোমোসোম ও জিনস যখন নিজ নিজ বিশেষ সংখ্যা ও স্বরূপের দিক দিয়ে বিভিন্ন বলে নির্ধারিত হয়েছে, তখন এ সবের প্রাথমিক উৎসও স্বতন্ত্র ছিল বলে মেনে নেয়া ছাড়া আর কি উপায় থাকতে পারে! যেখানে একক জীবন-কোষ 'দুর্ঘটনা' কিংবা আল্লাহ্র কুদরতে সৃষ্ট হতে পারে, সেখানে প্রত্যেক প্রজাতির জন্যে এক একটি প্রাথমিক কোষ সৃষ্টি হওয়াও সম্ভব হতে পারে বলে মনে করা কিছুমাত্র কঠিন বা অমূলক হতে পারে না। এ মতকে অবৈজ্ঞানিক বলে উড়িয়ে দেয়াও সম্ভব নয় কারুর পক্ষে।

উইলিয়াম বেক-এর উত্থাপিত দ্বিতীয় ব্যাপারটি—দেহ-সংস্থার এক সুসংবদ্ধ, পরস্পর সংযুক্ত ও উদ্দেশ্যপূর্ণ 'একক' হিসেবে কাজ করা—এমন একটি বিষয়—যা মন ও রূহ সম্পর্কিত বিতর্কের উদ্ভব করে। কিন্তু এখানে এ বিষয়টি অপ্রাসংগিক।

বিশ্ব-বিখ্যাত প্রাণিবিদ্যা পারদর্শী পীরী লিকঁতে ডী নভী (Pirre Lecomte du Novy) কিছুকাল পূর্বে Human Destiny নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। তাতে 'সৃষ্টি ও ক্রমবিবর্তন' সম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনার শেষ ভাগে তিনি লিখেছেনঃ

www.nagorikpathagar.org

আমরা বার বার জোরের সঙ্গে বলছি যে, বিশ্বলোক জীবন-সৃষ্টি কিংবা প্রাকৃতিক ক্রমবিকাশের ব্যাখ্যা পেশ করার মত কোন মতাদর্শই আজ পর্যন্ত পেশ করা হয়নি। তবে জীবন-সৃষ্টি সম্পর্কিত বিষয়ে এ গ্রন্থের প্রথমাংশে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। আর আমরা ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক একথা বলতে বাধ্য যে, হয় কোন অতি-প্রাকৃতিক সত্তার প্রত্যক্ষ প্রভাবকে স্বীকার করব—বিজ্ঞানীরা তাকে আল্লাহ্ কিংবা Anti chance বলুক—অথবা আমরা মেনে নেব যে, কতিপয় যান্ত্রিকরূপ ছাড়া এ পর্যায়ে আমাদের কিছুই জানা নেই। এ কোন শুভ বিশ্বাসের ব্যাপার নয়। এ হল অনস্বীকার্য সত্য (৯৮ পৃঃ)। বিজ্ঞানীরা—যাদের বিগত চল্লিশ বছরে নিজেদের 'স্থায়ী ও বলিষ্ঠ বিবেক-বুদ্ধি' সম্পর্কে কয়েকবারই সন্দেহ প্রকাশ করতে হয়েছে—বিজ্ঞানের সে সব মতাদর্শকে অকুণ্ঠিত চিত্তে প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছেন—তাদের যৌবন কালে যেসব মতাদর্শকে অপ্রতিরোধ্য মনে করা হত। কিন্তু এসব বিজ্ঞানী-বুদ্ধিজীবীরা কোন অতি-প্রাকৃতিক স্রষ্টাকে মেনে নিতে শুধু এ জন্যেই অস্বীকৃতি জানান যে, তাঁদের ইন্দ্রিয়নিচয় সে সত্তার ধারণা মনের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে অক্ষম। অথচ তাঁরা জানেন যে, তাঁদের ইন্দ্রিয়নিচয়ে যোগ্যতা-ক্ষমতা কতই না সীমাবদ্ধ (১০০ পৃঃ)। আমাদের সুসংবদ্ধ ও জীবন সম্পন্ন বিশ্বলোক আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের ধারণা ব্যতিরেকে যে একেবারে দুর্বোধ্য, একথা ধর্মহীন ও নাস্তিক ব্যক্তিরা কিছুমাত্র অনুভব করতে পারছে না। এমন কোন বিশ্বকেন্দ্রিক সাধারণ নির্বিশেষ কারণকে বিশ্বাস করা—যে সম্পর্কে তাদের কিছুই জানা নেই—কতটা অযৌক্তিক বিশ্বাস, সে কথা তাঁরা মোটেই অনুভব করতে সক্ষম নন (১৩৩ পৃঃ)।'

এ পর্যায়ে কুরআন মজীদের এ আয়াতাংশ অবশ্যই চোখের সামনে রাখতে হবে, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ-

বিশ্বলোক সৃষ্টি ও দিন-রাতের আবর্তনে বিবেক সম্পন্ন লোকদের জন্য সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে। তারা উঠতে বসতে শুতে বিশ্বলোক স্রষ্টাকে স্মরণ করে এবং বিশ্বসৃষ্টি পর্যায়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করে। শেষ পর্যন্ত তারা এ কথা বলতেই বাধ্য হয় যে, হে আল্লাহ্ এ বিশ্বলোককে তুমি উদ্দেশ্যহীন ও নিরর্থক সৃষ্টি কর নি। উদ্দেশ্যহীন ও নিরর্থক কাজ থেকে তুমি অনেক উর্ধ্বে। হে আল্লাহ্! বিশ্বলোককে উদ্দেশ্যহীন মনে করার মারাত্মক পরিণতি (জাহান্নাম) থেকে আমাদের তুমি রক্ষা কর।

www.nagorikpathagar.org

বিশ্বলোক সৃষ্টিপর্যায়ে কুরআন মজীদ

বিশ্বলোক সৃষ্টি পর্যায়ে কুরআন মজীদে বহু কথা বলা হয়েছে। যদিও কুরআন কোন বিজ্ঞানের বই নয় এবং সৃষ্টিতত্ত্ব বিশ্লেষণই তার মুখ্য কাজ নয়, তবু তার মূল বক্তব্য বর্ণনা প্রসঙ্গে আনুষাঙ্গিকভাবে সংক্ষেপে ও ইশারা ইঙ্গিতে যে সব কথা বলা হয়েছে, তার ভিত্তিতে সৃষ্টিতত্ত্ব পর্যায়ে কুরআনের বক্তব্য সুসংবদ্ধ হয়ে উঠতে পারে। এখানে আমরা এই আলোচনার সূত্রপাত করছি।

সূরা আন্-নাহাল এর ৪০ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ اِذَا اَرَدْنَاهُ اَنْ نَّقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ-

আমরা যখন কোন জিনিসের অস্তিত্ব দানের ইচ্ছা করি তখন আমাদের কথা হয় শুধু এতটুকুই যে, আমরা বলবঃ হও। অমনি তা হয়ে যায়।

মহান স্রষ্টা যখন মানবজাতিকে এই দুনিয়ায় প্রেরণ ও বসতি দানের সিদ্ধান্ত করলেন, তখন তিনি সর্বপ্রথম বিশ্বলোক সৃষ্টির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। স্রষ্টার এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক যাবতীয় শক্তি ও মৌল উপাদান স্বতঃই সক্রিয়, একত্রিত ও সুসংবদ্ধ হয়ে উঠল। বিশ্ব প্রকৃতি এমনভাবে গড়ে উঠল,. যেন মানব জাতি এখানে নিরাপদে ও স্বচ্ছন্দে বসবাস করতে পারে। তারা নিজেদের জীবন-যাত্রার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিই শুধু পাবে না, সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন পরিপূরণার্থে নিজেদের চেতনা, মানস শক্তি ও যোগ্যতা প্রয়োগ করে তার উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়। সেই সঙ্গে স্রষ্টার শক্তি ও অতুলনীয় কর্মকুশলতার লীলাকেন্দ্র এই বিশ্বলোক অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণে নিজেদের চিন্তা-গবেষণা-প্রতিভা নিয়োজিত করতে পারে।

প্রশ্ন ওঠে, 'কুন' বলার সঙ্গে সঙ্গে فَيَكُوْنُ শব্দ প্রয়োগ করে আল্লাহ্ তা'আলা কি এ কথা বোঝাতে চেয়েছেন যে, নিমেষ-কালের মধ্যেই প্রার্থিত বস্তুটি অস্তিত্ব লাভ করে যায়, না বোঝাতে চেয়েছেন যে, বিশ্বলোকের অস্তিত্বের পশ্চাতে একজন একক ইচ্ছাসম্পন্ন সত্তার বর্তমানতা অপরিহার্য; এর কোন কিছুই স্বয়ম্ভু নয়। আর সেই ইচ্ছা সম্পন্ন সত্তা যখনই কোন কিছুর অস্তিত্ব দানের সিদ্ধান্ত করেন

www.nagorikpathagar.org

তখন তাঁরই সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম-পদ্ধতি অনুযায়ী ক্রমান্বয়ে তা হতে শুরু হয়ে যায়।[১]

আল্লাহ্‌র সৃষ্টি ধারার নিয়ম-পদ্ধতির প্রতি তীক্ষ্ম সজাগ দৃষ্টিতে তাকালেই বুঝতে পারা যায় তাঁর এই সৃষ্টিলোকে কোথাও কার্যকারণ পরম্পরাহীনভাবে কোন কিছু হঠাৎ করে হওয়ার নিয়ম নেই, সেরূপ হওয়া কোথাও লক্ষ্য করা যায় না। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টিকার্য সম্পাদনের জন্যে একটা সুষ্ঠু-সুদৃঢ় ও অপরিবর্তনীয় নিয়মতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সৃষ্টিলোকে যা কিছু হচ্ছে বা ঘটছে তার মূলে সর্বপ্রথম রয়েছে স্রষ্টার ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে সৃষ্টির ক্রমিক নিয়ম ধারা। স্রষ্টার ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং প্রার্থিত বস্তুর পূর্ণাঙ্গ অস্তিত্ব লাভের মাঝখানে সময়ের যে ব্যবধান, তা মানুষের হিসেবে বিরাট হলেও স্রষ্টার কাছে তা এক নিমেষেরও লক্ষ ভাগের এক ভাগ তুল্য নয়। কেননা তিনি স্বয়ং চিরন্তন শাশ্বত (Eternal)। তাঁর সময় সীমাহীন। তিনি সময় ও স্থানের সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে। তাঁর সময়ের হিসেব এবং মানুষের সময়ের হিসেব কোন ক্রমেই অভিন্ন হতে পারে না। এ সম্পর্কে সামান্য ধারণা দেয়ার উদ্দেশ্যেই বলা হয়েছে ঃ

وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ- (الحج-٤٧)

তোমাদের আল্লাহ্‌র একটি দিন তোমাদের গণনার সহস্র বছর তুল্য।

স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে যে পার্থক্য, স্রষ্টার সময়ের হিসেবে এবং সৃষ্টির সময়ের হিসেবেও ঠিক অনুরূপভাবে পার্থক্যপূর্ণ। এই কারণে বিশ্বলোকের সৃষ্টিকালের হিসেব মানবীয় সময় মান ও সময় হিসেবের পরিবর্তে স্রষ্টার সময় মান ও সময় হিসেবে হওয়া বাঞ্ছনীয়। শুধু সময়ের কথাই নয়, স্রষ্টার সৃষ্টি ও মানুষের সৃষ্টিধারার মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে, তা এদিক দিয়েও প্রকট যে, মানুষ কোন কিছু বানাবার পূর্বে প্রার্থিত জিনিসের পরিকল্পনা করে। তার প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করে, কিন্তু স্রষ্টার এ সবের প্রয়োজন হয় না। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলার বিশ্বলোক সৃষ্টি সম্পর্কিত আয়াতসমূহ বিশ্লেষণীয়।

সূরা ফুচ্ছিলাত-এর আয়াতঃ

ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ- (١١)

অতঃপর আকাশ মার্গের দিকে লক্ষ্য আরোপ করলেন। অবস্থা ছিল এই যে, তখন তা সম্পূর্ণ ধূম্রময় ছিল।

১. উপরে উদ্ধৃত আয়াতের শব্দের জবাব স্বরূপ শব্দ ব্যবহার থেকেই একথা প্রমাণিত হয়েছে। এ শব্দের প্রথম (অতঃপর) এবং 'হইবে' ব্যবহৃত হওয়া খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার, তা থেকেই এ তথ্য জানা ও বোঝা যায়।

www.nagorikpathagar.org

অর্থাৎ সমগ্র আকাশমণ্ডল—গোটা সৃষ্টিলোক ধূম্রাবস্থায় পড়ে ছিল। এই ধূম্র বলতে নিশ্চয়ই আগুনের ধোঁয়া বোঝায় না। এখানে অতঃপর শব্দের অর্থও কালগত পার্থক্য নয়। এ পরম্পরা সৃষ্টিগত। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বলোক সৃষ্টি করার ইচ্ছা যখন করলেন তখন তা ছিল ধূম্রময়। আর ধূম্র অর্থ 'বাষ্প'। তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা ছিলেন—সৃষ্টিলোক বলতে কিছুই ছিল না। চতুর্দিকে ছিল শুধু বাষ্প বা মৌল উপাদান 'বস্তু'। সৃষ্টিলোককে অস্তিত্ব দানের পূর্বাবস্থায় বস্তু বিক্ষিপ্ত আকারহীন ধূম্রের ন্যায় মহাসমুদ্রে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই বস্তু থেকেই উদ্ভূত সৃষ্টিলোক। পূর্ণ আয়াতটি হচ্ছেঃ

ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ وَ هِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْكَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِيْنَ-

অতঃপর বিশ্বলোক সৃষ্টির সিদ্ধান্ত করলেন, তা ছিল ধূম্র বা গ্যাস। পরে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীকে বললেনঃ অস্তিত্ব সম্পন্ন হও ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, ওরা বললঃ আমরা অনুগত হিসেবে অস্তিত্বশীল হলাম।

এ গোটা আয়াতে বলা হয়েছে সেই সময়ের কথা, যখন সৃষ্টিলোক-আকাশ ও পৃথিবী বলতে কিছুই ছিল না। তখন সৃষ্টিলোককে অস্তিত্ব দানের শুধু ইচ্ছা বা সিদ্ধান্ত করা হয়েছে মাত্র। এ আয়াত অনুযায়ী এই সময়কার অবস্থা হল, শুধু বস্তু বা গ্যাস প্রাথমিক অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তার কোন রূপ নেই, গুণ নেই, গন্ধ নেই, আকার-আকৃতি নেই। এর পরই আসমান-জমীন অর্থাৎ বিশ্বলোক সৃষ্টিকর্ম সূচিত হয়।

اَلَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ- (الفرقان-٥٩)

সেই মহান স্রষ্টাই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী—এ দুয়ের মাঝখানে যা কিছু আছে—সমগ্র সৃষ্টিলোক—সৃষ্টি করেছেন মাত্র 'ছয়টি দিনে'র সময়কালের মধ্যে। অতঃপর সমগ্র সৃষ্টিলোকের উপর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রভুত্ব আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। ('আরশে অধিষ্ঠিত হওয়া'র এটাই অর্থ)

'ছয়টি দিন' বলতে নিশ্চয়ই আমাদের গণনার ছয়দিন বোঝায় না। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময় হচ্ছে আমাদের হিসেবের একটি দিন। আল্লাহ্র হিসেবের দিন এ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। ইমাম রাগেব লিখেছেনঃ

وَقَدْ يُعَبَّرُبِهِ عَنْ مُدَّةٍ مِّنَ الزَّمَانِ اَىُّ مُدَّةٍ كَانَتْ- (مفردات ص ٥٨٦)

ইয়াওম' বা দিন বলতে বোঝায় সময় বা কালের একটা ভাগকে, তার দৈর্ঘ্য যতটাই হোক না কেন।

www.nagorikpathagar.org

সূরা কাফ-এও বলা হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ- (ق-٣٨)

এবং নিশ্চয় জেনো, আমরা আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী এবং এ দুইয়ের মাঝে যা কিছু আছে—সবই ছয়টি দিনে সৃষ্টি করেছি এবং এই সৃষ্টি কর্মে কোন ক্লান্তি বা অবসাদই আমাদেরকে স্পর্শ করে নি।

অর্থাৎ এই বিরাট বিশাল সৃষ্টিকর্ম আমার জন্যে কিছুমাত্র ক্লান্তিকর ছি না। ক্লান্তিকর ছিল না তার কারণ, বাহ্যত এই সৃষ্টি মানুষের দৃষ্টিতে অত্যন্ত বিরাট ও দুঃসাধ্য হলেও আল্লাহ্‌র নিকট তা নয়। আল্লাহ্‌র পক্ষে তাঁর মহান তুলনাহীন শক্তি-বলে এরকমের লাখ লাখ বিশ্বলোক সৃষ্টিও অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক। দ্বিতীয়তঃ তা নিতান্ত গায়ের জোরের কর্ম নয়। তা একটি স্থায়ী নিয়মে ও সুদীর্ঘ সময় কালের মধ্যে সম্পন্ন করা কাজ। কেননা তা একদিনে—এক মুহূর্তে সৃষ্টি করা হয় নি। করা হয়েছে ধীরে ধীরে, ক্রমিক নিয়মে এবং তা কালের ছয়টি অধ্যায়ে।

সমগ্র সৃষ্টিকর্মকে আল্লাহ্ তা'আলা কালের এই ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে দিয়েছেন। কুরআন মজীদে তার উল্লেখ করা হয়েছে এ ভাবে।

خَلَقَ الْأَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهُ اَنْدَادًا - ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ- وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبٰرَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَفِيْهَا اَقْوَاتَهَا فِيْ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ (حم السجده -٩-١٠)

তিনি সৃষ্টি করেছেন বিশ্বলোক দুই দিনে.....তোমরা তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বানাও?.....অথচ এই তিনি-ই তো সারা জাহানের রব্ব্।....তিনি বানিয়েছেন ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে সুউচ্চ-সুদৃঢ় পর্বতমালা। তাতে বরকত দিয়েছেন এবং চারদিনে তার জীবিকা সামগ্রী পরিমিত রূপে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। পরন্তু দুই দিনের মধ্যেই তিনি সপ্ত আকাশ সৃষ্টি সম্পূর্ণ করে দিয়েছেন।

অর্থাৎ যে দুই দিনের মধ্যে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে, সেই দুই দিনেই সম্পন্ন হয়েছে সমগ্র বিশ্বলোকের (Whole Universe) সৃষ্টিকর্ম। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে,কালের ছয়টি অধ্যায়ের প্রথম দুই অধ্যায়ে অগ্নিময় গ্যাস থেকে তারকা-নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহ সৃষ্টি হল। এর কয়েকটি মহাকাশে আবর্তিত হতে থাকল। তার মধ্য থেকে কয়েকটি ধ্বংস হয়ে গেল, আর কয়েকটি স্ব স্ব সৌরলোকে আবর্তনশীল

www.nagorikpathagar.org

হয়ে গেল। এভাবে এই দুটি কাল-অধ্যায়ে সৌরলোক সম্পূর্ণরূপে গড়ে উঠল। অতঃপর এতে বসবাসকারীদের জীবন-জীবিকা সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যবস্থাপনা কালের চারটি অধ্যায়ে পূর্ণতা লাভ করল। অপর একটি আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَهُوَالَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ الْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وكَانَ عَرْشُهٗ عَلَى الْمَاءِ-

(هود- ٧)

সেই মহান সৃষ্টিকর্তা-ই আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন কালের ছয়টি অধ্যায়ে। এই সময় মহান আল্লাহ্‌র আরশ-নিরংকুশ আধিপত্য ও কর্তৃত্ব—পানির উপর সংস্থাপিত ছিল।

এ থেকে স্পষ্ট মনে হয়, গ্যাস থেকে সৌরলোক সৃষ্টি হওয়ার সময় এই গ্যাসেরই কিয়দাংশ তরল রূপ ধারণ করে। তারপর তার উপরিতল পুরোপুরি শক্তাবস্থায় রূপান্তরিত না হতেই তা থেকে চন্দ্র বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। চন্দ্রের বিচ্ছিন্ন হওয়া পর্যন্ত পৃথিবীর উপর থেকে ছ'টি কাল-অধ্যায় অতিবাহিত হয়ে গেছে। আর এই ছ'টি কাল-অধ্যায়ে পৃথিবীর উপরিতল ঠাণ্ডা-শীতল হয়ে সংকুচিত হতে লাগল। এই সংকুচিত হওয়ার দরুণই ভূ-বক্ষে পাহাড় মাথা জাগাল। এরপর বৃষ্টিপাত হতে লাগল, সমুদ্র প্রবাহিত হতে শুরু করল এবং এতেই সংরক্ষিত করা হল সমস্ত জীব ও প্রাণী-কুলের প্রয়োজনীয় জীবিকার ব্যবস্থা।

বিশ্বলোক সৃষ্টি সংক্রান্ত কর্মধারা পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলার আর একটি ইরশাদ হল ঃ

اَوَلَمْ يَرَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا-

(الانبيا- ٣٠)

অমান্যকারী লোকেরা কি লক্ষ্য করে না যে, আকাশ-মণ্ডল ও পৃথিবী—সব কিছুই প্রথমে সম্মিলিত ও অবিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল; পরে দু'টিকে আমরা বিচ্ছিন্ন করে তৈরী করি।

এ আয়াত থেকে এক সঙ্গে দুটি কথা জানা যায়। প্রথম কথা—বিশ্বলোক সৃষ্টির পূর্বে মৌল সৃষ্টি উপাদান অখণ্ড অবিভক্ত স্তূপ (Mass) আকারে পড়ে ছিল। বর্তমানের ন্যায় কোন কিছুই ভিন্ন ভিন্ন সত্তা-সম্পন্ন ছিল না। পরে বিভিন্ন সৌরজগত এবং এক-একটি সৌরজগতের সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র-পৃথিবী ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তৈরী করা হয়।

www.nagorikpathagar.org

বৈজ্ঞানিক চিন্তা-গবেষণালব্ধ জ্ঞান বর্তমান সময় পর্যন্ত যতদূর এসেছে, তাতেও মোটামুটিভাবে এই কথাই বলা হয়েছে যে, সৃষ্টির সূচনাপর্বে মহাশূন্যে অগ্নিময় গ্যাস স্থবির অবস্থায় পড়েছিল। আজ থেকে প্রায় বিশ খর্ব (বিশ হাজার কোটি) বছর পূর্বে এই গ্যাস থেকেই সূর্য ও গ্রহ-নক্ষত্র-পৃথিবী অস্তিত্ব লাভ করে।

কুরআনের আয়াত থেকে যে স্তূপীকৃত-অখণ্ড-অবিভক্ত মৌল সৃষ্টি উপাদানের কথা জানা গেল, বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় প্রথমে তার নাম দেয়া হয় matter বা 'বস্তু'—'জড়'। আরও পরে—এই শতাব্দীতে—তার নাম হচ্ছে 'শক্তি' বা Energy। আধুনিক বিজ্ঞানীদের মতে এই Energy-র দুটি অংশ। একটি হচ্ছে Kinetic—সক্রিয় গতিশীল এবং অপর অংশ potential—অব্যক্ত, অস্ফুট, প্রচ্ছন্ন শক্তি বিশিষ্ট ও সম্ভাবনাময়।

(বার্ট্রান্ড রাসেল—Human Knowledge P-39)

www.nagorikpathagar.org

আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর স্তর

কুরআনের ঘোষণা থেকে জানা যায়, সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহ সৃষ্টি সম্পূর্ণ হওয়ার পর সমগ্র বিশ্বলোক-Whole Universe দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। একভাগে এই পৃথিবী, যেখানে আমরা বসবাস করছি। আর অপরভাগে রয়েছে পৃথিবী ছাড়া মহাশূন্যে অবস্থিত অন্য সবকিছু—Celestial and terrestrial bodies.

এই পর্যায়ে কুরআন সমগ্র আকাশমার্গীয় অবয়ব সাতটি স্তরে বিভক্ত বলে ঘোষণা করেছে। বলা হয়েছেঃ

فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ فِىْ يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰى فِىْ كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَحِفْظًا- (حم السجده -١٢)

অতঃপর মহান স্রষ্টা সপ্ত-আকাশ দুই দিনে সুসম্পন্ন করেন এবং প্রত্যেক আকাশকেই তার দায়িত্ব-কর্তব্য জানিয়ে দেন। আর পৃথিবীর নিকটবর্তী শূন্যলোক উর্ধ্বলোক, তারকার প্রদীপ জ্বালিয়ে সমুজ্জ্বল ও আলোকমণ্ডিত করে দিয়েছি। সংরক্ষণও এর একটা কাজ বা লক্ষ্য।

ইরশাদ হয়েছে ঃ

اَلَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا- (الملك- ٣)

সেই আল্লাহ্-ই সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সজ্জিত করে।

সপ্ত-আকাশ বলতে কি বোঝায়, তা নির্দ্বিধায় বলা কঠিন। হতে পারে, 'সপ্ত-আকাশ' বলতে কুরআন আকাশমার্গীয়-অবয়ব সমূহের সাতটি স্তর বুঝিয়েছে, যা একের উপর আর এক করে সাজিয়ে দেয়া হয়েছে। যেমন একটি আয়াতে বলা হয়েছেঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ- (المؤمنون- ١٧)

এবং আমরা তোমাদের উপরে উর্ধ্বদেশে সাতটি ভিন্ন ভিন্ন পথ সৃষ্টি করেছি।

www.nagorikpathagar.org

এ আয়াতে 'পথ' শব্দটির অর্থ কক্ষপথ বা আবর্তন পথ হতে পারে, হতে পারে স্তর। প্রথম অর্থের দৃষ্টিতে বলা যেতে পারে, সাতটি গ্রহের আবর্তন পথ রয়েছে। (সেকালের লোকেরা এই সপ্ত গ্রহের অস্তিত্ব জানত।) এই কারণে এখানে সাতটি পথের কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে,এর বেশী হতে পারে না। মূলতঃ বহু সংখ্যক কক্ষ পথ রয়েছে, তা বলাই এখানে লক্ষ্য, নির্দিষ্ট সংখ্যা গণনা উদ্দেশ্য নয়।) আর দ্বিতীয় অর্থের দৃষ্টিতে এর তাৎপর্য হবে, সাতটি স্তরে স্তরে সজ্জিত আকাশমার্গ।

কুরআন মজীদে আকাশমার্গীয় অবয়ব—সূর্য চন্দ্র ও পৃথিবীতে রাত দিনের আবর্তনের উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ-

(انبياء- ٣٣)

এবং সেই আল্লাহ্-ই রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন। তাই সব কিছুই স্ব স্ব পরিমণ্ডলে সাঁতার কাটছে।

অপর একটি আয়াতঃ

وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ- (يسين- ٤٠)

এই সবই এক একটি পরিমণ্ডলে সাঁতার কাটছে।

আয়াতের فلك শব্দের অর্থ مجرى الكواكب গ্রহ-নক্ষত্র, চন্দ্র-সূর্য ও পৃথিবীসহ সব কিছুর আবর্তন কক্ষ ও ক্ষেত্রে। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় এরই নাম Orbit-গ্রহাদির পরিভ্রমণের পথ।

'সবই' এক এক পরিমণ্ডলে সাঁতার কাটছে কথাটি থেকে চারটি তত্ত্ব জানা যাচ্ছে। একটি এই যে, কেবল চন্দ্র ও সূর্যই নয়, সমস্ত তারকা নক্ষত্র-গ্রহ-উপগ্রহ ও আকাশমার্গীয় অবয়ব (Celestial bodies) গতিশীল, আবর্তন তৎপর। দ্বিতীয়, প্রত্যেকটির কক্ষপথ বা গতি ও আবর্তন পথ ভিন্ন ভিন্ন, একটি মাত্র নয়। এমন নয় যে, সবই একটি মাত্র পথে আবর্তিত হচ্ছে। তৃতীয় এই যে, কক্ষপথ গ্রহ-উপগ্রহ-নক্ষত্রসহ আবর্তনশীল নয়; বরং এ গুলোই কক্ষপথের মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে। এবং চতুর্থ এই যে, কক্ষপথে গ্রহ-নক্ষত্রের গতি ঠিক তেমনি, যেন কোন তরল প্রবহমান দ্রব্যে কোন জিনিস সাঁতার কাটছে।

পৃথিবী সূর্য থেকে বিচ্ছিন্ন একটা গ্যাসীয় পিণ্ড। ক্রমে ক্রমে তা শীতল হয়ে আসে এবং তার উপরাংশে ছালের (Skin) মত একটি শক্ত স্তর গড়ে ওঠে। বিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবীর উপরিতলের তরল অবস্থা থেকে শক্ত অবস্থায় আসতে প্রায় দশ সহস্র বছর লেগেছে।

www.nagorikpathagar.org

পৃথিবী সম্পর্কে কুরআন বলছে ঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ- (الطلاق-١٢)

আল্লাহ্ তিনিই, যিনি সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবী থেকেও অনুরূপ সংখ্যক।

এর অর্থ এই নয় যে, আকাশমণ্ডল যেমন সাতটি, পৃথিবীও বুঝি অনুরূপভাবে সাতটি-ই। বরং এর অর্থ হচ্ছে, আকাশ যেমন বহু সংখ্যক, পৃথিবীও বহু সংখ্যক, একটি মাত্র নয়। মনে রাখা আবশ্যক, কুরআন মজীদের سموات 'আকাশ' শব্দটি যেখানেই এসেছে, বহুবচনে এসেছে। কিন্তু ارض। 'পৃথিবী' সর্বত্রই এক বচনে এসেছে। এর ফলে সাধারণ ধারণা এই যে, আকাশ বহু সংখ্যক হলেও পৃথিবী এই একটিই, অসংখ্য নয়। কেবলমাত্র এই একটি আয়াত থেকেই একথা জানা যায় যে, আকাশ যেমন অনেকগুলো, পৃথিবীও মাত্র একটি নয়, অনেক রয়েছে। হাদীসে এই কথাটিরই সমর্থন পাওয়া যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) খুব ভয়ে ভয়ে বলেছেনঃ

سَبْعَ اَرْضِيْنَ فِىْ كُلِّ اَرْضٍ نَبِىٌّ كَنَبِيِّكُمْ وَاٰدَمَ كَاٰدَمَ وَنُوْحٌ كَنُوْحٍ وَاِبْرَاهِيْمُ كَاِبْرَاهِيْمَ وَ عِيْسٰى كَعِيْسٰى

সাতটি পৃথিবী (বহু সংখ্যক) রয়েছে এবং প্রত্যেকটি পৃথিবীতে তোমাদের নবীর মতই নবী—আদমের মত আদম, নূহের মত নূহ, ইবরাহীমের মত ইবরাহীম এবং ঈসার মত ঈসা রয়েছেন।

আল্লামা আ-লূসী এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেনঃ 'আয়াতের শব্দ مثلهن 'তাদেরই মত বলতে বোঝানো হয়েছে আকাশ যেমন অনেকগুলো, পৃথিবীও অনেক (سبع সাত বলতে নির্দিষ্ট সাত-ই নয়, এ এক অসম্পূর্ণ সংখ্যা বলা যায় অনির্দিষ্ট সংখ্যক—অর্থাৎ বহু সংখ্যক বোঝায়। আরবে এটাই প্রচলিত)। আর আকাশ-মণ্ডল যেমন স্তরে স্তরে সাজানো, পৃথিবীও স্তরে স্তরে সাজানো। এবং প্রতিটি পৃথিবীতে এ পৃথিবীর মতই বসবাসকারী জীব বা প্রাণী রয়েছে। তারা কারা, কি তাদের পরিচয়, তা একমাত্র সৃষ্টিকর্তাই জানেন। এই একাধিক পৃথিবীর অস্তিত্বের সম্ভাবনা বিবেক-বুদ্ধি ও ঐতিহ্য কোনটিরই বিপরীত নয়।

মওলানা মওদুদী তাঁর তফসীরে উল্লেখ করেছেনঃ সম্প্রতি আমেরিকার র‍্যান্ড কর্পোরেশন (Rand Corporation) পরিচালিত এক জ্যোতির্বিজ্ঞান পর্যবেক্ষণে গোচরীভূত হয়েছে যে, এই পৃথিবী যে ছায়াপথে (Galaxy) অবস্থিত, কেবল সেই ছায়াপথেই প্রায় ষাট কোটি এমন গ্রহ রয়েছে, যেখানকার প্রাকৃতিক অবস্থান এই পৃথিবীর সাথে অনেকটা সামঞ্জস্যশীল। আর তাতেও জীবন বা প্রাণীর অবস্থিতি কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। (ইকনমিস্ট, লন্ডন, ২৬ জুলাই, ১৯৬৯ সন)

www.nagorikpathagar.org

অতঃপর পৃথিবী গ্রহে সুষ্ঠুতা আনয়ন ও তাকে মানুষের বাস উপযোগী বানানোর জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা গৃহীত হয়। এই পর্যায়ে কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ

وَجَعَلْنَا فِيْ الْأَرْضِ رَاوَسِيَ اَنْ تَمِيْدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيْهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ- وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا- (الانبياء-٣٢)

এবং পৃথিবীতে আমরা বানালাম বড় বড় সুদৃঢ়মূল পাহাড়সমূহ, যেন পৃথিবী তার বসবাসকারীদের নিয়ে কম্পিত হতে ও হেলতে দুলতে না পারে। আর তাতে বানিয়েছি পাহাড়, মধ্যবর্তী প্রশস্ত পথ—যেন লোকেরা চলাচল করতে পারে। এবং আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ বিশেষ বানিয়েছি।

সূরা আর রায়াদ এ বলা হয়েছেঃ

وَهُوَ الَّذِيْ مَدَّالْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْهٰرًا-

সেই আল্লাহ্-ই পৃথিবীকে বিস্তীর্ণ ও বিপুল সম্ভাবনাময় করে বানিয়েছেন এবং তাতে পাহাড়-পর্বত দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন ও ঝর্ণা-খাল-নদী-সমুদ্র প্রবাহিত করেছেন।

وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيْهَا- (حم السجدة-١٠)

এবং পৃথিবীতে তার উপরিভাগে পাহাড়-পর্বত বানিয়েছেন এবং তাতে প্রাচুর্য ও প্রবৃদ্ধি দান করেছেন।

বিজ্ঞানীদের মতে বিশ্বলোকে যখন তারকা-নক্ষত্র-গ্রহ-উপগ্রহ প্রভৃতি অস্তিত্ব লাভ করছিল, তখনই তন্মধ্য থেকে কিছু কিছু ধ্বংসপ্রাপ্তও হচ্ছিল। আর পৃথিবীর উপরিতল (Surface) যখন শীতল হয়ে আসছিল, তখন তা সংকুচিতও হয়ে আসছিল। তখন এই উপরিতলে যে ভাঁজ পড়ে তারই ফলে ভূ-পৃষ্ঠে ছোট-বড় পাহাড় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে জেগে ওঠে দেশ, উপমহাদেশ। উপমহাদেশগুলি আসলে ঝিলের উপরে ভেসে রয়েছে ও সাঁতার কাটছে। পৃথিবীর সংকোচনের সময় যে তীব্র চাপের সৃষ্টি হয়, সেই চাপের দরুণ যেখানে যেখানে সেই চাপ পড়ে সেখানে সেখানে ভূ-বক্ষ ত্রিশ মাইল উপরের দিকে উঁচু হয়ে ওঠে। দুনিয়ার বড় বড় পাহাড়গুলো এ ভাবেই অস্তিত্ব লাভ করেছে। আর পৃথিবীর উপরিতল শীতল হয়ে এলে তার চতুষ্পার্শ্বে অবস্থিত গ্যাসসমূহের খোলেরও তাপমাত্রা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। তখন মহাশূন্যে জলীয় বাষ্পরাশি শীতল হয়ে বৃষ্টিরূপে বর্ষিত হল। আর চতুর্দিকে পানি থৈ থৈ করতে দেখা গেল। এই পানি মাটির উপরস্থ গভীরতায় সঞ্চিত হয়ে উত্তাল তরংগায়িত সমুদ্রে পরিণত হল।

www.nagorikpathagar.org

পৃথিবীতে জীবনের সঞ্চার

পৃথিবীতে জীবনের সঞ্চার হল কী করে? কুরআন বলছে ঃ

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ- (الانبياء- ٣٠)

এবং পানি থেকেই আমরা সব জীবন্ত সত্তার অস্তিত্ব দিয়েছি।

অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ- (النور- ٤٥)

এবং আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত চলমান-গতিশীল জীবন-প্রাণী পানি থেকেই সৃষ্টি করেছেন।

এ দুটি আয়াত থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, পানি-ই হচ্ছে এই পৃথিবীতে জীবনের প্রধান উৎস। জীবনের বড় উপকরণও হচ্ছে এই পানি। পানি ব্যতিরেকে এখানে জীবের জীবন অসম্ভব। জীবন পানির ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। তাই পানির আর এক নাম জীবন। পানি থেকেই যে জীবন উৎসারিত এবং মানুষ সৃষ্টির মূলেও যে পানির অস্তিত্ব বর্তমান, তাতেও কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। আধুনিক বিজ্ঞানও এই তথ্যই উপস্থাপিত করেছে।

www.nagorikpathagar.org

মানুষ সৃষ্টির রহস্য

একক জীবকোষ থেকে বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব সম্পন্ন বহু সংখ্যক জীবকোষের সৃষ্টি এবং সেগুলোর মধ্যে কর্মবন্টনের জটিল গভীর রহস্য আজও অনুদঘাটিতই রয়ে গেছে। অনুরূপভাবে 'রূহ্'-এর অস্তিত্ব স্বীকার না করে উদ্দেশ্যপূর্ণ কাজ সম্পাদনার্থে দেহ সংগঠনের একক ও সন্নিহিত সংগতিসাম স্যের কোন বিশ্লেষণ দেয়াও আজ পর্যন্ত সম্ভব হয় নি। 'রূহ' ছাড়াই কি জীবনের বিশ্লেষণ সম্ভব? রূহ্ কি একটি নিছক ভিত্তিহীন প্রকল্প মাত্র? বস্তু, শক্তি ও রুহ্ এর নিগূঢ়তত্ত্ব কি? ইসলামী জীবন দর্শন ব্যাখ্যায় এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এ প্রশ্নের স্পষ্ট অকাট্য ও আস্বস্তকারী জবাব ব্যতীত ইসলামী জীবনাদর্শের ব্যাখ্যাদান সম্ভবপর নয়। মৃত্যুর পর জীবনব্যাপী কার্যাবলীর হিসেব নিকেশ ও কর্মফল সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশ্নের সঠিক জবাবও এর উপরই নির্ভরশীল।

বলা যেতে পারে, মানুষ যখন জ্ঞানের উন্মেষ লাভের পর তার চতুর্দিকের গোটা পরিবেশের উপর জিজ্ঞাসুদৃষ্টি নিবদ্ধ করল তখন সমগ্র বিশ্বলোক তিনটি প্রজাতি সমন্বিত রূপে তার নিকট সমুদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সে তিনটি হচ্ছেঃ নিষ্প্রাণ বস্তুনিচয়, নিরেট শক্তি এবং জীবন সম্বলিত সৃষ্টিকুল। নিষ্প্রাণ বস্তুনিচয়ের গভীর পর্যবেক্ষণ ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অধ্যয়নের পর সে সম্পর্কে মানুষ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে, তা শক্তি-বঞ্চিত অবিভাজ্য 'অণু' থেকে তৈরী। যদিও তার রূপ অসংখ্য এবং অধিকাংশই রূপ থেকে রূপান্তরে পরিবর্তিতও হতে থাকে, তা সত্ত্বেও বিশ্বলোকে বস্তুর সামষ্টিক পরিমাণ সুনির্দিষ্ট এবং তাতে কোনরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি সম্ভবপর নয়। 'বস্তু' না সৃষ্টি করা যায়, না তা ধ্বংস ও বিনাশ করা সম্ভব। বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক কার্যক্রমের ফলে তার রূপ পরিবর্তন করা যায় মাত্র।

শক্তি বা বীর্যের (Enery) প্রকৃত স্বরূপ যদিও দুর্বোধ্য, তবুও আগুনের দাহ, সূর্যের আলো ও উত্তাপ এবং মেঘমালার ঘন গর্জন ও বিদ্যুৎ চমকের বজ্রনির্ঘোষে তার অস্তিত্ব গোচরীভূত। জীবন্ত সৃষ্টিকুলে মানুষ দেখতে পেল ভিন্নতর বিশেষত্ব। দেখল, তারা নিষ্প্রাণ নির্জীব বস্তুনিচয়ের মত নয়। বরং তাতে ক্রমবৃদ্ধিশীলতা সদাসক্রিয়। নড়া-চড়া ও গতিশীলতা তার আয়ত্তাধীন। প্রতিরোধ ক্ষমতা তার স্বভাবজাত। স্বাভাবিক ধারায়ই তারা নিজেদের অনুরূপ প্রজাতীয় সত্তার জন্মদান করছে এবং পরে তারাই নির্জীব-নিষ্প্রাণ-নিস্পন্দ হয়ে পচা গলা বস্তুতে পরিণত

www.nagorikpathagar.org

হচ্ছে। এ থেকে মানুষ এই সিদ্ধান্তে সহজেই পৌঁছে গেল যে, জীবন্ত সৃষ্টিকুলের মধ্যে এমন একটা অদৃশ্য শক্তি অবশ্যই বর্তমান, যা তার দ্বারা এই সমস্ত কাজ সুসম্পন্ন করিয়ে নিচ্ছে। আর সে শক্তিটি যখন নিষ্ক্রমিত হয়ে চলে যায় তখন সেই জীবন্ত সৃষ্টিই নিস্পন্দ—নিশ্চেতন হয়ে পচা-গলা বস্তুতে পরিণত হয়ে যায়। কিন্তু এই শক্তিটি কি?...মানুষ তার নাম দিয়েছে 'রূহ্' বা প্রাণ—জীবনী শক্তি—Vitalforce। বস্তু, শক্তি ও জীবন সম্পর্কে এ হল মানুষের প্রাথমিক পর্যায়ের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা।

বিশ্বলোকের আরও অধিক গভীর ও সূক্ষ্ম অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণের ফলে মানুষের এই জ্ঞানে মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। 'শক্তি' সম্পর্কে মানুষ জানতে পেরেছে যে, তা উত্তাপ, আলো, বিদ্যুৎ, চুম্বকশক্তি ও তেজস্ক্রিয়াহীন প্রবাহের বিভিন্ন রূপ সমন্বিত। আর এইরূপ সমূহ পারস্পরিকভাবে পরিবর্তনশীল এবং তা নিত্য নৈমিত্তিকভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু শক্তির একটা বিশেষত্ব হল তা বিযুক্ত রূপে কোথাও গোচরীভূত নয়। তা সবসময় বস্তুর কাঁধে ভর করেই থাকে এবং চলে। তা থেকে বোঝা যায় যে, তা এমনই সূক্ষ্ম-প্রচ্ছন্ন এক বাস্তবতা, যা স্বীয় অস্তিত্বের প্রকাশ সাধনে 'বস্তুর' মুখাপেক্ষী—বস্তুর উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। 'বস্তু' সম্পর্কে মানুষের নিকট এই তত্ত্ব উদঘাটিত হল যে, যে 'অণু'কে তারা নগণ্য ও অবিভাজ্য মনে করেছিল, তা এক বিরাট সৌরলোকের ধারক। তাতে শক্তির বিভিন্ন 'একক' ধনাত্মক ও ঋণাত্মক (positive-negative) বৈদ্যুতিক শক্তির সঙ্গে সদা আবর্তনশীল হয়ে আছে। বস্তুর ভিত্তি এই বৈদ্যুতিক শক্তির উপর রক্ষিত। 'বস্তু' আসলে শক্তিরই কেন্দ্রীভূত ও জমাট বাঁধা রূপ মাত্র। 'শক্তি' থেকে 'বস্তু' সৃষ্টি করা যায়। আবার শক্তিতে পর্যবসিত হয়ে সেই বস্তুই ধ্বংস ও বিনাসপ্রাপ্তও হয়।

বরং কয়েক প্রকারের 'বস্তু' বিভিন্ন ধরনের গতিতে শক্তির তাপ বিকিরণ, ব্যাপ্তি ও বিশ্লিষ্টতায় সদাব্যস্ত হয়ে থাকে। বস্তু ও শক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক, বিদ্যুৎ ও রাসায়নিক শক্তির বিভিন্ন ধরনের কার্যকলাপ ও কতিপয় ক্রমবর্ধমান বস্তুর অবৃদ্ধিশীল অংশ থেকে গবেষণা কেন্দ্রে তৈরীর অভিজ্ঞতা মানুষকে জীবন সম্পর্কে এই চিন্তার দিকে আকৃষ্ট করেছে যে, জীবন্ত সত্তার প্রাণশক্তি কোন অতিপ্রাকৃতিক রূপ নয়, বরং বস্তুর সাথে সাংঘর্ষিক এই তাপযুক্ত বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক শক্তিসমূহই মূলত জীবন-প্রাণ (vital force)। বস্তুত জীবন কীর্তি 'বস্তু' ও শক্তির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ারই ফসল মাত্র। তাতে অতিপ্রাকৃতিক (super natural) প্রাণের কোন অস্তিত্ব নেই। আর জৈব রসায়ন, বস্তু ও শক্তির কার্যক্রমের গভীর নিগূঢ় ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞান থেকেই—প্রাণের 'প্রকল্প' ব্যতিরেকেই—জীবন তৎপরতার পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ সম্ভব হতে পারে।

কিন্তু জীবনের কাফেলা এখন সমুখের দিকে অনেক-অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গেছে। মানুষ এখন তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার তৃতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। মানুষ

www.nagorikpathagar.org

'অণু'র বক্ষ দীর্ণ করে বিশ্বলোক কেন্দ্রিক শক্তির পুঞ্জীভূত হওয়ার ব্যাপারটিকে পরীক্ষার মাধ্যমে সত্য প্রমাণিত করে দেখিয়েছে। তা 'বস্তু'ও 'শক্তি'কে ক্রমাগত রূপান্তরিত করে চন্দ্র ও গ্রহপুঞ্জের চতুষ্পার্শে ঘুরে বেড়াতে শুরু করেছে। সে পূর্ণ আস্থা ও গভীর বিশ্বাস নিয়ে এই বিশ্বকেন্দ্রিক 'শক্তি' ও 'বস্তুর' ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে 'রূহ্'-প্রকল্প ব্যতিরেকেই জীবন চাঞ্চল্যের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দিতে প্রাণপণ চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছে।

কিন্তু মানুষ এই চেষ্টা-প্রচেষ্টায় কখনই সফলকাম হতে পারবে না।

কেন?

তা এই জন্যে যে, জীবন চাঞ্চল্যের নিয়ামক যে শক্তি, তা সাধারণ বিশ্বলোককেন্দ্রিক শক্তি নয়। সেটা যে বিশ্বলোককেন্দ্রিক শক্তি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর, তা দিবালোকের মতই স্পষ্ট, অকাট্য। কিন্তু বিজ্ঞানীরা নিতান্ত হঠকারিতার কারণেই নিম্নোদ্ধৃত মহাসত্যগুলোর অনিবার্য পরিণতি মাথা পেতে মেনে নিতে প্রস্তুত হচ্ছে না ঃ

(১) 'বস্তু'র প্রতিটি বিশিষ্ট রূপ বা আকৃতির জন্য তার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও বিশেষ ধরনের বিশেষত্ব নির্দিষ্ট রয়েছে। ফলে সেই বিশেষত্বের পরিপন্থী কোন প্রকাশ তার দ্বারা না ঘটাই 'বস্তু'র সেই বিশেষ রূপ ও আকৃতির জন্যে অপরিহার্য ও অলংঘনীয় কর্তব্য। 'বস্তুর' যতরূপ ও আকৃতিই হোক এবং তা যে পরিবেশ-পরিস্থিতিরই সম্মুখীন হোক, তা নিজ নিজ বিশেষত্বের বহিঃপ্রকাশ সাধনে একান্তভাবেই বাধ্য। এই নিয়মটি মেনে চলার ব্যাপারে তা অনমনীয়, সুদৃঢ় ও কঠোর।

(২) 'শক্তি' (Energy)-র বিভিন্ন রূপও নিজ নিজ স্বতন্ত্র বিশেষত্বের অধীন ও অনুসারী। তারই বহিঃপ্রকাশ সাধনে তা দিনরাত ব্যতিব্যস্ত। তা এই নিয়ম এক বিন্দু লংঘন করতে পারে না।

(৩) মানবীয় জীবনকোষ 'বস্তু' ও 'শক্তি'র সংমিশ্রণজনিত রূপ। বাহ্যত এ সেই 'বস্তু', যার বিভিন্ন রূপ দুনিয়ার যত্রতত্র গোচরীভূত হচ্ছে এবং এ সেই শক্তি, যার বিভিন্ন রূপ সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এ জীবন-কোষের কতিপয় বিশেষত্ব এমন, যা 'বস্তু'র জানা ও সুপরিচিত রূপসমূহের মধ্যে কোন রূপ ও আকৃতিতেই পাওয়া যায় না; আর এই শক্তির সমস্ত জানা রূপের কোন একটি রূপ থেকেও অনুরূপ বিশেষত্ব প্রকাশ লাভ করতে পারে না। এ একটা বাস্তব পর্যবেক্ষণ। এ পর্যবেক্ষণ থেকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে যে ঃ

(ক) হয় এই জীবকোষের বস্তু সাধারণ বিশ্বকেন্দ্রিক 'বস্তু' থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর ও নবতর স্বতন্ত্র বিশেষত্বের ধারক।

www.nagorikpathagar.org

নতুবা

(খ) তার শক্তি সাধারণ বিশ্বকেন্দ্রিক (Universal) শক্তি থেকে ভিন্নতর ও নবতর স্বতন্ত্র বিশেষত্বের ধারক।

অথবা

(গ) তার বস্তু ও শক্তি উভয়ই বিশ্বকেন্দ্রিক বস্তু ও শক্তি তো বটে; তবে তাতে তা ছাড়াও অতিরিক্ত কোন শক্তির সংযোজন ঘটেছে, যা পর্যবেক্ষিত নতুন বিশেষত্ব সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এই নবতর অতিরিক্ত 'শক্তি'র কর্মপন্থা সম্পূর্ণ ভিন্নতর, সুনির্দিষ্ট এবং বিশেষ উদ্দেশ্যপূর্ণ।

পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রথম কথাটি ঠিক নয়। মা'র জরায়ুতে প্রথম গর্ভ সঞ্চারের একক জীব কোষে এই বিশ্বকেন্দ্রিক সাধারণ 'বস্তু' থেকে লালিত-পালিত হয়েই ভ্রূণ গড়ে উঠছে। এই সাধারণ 'বস্তু' থেকেই পূর্ণত্ব লাভ করে তা এক পূর্ণাবয়ব দেহ সংস্থার রূপ নিয়ে দুনিয়ায় ভূমিষ্ঠ হয়েছে। অতঃপর এই বিশ্বলৌকিক 'বস্তু'র তৈরী খাদ্য-পানীয় ও আলো-বাতাসে লালিত-পালিত হয়ে ক্রমবৃদ্ধি লাভ করে ও জীবন-জীবাণু সৃষ্টি করে অগ্রসর হয়ে চলে গেছে। কাজেই জীব-কোষের বস্তু অলৌকিক, একথা বলা যায় না। প্রকৃতপক্ষে জীব-কোষের 'বস্তু' এই বিশ্বকেন্দ্রিক 'বস্তু' ছাড়া আর কিছুই নয়। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও মানবীয় পর্যবেক্ষণ—উভয়ই এই কথার যথার্থতা স্বীকার করে। জীব-কোষের রাসায়নিক বিশ্লেষণ বলে দিচ্ছে যে, তা এই বিশ্বলৌকিক সাধারণ 'বস্তু' থেকেই উদ্ভাসিত। তবে জীবকোষে এই বিশ্বলৌকিক বস্তুর বিশেষ আকৃতি অভিনব; তা এমন, যা অজৈবিক আকৃতিতে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এ 'বস্তু' তা-ই, যার আকৃতি অভিনব এবং ভিন্নতর। কাজেই আকৃতির এই বিপুল বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতার কারণ নবতর কোন বস্তু নয়, বরং অন্য ও সম্পূর্ণ ভিন্নতর কোন 'জিনিস'।

জীব-কোষে কর্মনিরত বিবিধ শক্তির কার্যক্রম বিশ্লেষণ বলে দিচ্ছে যে, অনেকগুলি কাজ এমন, যা এই বিশ্ব-লৌকিক সাধারণ 'শক্তি'র বিভিন্ন আকৃতি কর্তৃক অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কিন্তু সেই সঙ্গে এমন বহু কাজও রয়েছে, যা বিশ্বকেন্দ্রিক সাধারণ 'শক্তি' থেকে অনুষ্ঠিত হতে পারছে না বা পারে না। তা অনুষ্ঠিত হচ্ছে কোষনিহিত 'শক্তি' থেকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, কোষসমূহের অত্যন্ত জটিল, সূক্ষ্ম স্বভাবগত কার্যক্রম থেকে নিজের সংখ্যার বৃদ্ধি সাধন, সমস্ত কোষে 'ক্রোমোসোম'-এর পূর্ণাঙ্গ জুড়িসমূহের দানা বেঁধে ওঠা; কিন্তু প্রজনন বস্তুর কোষসমূহে 'ক্রোমোসোম'-এর একক-মালা রচিত হওয়া—যেন পুরুষ ও স্ত্রীর কোষসমূহের মিলনের ফলে পূর্ণাঙ্গ জুড়িসমূহ গড়ে উঠতে পারে; ভ্রূণের একক কোষ থেকে একই ধরনের কোষসমূহের সৃষ্টি হয়ে বিভিন্ন উদ্দেশ্যসম্পন্ন কোষে বিভক্ত হয়ে যাওয়া, সৃষ্টি কার্যসূচী ও পরিবেশের প্রবণতা অনুযায়ী কোষসমূহের

www.nagorikpathagar.org

জন্মদানের গতি হ্রাস বৃদ্ধি হতে থাকা, নিজ নিজ কার্যসূচী অনুযায়ী সৃষ্টি সম্পূর্ণতার স্তর ও পর্যায়সমূহের এমনভাবে অতিক্রান্ত হওয়া যে, বারো সপ্তাহে হৃৎপিণ্ড তৈরী হয়ে কর্মে নিরত হয়ে যাবে; ফুসফুসের অস্তিত্ব লাভের সঙ্গে সঙ্গেই নিজের কাজে লেগে যাবে এবং যৌন অংগের শিরা ও কোষসমূহের পূর্ণ বয়ঃপ্রাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত কর্মের অনুপযুক্ত হয়ে থাকবে—এসব ব্যাপারই অকাট্যভাবে প্রমাণ করে এবং এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য করে যে, জীব-কোষে সাধারণ 'বস্তু' ও সাধারণ 'শক্তি' ছাড়াও এক ধরনের শক্তি সদা কর্মনিরত হয়ে রয়েছে। তা এমন সব যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতার ধারক, যা সাধারণ বিশ্বকেন্দ্রিক শক্তির কোন একটি আকৃতিতেও একবিন্দু বর্তমান নেই।

'বস্তু'র কোন একটা রূপ বা আকৃতি এবং 'শক্তি'র কোন ধরনই এমন যোগ্যতা ও বিশেষত্বের ধারক নয়, যদ্দারা 'বস্তু'র ও 'শক্তি'র যে কোন সংমিশ্রণে এমন জিনিস সৃষ্টি করা যেতে পারে, যা ক্রমবৃদ্ধি বা প্রবৃদ্ধির (growth) গুণের ধারক, যা স্বেচ্ছায় চলনশীল, স্বপ্রতিরোধ ও আত্মরক্ষার যোগ্যতাসম্পন্ন, নিজ প্রজাতির জন্মদানে সক্ষম এবং সেই সঙ্গে সমগ্র দেহাবয়ব সংস্থাকে নিয়ম-শৃংখলা ব্যবস্থার এককে স্থিতিশীল করে রাখতে পারে। এই জিনিস কেবল তখনই জন্মলাভ করতে পারে, যদি 'দীপ থেকে দীপ জ্বালানো'র জীবন-প্রদীপ তার প্রকৃতিতে রূপান্তরিত করে দেয়। জৈব শক্তির (vital force) বিশেষ স্বরূপের বাস্তবতা প্রমাণের জন্য এই তত্ত্বই অকাট্য সাক্ষী। বিশ্বলোকে অবস্থিত অন্যান্য ধরনের 'শক্তি'র এই বিশেষ 'শক্তি'র অস্তিত্ব স্বীকার করে নেয়ার পথে কোন্ জিনিসটি প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল?.....দিন-রাত্রির পর্যবেক্ষণে তা স্বীয় অস্তিত্বের অকাট্য প্রমাণ প্রকট করে তোলে।

'রূহ্' বা প্রাণের সাধারণ্যে প্রচারিত বিশেষত্ব পাশ্চাত্য মনীষার নিকট অস্বীকৃত হতে পারে, যা কিছুমাত্র দুর্বোধ্য বা বিচিত্র নয়। কিন্তু আলো, তাপ ও বিদ্যুৎ প্রভৃতি বিশ্বকেন্দ্রিক সাধারণ 'শক্তি'সমূহের ন্যায় জৈবশক্তি এমন এক স্বতন্ত্র Energy—যা 'বস্তু'তে প্রবিষ্ট হয়ে তাতে জীবনের বিশেষত্ব ও ভাবধারার প্রকাশ ঘটাতে পারে, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া শুক্রকীট-ই যার একমাত্র যোগসূত্র—তা মেনে নিতে বাস্তবিকই কী অসুবিধা থাকতে পারে, তা বিবেক-বুদ্ধির অগম্য। এই 'শক্তি' 'অলৌকিক' না-ই বা হল—'অলৌকিক' বলে মানতে হবে এমন বাধ্যবাধকতা নেই—এবং প্রচ্ছন্ন ও অপ্রকাশিত বিশেষত্ব তাতে রয়েছে বলে না-ই স্বীকার করা হল—তাতেও কিছু যায় আসে না। কিন্তু যতটা প্রকাশমান ও সমর্থনযোগ্য, ততটা মেনে নিতে আপত্তি থাকবে কেন?

তাপ, আলো ও বিদ্যুৎ—বিশ্বলোকের এই শক্তিসমূহের ন্যায় এই বিশ্বলোকেই একটি জৈবশক্তিও বর্তমান। তা এই বিশ্বলোক থেকে ভিন্ন ও অতিপ্রাকৃত কিছু নয়। তা 'বস্তু'তে প্রবিষ্ট হয়ে তাতে এমন নতুন ক্রমবর্ধমান যৌগিক রচনা করে,

www.nagorikpathagar.org

যা কোষের আকৃতি গ্রহণ করে। এ 'শক্তি' 'মহাজ্ঞানী সর্বশক্তিমান' বা বিশ্ব-ব্যবস্থাপক, পরিচালক কিছুই নয়; বিশ্বলৌকিক অন্যান্য ধরনের শক্তিকে যেমন বিশেষ ধরনের কতিপয় বিশেষত্ব দান করা হয়েছে, এই 'শক্তি'কেও তেমনি এমন কতিপয় বিশেষত্ব দেয়া হয়েছে, যার সামষ্টিক নাম হচ্ছে 'জীবন বিশেষত্ব'। ক্রমবৃদ্ধির গুণ, স্বেচ্ছামূলক চলৎশক্তি, আত্মরক্ষামূলক কর্ম-উপযোগিতা, বংশ উৎপাদন যোগ্যতা ও দেহ-ব্যবস্থার নিয়মশৃংখলা রক্ষার ক্ষমতা প্রভৃতি-ই এই জীবন বিশেষত্বের প্রমাণ। বিশ্বকেন্দ্রিক অন্যান্য সাধারণ শক্তির বিশেষত্ব হল, তা স্বতঃই স্বতন্ত্র পরিদৃষ্ট হয় না, তা বস্তুর কাঁধে ভর দিয়েই চলে, এবং তার নিজস্ব যোগসূত্রেই তা আত্মপ্রকাশ করে। অনুরূপভাবে জৈব শক্তিরও কতিপয় বিশেষত্ব রয়েছে। তা হল, তা বিশ্বলোকে এককভাবে ও স্বতঃই কোথাও বর্তমান নেই, তা সাধারণ বস্তুর কাঁধে সওয়ার হয় না, তা স্বীয় বিশেষ যোগসূত্রের মধ্যেই অবস্থান করে। অন্যান্য বিশ্বলৌকিক 'শক্তি'সমূহের ন্যায় একটি বস্তু সত্তা থেকে অপর বস্তু-সত্তার নিকট স্বীয় বিশেষ যোগসূত্রের মাধ্যমেই পৌঁছায়, তার যোগসূত্র একান্তভাবে তার নিজস্ব; তার নিজেরই তৈরী বংশ-প্রজনন কীটই তার যোগসূত্র। এই গূঢ় তত্ত্ব ও মহাসত্যগুলো দিন-রাত্রির আবর্তণে পর্যবেক্ষণীয়। প্রত্যেকটি মানুষই তা দেখতে পারে। এতে কোনরূপ অমূলক ধারণা-কল্পনা-অনুমানের স্থান নেই, তা অন্ধ কুসংস্কার প্রসূতও নয়।

এই যা বলা হল, তা নিতান্তই বাস্তব, একান্ত অকাট্য সত্য। সত্য উদ্‌ঘাটিত হওয়ার ও এর পর্যবেক্ষণ লাভের পরও পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবীরা যদি বলেন যে, জৈবশক্তির স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নেই, বিশ্বলোকের অপরাপর শক্তিগুলি একত্রিত হয়েই 'বস্তু' সত্তার জীবনের উন্মেষ সাধন করে; তা হলে এ এমন একটা দাবি হবে, যার কোন ভিত্তি নেই, নেই তাতে একবিন্দু সত্য। তার সত্যতার কোন প্রমাণই তাঁরা উপস্থাপিত করতে পারবেন না। প্রকৃতপক্ষে 'বস্তু' ও বিশ্বের অন্যান্য 'শক্তি'র সংযোজনে স্বতঃই যদি জীবনের উন্মেষ সম্ভবপর হত তা হলে বিশ্বলোকের কোন-না-কোন ক্ষেত্রে এবং ইতিহাসের কোন-না-কোন স্তরে তার পর্যবেক্ষণ অবশ্যই সম্ভব হত। শুধু তা-ই নয়, এতদিনে গবেষণাগারসমূহে অ-প্রবৃদ্ধিমূলক 'বস্তু' ও বিশ্বলৌকিক 'শক্তি' থেকে 'জীবন' সৃষ্টি করার কাজ সুসম্পন্ন হয়ে যেত।

কিন্তু বাস্তব কথা হল, বিশ্বলৌকিক অন্যান্য শক্তিসমূহ ও 'বস্তু'র সংমিশ্রণে মানুষ নিজে আজ পর্যন্ত এক বিন্দু 'জীবন' সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় নি। কেননা 'জীবাণু' ব্যতীত কোন জৈবিক বস্তু সৃষ্টি করা সম্ভবপর নয়। এ কথা আজকের মানুষও অকপটে স্বীকার করছে, স্বীকার না করে কোন উপায় নেই বলে। তারা হয়ত মৃত গাছ-গাছড়ার কয়েকটি ক্রমবর্ধনশীল শিকড় গবেষণাগারে তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু মাটির তলায় শত শত বছর কাল ধরে চাপা পড়ে থাকা কয়লা থেকে পাওয়া কতিপয় প্রবৃদ্ধিশীল যৌগিক পদার্থের সমতুল্য যৌগিক পদার্থ

www.nagorikpathagar.org

অপ্রবৃদ্ধিশীল বস্তু থেকে কারখানায় বানিয়ে ফেলেছে আর তারই জন্যে তারা আজ আত্মম্ভরিতায় ফেটে পড়তে চাইছে। কিন্তু জীবনের আবর্জনা, গাছ-গাছড়ার কাণ্ড ও কয়লার যৌগিকের সাথে স্বয়ং জীবনের কি সম্পর্ক?....এক বিশেষ ধরনের জৈব শক্তি (vital force) যে জীবনের উৎস তার কতিপয় বিস্ময় উদ্দীপক—কিন্তু সুপ্রকট বিশেষত্ব রয়েছে। আর সে বিশেষত্বসমূহের প্রকাশ যে বিশ্বলোকের অপরাপর 'শক্তি' দ্বারা সম্ভবপর নয়, তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। কিন্তু এই 'জৈবশক্তি'র প্রতি এক শ্রেণীর বিজ্ঞানীদের গভীর তীব্র শত্রুতা বিদ্যমান। একটা কঠিন বিদ্বেষে যেন তাদের মন ও মগজ জর্জরিত। তার কারণ অবশ্য জানা যায় নি। এটা দুর্বোধ্য হলেও সত্য যে, এ 'জৈবশক্তি'র অস্তিত্বকে কোন মতেই অস্বীকার করা যেতে পারে না। বিশ্বলোকের অপরাপর জৈব শক্তির মধ্য থেকে তা আসে নি। এটা সেই পর্যায়ের কোন শক্তি নয়; বরং বিশ্বলোকের অপরাপর 'শক্তি'সমূহ যেমন 'বস্তু'র উপর প্রভাবশীল হয়ে তাতে নানাভাবে রূপান্তর ঘটায় এই জৈবশক্তিও বস্তু ও অপরাপর শক্তি-উভয়ের উপর প্রভাবশীল হয়ে সে সবকে নিজ উদ্দেশ্যানুরূপ ব্যবহার করে। তা স্রষ্টা নয়, নয় সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান বা বিশ্বব্যবস্থাপক, পরিচালক। কিন্তু তার সীমাবদ্ধ পরিবেষ্টনীতে তাকে সৃজনী শক্তি দেয়া হয়েছে, ব্যবস্থাপনার যোগ্যতাও তার রয়েছে। আর প্রয়োজন মত শক্তি-ক্ষমতাও তাতে নিহিত আছে।

আল্লাহ্‌র ব্যবস্থাপনার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎস নিহিত রয়েছে বস্তুর প্রতিটি অণুর মধ্যে, আছে জীবদেহের প্রতিটি কোষে। 'অণু'তে বন্দী খোদায়ী ব্যবস্থাপনার পাত্র-সমূহে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বিদ্যুৎ কণাসমূহকে সবসময়ই আবর্তিত হতে থাকার একটি মাত্র 'নির্দেশ' পৌঁছেছে এবং সেগুলো এই নির্দেশ চিরদিনই পালন করে চলেছে। কিন্তু জীব কোষ (Lifecells) সমূহের মধ্যে খোদায়ী ব্যবস্থা ক্রোমোসোমের বাক্সসমূহে বন্দী 'জীন্‌স্' (Genes) কে যে 'আদেশ' দেয়া হয়েছে তা আরও জটিল। এই 'জীন্‌স' বস্তুযৌগিক থেকেই সৃষ্টি এবং বিশ্বলৌকিক বিদ্যুৎ কণাসমূহ থেকেই গতি ও কর্মপ্রেরণা লাভ করে। এর ফলেই তার পক্ষে সদা গতিমান ও কর্মব্যস্ত হয়ে থাকা সম্ভবপর হচ্ছে। তাকে কখনো এক ধরনের কাজে ব্যস্ত হতে হয়, কখনো তা থেকে বিরত থেকে অন্য ধরনের কাজে এবং কখনো তৃতীয় ধরনের কাজে ব্যস্ত হতে হয়। সময় নির্ধারণ ও কর্মপরিবর্তনের কাজ না সে নিজে সম্পন্ন করতে পারে, না বিশ্বলৌকিক শক্তির এই ক্ষমতা আছে। এই কাজটি একান্তভাবে বিশেষ জৈব শক্তির। কর্তব্য নির্ধারণের পর 'জীন্‌স'-এর 'বস্তু' স্বীয় রাসায়নিক ও বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে কর্মব্যস্ত হয়ে পড়ে। কর্তব্য পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিলে জৈবশক্তি আল্লাহ্ প্রদত্ত নিজ শক্তি বলে হস্তক্ষেপ করে এই কাজটি সম্পন্ন করে দেয়। তখন 'জীন্‌স' নবতর কর্তব্য সম্পাদনে আত্মনিয়োগ করে। অতঃপর যথাসময়ে এই জৈবশক্তিই তৃতীয় কোন কাজের নির্দেশ দেয়। এই জৈব শক্তি রাসায়নিক ও বৈদ্যুতিক শক্তির ন্যায় দেহের প্রতিটি কোষে বিদ্যমান ও

www.nagorikpathagar.org

কর্মব্যস্ত। সমস্ত কর্মতৎপরতা ও কার্যক্রমের লীলাকেন্দ্রকে এই শক্তিই নিয়ন্ত্রিত করে ও সুশৃংখল করে রাখে। দেহ সংস্থার 'একক'কে সংরক্ষিত রাখাও তারই কাজ। মাতৃগর্ভে প্রথম কোষকে বিশেষ কর্মাদেশ দেয়াও তারই কর্তব্য। ভ্রূণের প্রাথমিক পরস্পর বিচ্ছিন্ন কোষসমূহের বিশেষ ধরনের কর্মবণ্টন হয়ে থাকে। কিছু কিছু কোষ রক্তে পরিণত হয়, কিছু হয় অস্তি মজ্জা, কিছু হৃৎপিণ্ড, এমনিভাবে কলিজা-গুর্দার বিশেষ ধরনের বিশেষত্ব সম্পন্ন কোষ সৃষ্টি করতে থাকে। এইসব করার যোগ্যতা মূলত সেই জৈবশক্তিরই। এসব কাজ বস্তুর সাধ্যাতীত। বিশ্বলৌকিক শক্তির-ক্ষমতারও আওতাভুক্ত নয় এই সব কাজ। মূলত এটা একটা বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য। তা প্রদত্ত হয়েছে এই বিশেষ জৈবশক্তিতে; কিন্তু স্মর্তব্য যে, কর্তব্য পালনের এই সমস্ত যোগ্যতা ইচ্ছামূলক নয়, বাধ্যতামূলক—তা বাধ্যতামূলক তেমনই, যেমন বাধ্যতামূলক আগুনের দাহন করার কাজ আর পানির কাজ আগুন নেভানো। হাইড্রোজেনের কাজ জ্বলা, আর বরফের কাজ শৈত্য দান। বস্তু ও বিশ্বলৌকিক অন্যান্য শক্তিসমূহ বাধ্যতামূলকভাবে সদা কর্মতৎপর ও কর্মনিরত হয়ে রয়েছে, জৈবশক্তিও ঠিক অনুরূপভাবেই কর্মে নিয়োজিত হয়ে রয়েছে। যদিও তার কর্তব্য কি, তা তার আদৌ জানা নেই। কিন্তু জন্মগত ও বাধ্যতামূলকভাবে তাকে এই কাজেই সদা নিরত হয়ে থাকতে হচ্ছে অবচেতনভাবে অনিচ্ছাক্রমে।

মোট কথা, জৈবশক্তি বিশ্বলোকের অপরাপর শক্তিসমূহের ন্যায় 'শক্তি'রই একটি প্রকার। মৌলিকতার দিক দিয়ে তা অন্যান্য শক্তি থেকে ভিন্নতর কিছু নয়; কিন্তু স্বরূপ'তার দিক দিয়ে কিছুটা ভিন্নতর বটে। আর তা হচ্ছে অন্যান্য শক্তিসমূহের তুলনায় এর কর্তব্য অধিকতর জটিল সূক্ষ্ম ও অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তার কর্মক্ষেত্রও সম্পূর্ণ ভিন্নতরভাবে নির্দিষ্ট আর তার কর্মপন্থাও বিশেষ ধরনের। তা তার কর্মক্ষেত্রে 'বস্তু' ও অপরাপর শক্তিকে কাজে ব্যবহার করে থাকে।

এই 'জৈবশক্তি' (Vital froce) কোত্থেকে এল? কিভাবে তা কাজ করে? আর তার বিশেষত্বই বা কি?..... এ সব বিষয়ের অধ্যয়ন আলোচনা পর্যালোচনা ও বিবেচনা-গবেষণা অতীব কৌতূহলোদ্দীপক; কিন্তু পাশ্চাত্য বিজ্ঞানী-মনীষিবৃন্দ এ অধ্যয়নে মনোনিবেশ করতে পারেন নি। কেননা তাঁরা এর বিশেষ ধরন ও স্বতন্ত্র অস্তিত্বকেই স্বীকার করেন নি। কিন্তু আল্লাহ্‌র বাণী কুরআন মজীদ জৈব শক্তির উৎস, তার কর্মপন্থা ও বিশেষত্বের উপর যথেষ্ট আলোকপাত করেছে।

সাধারণ বিবেক-বুদ্ধিতে এই কথাই আসে যে, বিশ্বলোকে মহাশক্তিমান আল্লাহ্ যখন জীবনের সূচনা করলেন, তখন প্রথম জীবনের প্রথম কোষের 'বস্তু' নির্মিত অবয়বে 'জৈবশক্তি' প্রতিষ্ঠিত করে থাকবেন। পরে এই একক জৈবকোষ জৈবশক্তিতে বলীয়ান হয়ে প্রবৃদ্ধি লাভ এবং প্রায় এইভাবেই মানবাকৃতির পূর্ণাঙ্গ রূপ পরিগ্রহ করতে শুরু করে দিয়ে থাকবে, যেমন করে প্রত্যেকটি মানব শিশু

www.nagorikpathagar.org

আজও প্রজনন পুনরাবৃত্তি করে চলেছে। কুরআন মজীদে এই কথাটি বলা হয়েছে, মহাবিজ্ঞানী মহাশক্তিশালী মহান আল্লাহ্ মানুষকে মৃত্তিকা 'বস্তু' থেকে গৃহীত কোষ ও মৌল উপাদান থেকেই সৃষ্টি করেছেন।

মহাস্রষ্টা ঘোষণা করেছেন ঃ

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاءٍ مَسْنُوْنٍ-

আমরা মানুষকে খন্‌খনে শুষ্ক মৃত্তিকার মৌল উপাদান সম্বলিত পচা উপকরণ থেকে সৃষ্টি করেছি।

'বস্তুর' মৌল উপাদান মিশ্রিত মৃত্তিকার উপকরণ থেকে মানবীয় জীব-কোষ নির্মাণ করে মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাতে জৈবশক্তির অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّىْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاءٍ مَسْنُوْنٍ- فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ-

তোমাদের আল্লাহ্ যখন ফেরেশতাদের সম্বোধন করে বললেনঃ আমি খন্‌খন্ করা মৃত্তিকার মৌল উপাদানের পচা-গলা উপকরণ থেকে মানুষ সৃষ্টি করি। আমি যখন তাকে ঠিক-ঠাক ও সমন্বিত করে তার মধ্যে আমার 'রূহ্' ফুঁকে দিই, তখন তোমরা সকলে তার কার্যাবলীতে সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যে তার আনুগত্যে অবনত হয়ে যাও।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

ثُمَّ سَوّٰهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ -

(السجده - ٩)

পরে আল্লাহ্ তা'আলা সেটিকে ঠিক-ঠাক ও সমন্বিত করে তার মধ্যে স্বীয় 'রুহ্' ফুঁকে দিলেন। এমনিভাবেই তিনি তোমাদের জন্য শ্রবণ-ইন্দ্রিয়, চক্ষু ও অন্তঃকরণ দিয়ে পর্যবেক্ষণ ও অনুভূতি শক্তিতে সশস্ত্র বানিয়ে দিলেন।

কুরআন মজীদে জৈবশক্তিকে 'মানবীয় রূহ্' নামে কুত্রাপি অভিহিত করা হয় নি। আল্লাহ্ তাকে বলেছেনঃ 'আমার রূহ্'। কুরআন মজীদে এই আরবী 'রূহ্' শব্দটি আঠারোবার উল্লিখিত হয়েছে। বারটি স্থানে 'রূহুল কুদুস' জিবরাইল ফেরেশতা বোঝাবার জন্যে, তিনবার আদম সৃষ্টির বিবরণী প্রসঙ্গে এবং তিনবার হযরত ঈসা'র পিতৃহীন জন্মলাভের বৃত্তান্ত পর্যায়ে। তাই বলা যায়, মানবীয় জৈবশক্তি (vital force) হচ্ছে আল্লাহ্র এই 'রূহ্'। তা প্রথম মানব আদমের

www.nagorikpathagar.org

মৃত্তিকা উপাদান নির্মিত অবয়ব কাঠামোয় ফুঁকে দেয়া হয়েছিল। আর তা-ই আদমের বংশধর এই মানুবকূলের দেহে সদা সক্রিয় হয়ে রয়েছে। হযরত ঈসার জন্মের জন্য হযরত মারিয়ামের গর্ভে এই 'রূহ্'ই ফুঁকে দেয়া হয়েছিল। হযরত ঈসা (আ) আল্লাহ্র এই বিশেষ রূহ্ থেকে সৃষ্ট বলে খৃস্টানগণ তাঁকে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী মনে করেন। অথচ মানুষ হিসেবে তাঁর ও সাধারণ মানুষের মধ্যে রূহের দিক দিয়ে কোনই পার্থক্য নেই। কেননা সেই একই 'রূহ্' দুনিয়ার আপামর সব মানুষের দেহেই বিরাজিত। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ

لَقَدْ خَلَقْنَ الْاَنْسَانَ فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمِ- (التين)

আমরা মানুষকে অতীব উত্তম কাঠামোয় ও সর্বোন্নত দেহ সংস্থায় সৃষ্টি করেছি।

বস্তুত জৈবশক্তি-ই হচ্ছে আল্লাহ্র সেই 'রূহ্', যা প্রথম মানুষ আদমের দেহ-কাঠামোয় ফুঁকে দেয়া হয়েছিল। অতঃপর তা প্রজনন প্রক্রিয়া ও বংশানুক্রমিক ধারার মাধ্যমে প্রতিটি মানুষের দেহাবয়বে সংক্রমিত হয়ে আসছে। একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে 'আল্লাহ্র এই রূহ্'কে সৃজন ও স্থিতির গুণে গুণান্বিত করা হয়েছে। আর এ জন্যই তাকে امر الله 'আল্লাহ্র ফরমান' বলে বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী করে দেয়া হয়েছে। বস্তুত বিশ্বলোকের সব কিছুই আল্লাহ্র নির্দেশানুক্রমে সুসম্পন্ন হয়ে থাকে। অন্য কথায় 'আমরুল্লাহ্' অর্থ আল্লাহ্র كن 'হও' বলা। কিন্তু সমগ্র বিশ্বলোকের 'বস্তু' ও 'শক্তি' সমূহের সাধ্য নেই জীবন গুণাবলীর প্রকাশ সাধন করার। তার নিগূঢ় তত্ত্ব ও রহস্য এখানে নিহিত যে, আল্লাহ্ তা'আলা জৈবশক্তির সৃষ্টির কাজটি كن 'হও' ফরমান দ্বারা সম্পন্ন করেন নি, করেছেন আল্লাহ্র রুহ্ ফোঁকার মাধ্যমে। এই কারণেই বলা হয়েছেঃ

اِنَّ اللّٰهُ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ- (الانفال)

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের সত্তা ও তার অন্তঃকরণের মধ্যখানে অবস্থিত।

মানবসত্তা ও জীবনের স্থিতির মধ্যবর্তী সম্পর্ককে হৃৎপিণ্ডের গতিশীলতার সাথে অবিচ্ছেদ্য ও জরুরীভাবে সম্পর্কিত করে দেয়া হয়েছে। এই তত্ত্বটি বিগত কয়েক শতাব্দীর আবিষ্কার। কিন্তু কুরআন মজীদ এই সম্পর্কের কথা চৌদ্দশ বছর পূর্বেই উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছে। জীবনের স্থিতি, হৃৎপিণ্ডের কম্পন ও গতিশীলতাকে পরস্পর ওতপ্রোত নির্ভরশীল ও অবিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছে এ কারণে যে, আল্লাহ্র রূহ্—অর্থাৎ জৈবশক্তি (vital force) মানুষের বস্তুনিষ্ঠ সত্তার স্বীয় কর্মতৎপরতা অব্যাহত রাখার জন্যে 'অক্সিজেন' সংগ্রহের মুখাপেক্ষী; আর

www.nagorikpathagar.org

অক্সিজেন সংগ্রহ হৃৎকম্পের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত বলে মানব দেহে 'আল্লাহ্‌র রূহের' কর্মতৎপরতা ও হৃৎকম্পের সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে বিজড়িত। এই কারণেই বলা হয়েছে আল্লাহ্ তা'আলা—অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রূহ্ মানুষের সত্তা এবং তার অন্তঃকরণের মধ্যে এক জরুরী অপরিহার্য ও পরস্পর নির্ভরশীল সম্পর্ক হয়ে প্রাচীরবৎ দাঁড়িয়ে আছে। এই সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার অনিবার্য পরিণতি মৃত্যু। জৈবশক্তি কে আল্লাহ্‌র 'রূহ্' বলা এবং পরে তাকে স্বীয় সত্তার সাথে সম্পর্কিত করার দরুণ একথা স্পষ্ট ও প্রকট হয়ে ওঠে যে, আল্লাহ্ তা'আলা জৈবশক্তিকে বিশ্বলৌকিক শক্তি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও ভিন্নতর মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন।

আল্লাহ্‌র এই 'রূহ্' এর 'জৈবশক্তি' যখন মানুষের শুক্রকীটে প্রবেশ করে বস্তুনিষ্ঠ অবয়ব সৃষ্টিতে নিয়োজিত হয়, তখন থেকে একটা পূর্ণাবয়ব মানব সত্তায় পরিণতি লাভ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে তাকে বিভিন্ন আকার-আকৃতির স্তর অতিক্রম করে অগ্রসর হতে হয়। অগ্রসর হওয়ার এই ধারাকে লক্ষ্য করলে একথা স্বীকার করতে দ্বিধা হয় না যে, কথিত বিবর্তন ও ক্রমবিকাশ এখানে পুরোপুরি কার্যকর।

একটি আয়াতে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে;

فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِى الْاَرْحَامِ مَانَشَاءُ اِلٰى اَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْا اَشُدَّكُمْ -

তাহলে জেনে নাও যে, আমরা তোমাদের মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছি, পরে শুক্রকীট থেকে, পরে জমাট বাঁধা রক্ত-পিণ্ড থেকে, পরে মাংস-পিণ্ড থেকে—যা আকৃতি সম্পন্ন হয়, আকৃতিহীনও।—প্রকৃত মহাসত্য তোমাদের জানিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যেই আমরা এসব কথা বলছি-। আমরা যে শুক্রকীটকে একটা নির্দিষ্ট সময়-কাল পর্যন্ত মাতৃগর্ভের জরায়ুতে অবস্থান করাই। পরে তোমাদের একটি পূর্ণাঙ্গ শিশুরূপে বাইরের জগতে বের করে আনি, পরে লালন-পালনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে তোমরা পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ কর।

উদ্ধৃত আয়াতের শুরুতেই বলা হয়েছে, মানুষকে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তার অর্থ এই হতে পারে যে, প্রথম মানুষ হযরত আদমকে—আদমের দেহসত্তাকে—মৃত্তিকা থেকে গৃহীত মৌল উপাদানের সমন্বয়ে তৈরী করা হয়েছিল। অথবা তার অর্থ, যে শুক্রকীট দিয়ে মানুষ সৃষ্ট তা যে বস্তুনিষ্ঠ মৌল উপাদান থেকে তৈরী, তা সবই মাটি থেকে গৃহীত। এই সৃষ্টি বংশানুক্রমিক। পিতার ঔরস শুক্রকীট রূপে মার গর্ভাশয়ে প্রথম স্থান গ্রহণ করে এবং পরে তা-ই বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে পূর্ণাঙ্গ মানবাকৃতি গ্রহণ করে।

www.nagorikpathagar.org

এই কথাটি আর একটি আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَبَدَأَخَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِنْ مَّاءٍ مَّهِيْنٍ-

(السجدة)

মৃত্তিকা থেকেই তিনি মানুষ সৃষ্টি শুরু করেছেন। পরে তার বংশ-ধারা চলেছে নিঃসম্মান সামান্য পানিবৎ শুক্র থেকে।

শুক্রকীট মা'র গর্ভাশয়ে স্থির হওয়ার পর প্রথমত জমাট বাঁধা রক্তের একটা পিণ্ডে পরিণত হয়। পরে তা-ই এক টুকরা কাঁচা মাংসের রূপ ধারণ করে। তাতে প্রথমে কোন আকৃতি গড়ে ওঠে না। পরে অবশ্য তা-ই মানবীয় আকার-আকৃতি পরিগ্রহ করে। মানব সৃষ্টির মোটামুটি এই কয়টি পর্যায় নিয়ে চিন্তা-বিবেচনা করলেই এতে অবস্থার বিবর্তন ও ক্রমবিকাশের একটা রূপ স্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া যায়।

সূরা আল্-মু'মিনুন এর আয়াতেও এই কথাই বলা হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ-
ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا
فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ- (١٢-١٥)

এবং নিঃসন্দেহে আমরাই মানুষ সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে গৃহীত তার নির্যাস থেকে। পরে তাকেই শুক্রকীট বানিয়ে সুরক্ষিত স্থানে স্থিতিশীল বানিয়েছি। পরে এই শুক্রকীটকে জমানো রক্তপিণ্ডে পরিণত করেছি, এই রক্তপিণ্ডকে মাংসপিণ্ড রূপে, এই মাংসপিণ্ডকে অস্থিতে পরিণত করেছি। পরে এই অস্থির উপরে গোশ্তের পোশাক পরিয়ে দিয়েছি।

هُوَالَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ
لِتَبْلُغُوْا اَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوْخًا - وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوْا
اَجَلاً مُّسَمًّى وَّلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ- (٦٧)

সেই মহান স্রষ্টাই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা থেকে, পরে শুক্রকীট থেকে, পরে রক্তপিণ্ড থেকে। এরপর তোমাদেরকে শিশু বালক রূপে বের করেন। পরে তোমাদের সুযোগ দেয়া হয় যেন তোমরা তোমাদের পূর্ণবয়স্ক বলিষ্ঠতায় পৌছতে পার। পরে আরো সুযোগ দেয়া হয় যেন তোমরা বৃদ্ধ হতে

www.nagorikpathagar.org

পার। আর তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে। আরো আশা করা যাচ্ছে, তোমরা অবশ্যই বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগে এই সৃষ্টি-প্রক্রিয়া সূক্ষ্মভাবে অনুধাবন করবে।

এ আয়াত অনুযায়ী মানব প্রজাতি সৃষ্টির মৌল উপাদান মৃত্তিকা থেকেই সংগৃহীত সঞ্চিত। সেই উপাদান খাদ্য ও পানীয়ের মাধ্যমে মানব দেহে প্রবেশ করে তা শুক্রকীটে পরিণত হয়। এই শুক্রকীটই মাতৃগর্ভে পৌছে গর্ভসঞ্চারের ফলে রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়। এই রক্তপিণ্ডই সময়ানুক্রমে—অন্তত ২৮ সপ্তাহকাল সময়ে একটি পূর্ণাঙ্গ মানব শিশুর অস্তিত্ব গড়ে ওঠে। অতঃপর তার ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় ঘনিয়ে আসে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর এই শিশুই মৃত্তিকা সার সম্পদ বাহক খাদ্য পানীয় গ্রহণ করে লালিত-পালিত হয়, ক্রমশ বড় হয়, পূর্ণ বয়স্ক হয়। নিতান্ত অক্ষম দুর্বল অবস্থায় জন্মগ্রহণকারী শিশু পূর্ণ বয়স্কতার শক্তি সামর্থের অধিকারী হয়ে ওঠে। এর পর এই শিশুই এক সময় বার্ধক্যে উপনীত হয়। কেউ কেউ এর পূর্বে বা এ সময় অথবা এরও কিছু সময় পর মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে সেই মাটিতেই ফিরে তার সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। মাটির সার উপাদানে তৈরী কায়া মাটিতেই মিশে যায়। যা থেকে উৎপত্তি তাতেই পরিণতি। সৃষ্টি প্রক্রিয়ার এ এক-দুর্বোধ্য রহস্য বটে।

মানব সৃষ্টি প্রক্রিয়া বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা-গবেষণা শক্তিসম্পন্ন মানুষ মাত্রের-ই গভীরভাবে অনুধাবন করতে চেষ্টা করা উচিত। মানুষ তা করছে কিনা, সেই বিষয়ে প্রশ্ন তুলে এ ব্যাপারে মানুষকে অধিকতর সচেতন করে তোলার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে ঃ

اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِىٍّ يُّمْنٰى- ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى- (القيامه- ٣٧-٣٨-٣٩)

মানুষ কি অস্তিত্ব লাভ করার এক পর্যায়ে শুক্রকীট ছিল না? তা-ই হচ্ছে মানব দেহ কাঠামো নির্মাণের ও পরিমিতি নির্ধারণের মৌল উপাদান। তা-ই মাতৃগর্ভে ফোঁটায়-ফোঁটায় নিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। এই নিক্ষিপ্ত মৌল উপাদান মাতৃগর্ভে মাংসপিণ্ড হয়ে ওঠে। এই মাংসপিণ্ড থেকেই মানবদেহ সৃষ্টি করেন। সে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুষম ভারসাম্যপূর্ণ সামঞ্জস্য-সম্পন্ন ও কর্মোপযোগী করে তৈরী করে দেন। আর এ পর্যায়েরই একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, এই প্রক্রিয়ায় মাতৃগর্ভে যে সন্তানের জন্ম ঘটে, তা পরবর্তী মানব প্রজাতির বংশধারা অব্যাহতভাবে চলে ও কার্যকর করে রাখার সুষ্ঠু ব্যবস্থা হিসেবে স্ত্রী ও পুরুষের (বা ছেলে ও মেয়ে) বানিয়ে থাকেন।

মাতৃগর্ভে পিতৃ ঔরসে জন্মগ্রহণকারী সন্তান স্ত্রী ও পুরুষরূপে সৃষ্টি হওয়া এবং কেবলমাত্র পুরুষ বা কেবলমাত্র স্ত্রী না হওয়া—উপরন্তু মানব ইতিহাসের কোন

www.nagorikpathagar.org

এক অধ্যায়েও এর বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম না হওয়া থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, মানববংশের পরবর্তী ধারা এই শুক্রকীটের সাহায্যে ও বংশানুক্রমিকভাবে অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত অব্যাহতভাবে চলতে থাকবে। মানব সৃষ্টির এটাই হচ্ছে একমাত্র সূত্র ও উপায়। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন পন্থা ও উপায়ে মানুষ সৃষ্টি সম্ভবপর নয়।

শুধু মানুষই নয়, জীব-জন্তু বলতে যা-ই বোঝায় তা-ই এই পন্থা ও প্রক্রিয়ায় জন্মগ্রহণ ও অস্তিত্ব লাভ করে, বাহ্যত আকার আকৃতি এবং প্রজাতি বিচারে এ সবের মধ্যে যতই পার্থক্য থাক না কেন। কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى بَطْنِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى اَرْبَعٍ - (النور- ٤٥)

আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন সর্বপ্রকার প্রজাতির জীব ও জন্তু, সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে। এদের মধ্যে কোন কোন জীব বুকের উপর হামাগুড়ি দিয়ে চলে, এদেরই কোন কোন প্রজাতি চলে দুই পায়ের উপর ভর দিয়ে, আর এছাড়া এমন জীবও রয়েছে যারা চলে চার পায়ের উপর নির্ভর করে।

জীব জগতের বিভিন্ন প্রজাতি সম্পর্কে একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে চিন্তা করলেই এ আয়াতের সত্যতার যথার্থতা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যায়। জীবকুলের মধ্যে এ তিন প্রকারের প্রজাতিই বিদ্যমান। হয় তারা বুকের উপর হামাগুড়ি দিয়ে চলে, যেমন সাপ, বিছা ও এই ধরনের অন্যান্য জীব; না হয় তারা চার পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ায় ও চলে, যেমন—গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদি। নতুবা তারা দুপায়ের উপর ভর করে সোজা হয়ে দাঁড়ায় ও চলে, যেমন মানুষ, বন মানুষ ইত্যাদি।

এই দু'পায়ের উপর ভর করে চলা মানুষের সৃষ্টিধারাই আমাদের আলোচ্য, আমাদের এই দীর্ঘ গবেষণা ও আলোচনা-পরিক্রমার লক্ষ্যস্থল। এ মানুষ এক সম্পূর্ণ ভিন্ন ও স্বতন্ত্র প্রজাতীয় জীব। এই মানুষের সৃষ্টি প্রথম পর্যায়েও পানি থেকে; সেই পানি থেকে যেমন পানি থেকেই জীবন সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টিকর্তা; আর শেষ পর্যায়েও এই 'পানি' সৃষ্টি করা হয়েছে পানি থেকে। এ সেই পানি, যা শুক্রকীট হয়ে পিতৃদেহ থেকে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে। এবং এ সেই পানি, যা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই প্রায় দুই বছর কাল পর্যন্ত সদ্যোজাত শিশু মাতৃস্তন থেকে পান করে লালিত পালিত হয়। বস্তুত 'পানি'ই হচ্ছে জীব সৃষ্টির মৌল উৎস' তা প্রটোপ্লাজম'ই হোক কিংবা হোক শুক্রকীট।

মানুষ সৃষ্টির এই ধারা অব্যাহতভাবে চলার মূলে মানুষের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তাকে অতি আপনজন সম্বলিত এক সুসংবদ্ধ সমাজ ব্যবস্থা পরিবেশন করা অনিবার্য লক্ষ্য হয়ে রয়েছে। অক্ষম অসমর্থ মানব শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ লালন-পালন ও ক্রমবৃদ্ধি সাধনের উদ্দেশ্যে এই সুসংবদ্ধ সমাজ তার জন্মলাভের

www.nagorikpathagar.org

পূর্বেই তৈরী হয়ে থাকা একান্তই অপরিহার্য ছিল। এই কারণে নারী ও পুরুষের বিবাহ সমাজ সমর্থনের ভিত্তিতে হওয়ার ব্যবস্থা প্রথম সময় থেকেই চলে এসেছে। এই বিবাহ ও স্বামী-স্ত্রীর যৌনমিলনের ফলেই হয় মানব সন্তানের আবির্ভাব। এই আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই এই সন্তান অপত্যস্নেহ ও মায়া-মমতা সম্পন্ন পিতা-মাতা ছাড়াও পিতার নিকটাত্মীয় ও মা'র নিকটাত্মীয়দের সে তার প্রতি অকৃত্রিম দরদীরূপে লাভ করে। মানুষের মত এক দুর্বলতম সৃষ্টির জন্যে এই ব্যবস্থা অত্যন্ত জরুরী ও বিশেষ কল্যাণকর। কুরআন মজীদে এই কথাই বলা হয়েছে নিম্নে উদ্ধৃত আয়াতে ঃ

وَهُوَالَّذِىْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّ صِهْرًا وكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا-

(الفرقان- ٥٤)

'এবং সেই স্রষ্টা মহান তিনি-ই, যিনি পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন মানব প্রজাতিকে এবং এই সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তাকে বানিয়ে দিয়েছেন পিতৃবংশ সম্পর্ক ও মাতৃবংশ সম্পর্ক সম্পন্ন। আর তোমার আল্লাহ বস্তুতই শক্তিমান (যা-ই করতে চান)।'

মানুষ যে জন্মগতভাবেই সামাজিক জীব, সমাজবদ্ধ জীবন-ভিন্ন মানুষের জীবন অকল্পনীয়, তা এ আয়াতের আলোকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

মানব সন্তান যে পিতা-মাতার যৌন-মিলনের ফসল এই পিতা-মাতাই কি মানুষের স্রষ্টা? মানুষ সৃষ্টির ধারা অব্যাহতভাবে চলতে থাকা কি পিতা-মাতার মর্জির উপর নির্ভরশীল? একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে চিন্তা করলে দেখা যাবে, মানব সন্তানের জন্ম ও মানব প্রজাতির বংশধারা অব্যাহতভাবে চলতে থাকা সেই পিতা-মাতারও মর্জির উপর নির্ভরশীল নয়। নারী ও পুরুষের মধ্যে স্বভাবতঃই যৌন-মিলনের কামনা-বাসনা-স্পৃহা ও উত্তেজনা নিহিত, বস্তুত তা-ই হচ্ছে এর মৌল কারণ। পূর্ণবয়স্কতা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ ছেলে যেমন দৈহিক ও মানসিকভাবে সক্ষম ও আগ্রহী হয় শুক্রবীজ যথাস্থানে বপন করার জন্যে, তেমনি মেয়েরাও দৈহিক ও মানসিকভাবে সক্ষম আগ্রহী ও উপযুক্ত হয়ে ওঠে পুরুষের কাছ থেকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় শুক্রবীজ গ্রহণ করে গর্ভধারণ করার জন্যে। পরে যখন সামাজিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই নারী ও পুরুষ যৌনমিলন সম্পন্ন করে বসে, তখন নিতান্ত অজ্ঞাতসারেই সন্তানের বীজ গর্ভ সঞ্চার করে বসে। ঠিক কোন্ মুহূর্তে এই বীজ তার স্থান গ্রহণ করল, তা যে মা'র দেহে স্থান গ্রহণ করে, সে-ও টের পায় না, যে পিতার শুক্রকীট সন্তান হতে যাচ্ছে, সে-ও জানতে পারে না। জানতে পারে না কোন চিকিৎসাবিদ, কোন বৈজ্ঞানিক।

অতএব নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, মানব সৃষ্টি ও মানব বংশ অব্যাহত রাখার এই কার্যক্রম মহান স্রষ্টার বিশেষ ব্যবস্থার ফলেই সুষ্ঠু ভাবে চলছে। চলতে থাকবে—যতদিন তিনি তা চালাতে চাইবেন। কোন ব্যক্তি বা শক্তির পক্ষেই তা বন্ধ করা সম্ভবপর নয়। কেননা وكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا তোমার মহান আল্লাহ্ যে মহাশক্তিমান সত্তা।

www.nagorikpathagar.org

গ্রন্থপঞ্জী

1. The Houston Post, August 23, 1964, p. p. 6
2. The River of life by Rutherford Platt, 1956, p, VII
3. The World Book Encyclopaedia 1966, Vol 6, p, 330
4. Genetics and the Origin of Species by Theodosius Dobzhansky, 1951, p. p. 3, 11
5. The New York Times, November 29, 1959.
6. Biology for You, By B.B. Vance and D. F. Miller, 1963, p. 531.
7. The New Orlean's Times-picyune, May 7, 1964.
8. The Milwaukee Journal, March 5, 1966, p, 40.
9. The New York Times, October 25, 1964, November 13, 14, 1966. p. 40.
10. Websters Third New International Dictionary, 1961, p. 813.
11. The Origin of Species, BY Charles Darwin, The Harvard Classics 1909, Vol—11, p. 178, p. 190, p.359-361
12. Science Year, 1965, p. 18, 1966 p.197.
13. The Biological Basis of Human Freedom, By Theodosius Dobzhansky, 1956, pp. 6, 8, 9.
14. Encyclopaedia Britanica, 1946, Vol. 8, pp. 916, 927, Vol. 4, p. 767.
15. Charles Darwin. By Sir Gavin de Beer. 1965, p. 215. 163, 182.
16. The Fossil Evidence for Human Evolution. By W. E. Lc Gros Clark 1964, pp. 41.188, 174.
17. Science, January 22. 1965. p. 389.
18. The World Book Encyclopaedia, 1966. Vol. 6, p. 334, p. 118.
19. Science News Letter, May, 29, 1965, p. 346 August 15, 1951.
20. The Bible and Modern Science. By L. Merson Davies. 1953. p. 7.
21. Lutheran Wilness Reporter. November 14. 1965.
22. The Fresno Bee. August 20, 1959, p. 1-B.
23. Review Text in Biology, Mark, A. Hall and Milton S. Lesser, 1966 p. 252, 253, pp.304, 305, 363.
24. Encyclopaedia Britanica, 1959, article By H. S. Muller. Vol. 22, p. 988, 1946, Vol. 8, p. 922.
25. The Mechanism of Evolution by W. H. Dowdeswell, 1960. p, 14, 30
26. Time, Feb, 12, 1965, p. 51
27. Biology for Today by Sayles B, Clark and J. Albert Mould, 1964, p. 321, 273.
28. The Story of Life by A. E. L. Mellersh, 1958 pp. 237, 242.
29. American Scientist, Jan, 1953. p. 100.
30. Oklahoma City Times, August 1966, p. 25
31. The Orion Book of Evolution, by Gean Rostand, 1961, pp. 75, 76, 70, 79, 91.
32. Science Digest, Jan, 1961, pp. 61-63.

www.nagorikpathagar.org

33. Modern Science and Nature of Life, By William, S, Beck, p. 221, 224, 225, 133, 144.
34. Psychology, By Donald Marqusis, p. 165.
35. Discovery, May, 1962, p. 44.
36. Look, January 16, 1962, p. 46.
37. The Immense Journey, by Isren Eiseley, 1957, p. 206, 199, 200
38. Science Today, 1961, chapter by Sir James Gray, p. 21, 36, 29, 30.
39. The Ideas of Biology by John Tyler Bonner. 1962, p. 18.
40. Reader's Digest. January, 1963, p. 92, October, 1962, p. 144. 148.
41. The Encyclopaedia Americana, 1956, Vol. 3, p. 721.
42. Organic Evolution and the Bible. E. J. Gardner. 1950.
43. Animal Evolution, by G. S. Carter 1964, p. 250.
44. Scientific American, May 1963, p. 53, August, 1964, p. 34-36, October 1963. p. 51, November, 1955 p. 58, December, 1966, p. 32.
45. The Minnesota Technology, October, 1957.
46. The Evidence of God in an Expanding Universe, edited by John Clover Monsma, 1958, chapter by E. C. Kornfeld, p. 176.
47. The World We Live in by the editorial staff of Life and Lincoln Barnett 1955, p. 99.
48. Natural History, October, 1959, p. 466, 467.
49. The Major Features of Evolution by George Gaylord Simpson, 1953 p. 360.
50. Genetics Paleontology and Evolution, edited by Glennl, Jepsen, Ernst Mayr, George Gaylord Simpson, 1963, Chapter by A. S. Romer. p. 114.
51. On Growth and Form by D' Arcy Thompson, 1943, p. 1092-1094.
52. Synthetic Specification by Dr. Herbert Niesson, 1954. pp. 488, 489, translated from the German by W. E. Filmer in Dr. Herbert.
53. The Primates, by Sarel Himeri and Irven Devore and the editors of Life, 1965, 15. 177.
54. Human Destiny, by Lecomte du, Nouy, 1947, p. 96.
55. Science, December, 9, 1955, p. 1144.
56. The Material Basis of Evolution, By Richerd B. Gold schmidt, 1940, p. 165, 168.
57. Charles Darwin, Plate. p. 8, p. 191.
58. The Biological Basis of Human Freedom, P. 56. p. 102.
59. The New You and Heredity by Amram Schcinfeld. 1950, p. 476.
60. Radiation ,Genes and Man by Bruce wallace and Theodosius Dobzhansky, 1959, p. 35.
61. New Zealand Herald, January 17. 1963, p. 38.
62. Progress and Decline by Hugh Miller, 1963, p. 38.
63. The Geography of Evolution, by George Gaylord Simpson, 1965, p. 17.

www.nagorikpathagar.org

64. The Story of Man, by H. E. L. Mellersh, 1959, p. 14.
65. Life, June, 28, 1963, 72
66. New scientist, March 25, 1965, p. 798.
67. Evolution as a Process, Edited by Juillan Huxly, 1954, pp. 300-302.
68. The Saturday Evening Post, December 3, 1966, p. 65.
69. The Fossil Evidence for Human Evolution p. 175.
70. The Long Road to Man, by Robert L, Lehrman, 1961, p. 115.
71. Man: His First Million Years by Ashley Montagu 1957, p. 51.
72. The World Book Encyclopaedia, 1966, Vol. 15. p. 669.
73. Biology and its Relation to Mankind, by A. M. Winchester, 1961, p. 604.
74. Harper's December 1962. p. 73.
75. Chicago Tribune, April, 21, 1963.
76. Evolution or Special Creation, by Frank lewis Marsh, 1963, p. 26.
77. Man, God and Magic by Ivar Lissner, 1961, p. 304.
78. The First Nine Months by Geraldinel L. Flanagan, 1962, p. 25.
79. The Nature of life by C. H. Waddington. 1962, p. 67.
80. কুরআন মজীদ।
81. হাদীস।
82. حضرت محمد صلعم اور دور جدير

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

গ্রন্থকার পরিচিতি

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ.) বর্তমান শতকের এক অনন্যসাধারণ ইসলামী প্রতিভা। এ শতকে যে ক'জন খ্যাতনামা মনীষী ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা কায়েমের জিহাদে নেতৃত্ব দানের পাশাপাশি লেখনীর সাহায্যে ইসলামকে একটি কালজয়ী জীবন-দর্শন রূপে তুলে ধরতে পেরেছেন, তিনি তাঁদের অন্যতম।

এই ক্ষণজন্মা পুরুষ ১৩২৫ সনের ৬ মাঘ (১৯১৮ সালের ১৯ জানুয়ারী) সোমবার, বর্তমান পিরোজপুর জিলার কাউখালী থানার অন্তর্গত শিয়ালকাঠি গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৮ সালে তিনি শর্ষীনা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে আলিম এবং ১৯৪০ ও ১৯৪২ সালে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে যথাক্রমে ফাযিল ও কামিল ডিগ্রী লাভ করেন। ছাত্রজীবন থেকেই ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানগর্ভ রচনাবলি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে উচ্চতর গবেষণায় নিরত থাকেন। ১৯৪৬ সালে তিনি এ ভূখণ্ডে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করেন এবং সুদীর্ঘ চার দশক ধরে নিরলসভাবে এর নেতৃত্ব দেন।

বাংলা ভাষায় ইসলামী জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ.) শুধু পথিকৃতই ছিলেন না, ইসলামী জীবন দর্শনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ সম্পর্কে এ পর্যন্ত তাঁর প্রায় ৬০টিরও বেশি অতুলনীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর 'কালেমা তাইয়্যেবা', 'ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা', 'মহাসত্যের সন্ধানে', 'বিজ্ঞান ও জীবন বিধান', 'বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব', 'আজকের চিন্তাধারা', পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি', 'সুন্নাত ও বিদয়াত', 'ইসলামের অর্থনীতি', 'ইসলামের অর্থনীতি বাস্তবায়ন', 'সুদমুক্ত অর্থনীতি', 'ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা', 'কমিউনিজম ও ইসলাম', 'নারী', 'পরিবার ও পারিবারিক জীবন', 'আল-কুরআনের আলোকে উন্নত জীবনের আদর্শ', 'আল-কুরআনের আলোকে শিরক ও তওহীদ', 'আল-কুরআনের আলোকে নবুয়্যাত ও রিসালাত', 'আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার', 'খেলাফতে রাশেদা', 'ইসলাম ও মানবাধিকার', 'ইকবালের রাজনৈতিক চিন্তাধারা', 'রাসূলুল্লাহ বিপ্লবী দাওয়াত', 'ইসলামী শরীয়াতের উৎস', 'অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম', 'অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে ইসলাম', 'শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি', 'ইসলামে জিহাদ', 'হাদীস শরীফ (তিন খণ্ড)', 'আল্লাহর হক বান্দার হক' ইত্যাকার গ্রন্থ দেশের সুধীমহলে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলেছে।

মৌলিক ও গবেষণামূলক রচনার পাশাপাশি বিশ্বের খ্যাতনামা ইসলামী মনীষীদের রচনাবলি বাংলায় অনুবাদ করার ব্যাপারেও তাঁর কোনো জুড়ি নেই। এসব অনুবাদের মধ্যে রয়েছে মওলানা মওদূদী (রহ.)-এর বিখ্যাত তাফসীর 'তাফহীমুল কুরআন', আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী-কৃত 'ইসলামের যাকাত বিধান (দুই খণ্ড)' ও ইসলামে হালাল হারামের বিধান', 'মুহাম্মদ কুতুবের 'বিংশ শতাব্দীর জাহিলিয়াত' এবং ইমাম আবু বকর আল-জাস্‌সাসের ঐতিহাসিক তাফসীর 'আহকামুল কুরআন'। তাঁর অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যাও ৬০টিরও উর্ধ্বে।

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ.) বাংলাদেশ সহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি)-র অন্তর্গত ফিকাহ্ একাডেমীর একমাত্র সদস্য ছিলেন। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সূচীত 'আল-কুরআনে অর্থনীতি' এবং 'ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস' শীর্ষক দুটি গবেষণা প্রকল্পেরও সদস্য ছিলেন। প্রথমোক্ত প্রকল্পের অধীনে প্রকাশিত দুটি গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধ তাঁর রচিত। শেষোক্ত প্রকল্পের অধীনে তাঁর রচিত 'স্রষ্টা ও সৃষ্টিতত্ত্ব' এবং 'ইতিহাস দর্শন' নামক গ্রন্থ দু'টি সুধীজন কর্তৃক প্রসংশিত এবং বহুল পঠিত।

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ.) ১৯৭৭ সালে মক্কায় অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব ইসলামী শিক্ষা সম্মেলন ও রাবেতা আলমে ইসলামীর সম্মেলন, ১৯৭৮ সালে কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত প্রথম দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় ইসলামী দাওয়াত সম্মেলন, একই বছর করাচীতে অনুষ্ঠিত প্রথম এশীয় ইসলামী মহাসম্মেলন, ১৯৮০ সালে কলম্বোতে অনুষ্ঠিত আন্তঃপার্লামেন্টারী সম্মেলন এবং ১৯৮২ সালে তেহরানে অনুষ্ঠিত ইসলামী বিপ্লবের তৃতীয় বার্ষিক উৎসবে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন।

এই যুগস্রষ্টা মনীষী ১৩৯৪ সনের ১৪ আশ্বিন (১৯৮৭ সালের ১ অক্টোবর) বৃহস্পতিবার এই নশ্বর দুনিয়া ছেড়ে মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেছেন। (ইন্না-লিল্লা-হি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিউন)

খায়রুন প্রকাশনী

www.nagorikpathagar.org